কবিকাব্যে নেপথ্যচারিণী

পুস্তক বিপণি ॥ ২৭, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ :

নভেম্বর, ১৯৫৮

প্রকাশক :
জ্যোতিষরঞ্জন বড়ুয়া
১৬২/৬১, লেক গার্ডেনস্
কলিকাতা-৭০০০৪৫

প্রচ্ছদ :
শ্রীতপন কর

মুদ্রক :
কোলাজ
২, চৌরঙ্গী রোড,
কলিকাতা-৭০০০১৩

৺পিতৃদেবকে

কবিকাব্যে নেপথ্যচারিণী

ক্ষ
া
ণি
া
কা

খোলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা,
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে,
গোধূলি-বেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে,
লয়ে তার ভীরু দীপশিখা।
দিগন্তের কোন্ পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা॥

● নিবেদন ●

মহামানব বিশ্বপ্রেমিক ও প্রেমিক রবীন্দ্রনাথকে বহু মণীষী বিভিন্ন দিক থেকে নানা ভাবে নানা প্রকারে বুঝবার ও জানবার চেষ্টা করেছেন, তাঁরা আমার নমস্য। আমি তাঁর কাব্যগ্রন্থেব মধ্যে শ্যামলী নারী 'আনন্দের হারানো কণিকা' ক্ষণিকাকে ও শ্রেষ্ঠ প্রেমিক রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেছি। আমি যদি কবির 'ভাষার অঞ্জলি' থেকে ও 'বিস্মরণ ধর্মী' জীবনের মধ্যে ক্ষণিকাকে খুঁজে পেয়ে থাকি তবেই আমার এই লেখা সার্থক। এই অনুসন্ধান আমি সঠিক ভাবে করতে পেরেছি কি না তার বিচারের ভারও পাঠকবর্গের উপর রইল।

কবি জীবনস্মৃতিতে কড়ি ও কোমল পর্যন্ত উল্লেখ কবেছেন যা' কবির জীবনের ছবিমাত্র (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ)। তারপর বহুজনের অনুরোধ সত্বেও তিনি জীবনচরিত রচনা করেন নি কিন্তু কাব্যের মাধ্যমে (মানসী পর্ব থেকে) কবি জীবনী যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাই 'আত্মপরিচয়' রূপে লিখে গেছেন। অর্থাৎ কবি গদ্যের মাধ্যমে লিখেছেন জীবনস্মৃতি আর গীতিকাব্যের মাধ্যমে লেখেন জীবনকাহিনী অথবা সত্যিকারের জীবন। এই কারণেই মানসী থেকে বলাকা পর্যন্ত তিনি 'অজানার ঘেরের মধ্যে'ই রয়ে গেছেন। এই অজানার ঘেরই কবির জীবনের ও কাব্যের শ্রেষ্ঠ পর্ব, কবি রবীন্দ্রনাথ থেকে কর্মী ও মহামানব রবীন্দ্রনাথের উত্তরণের কাহিনী এবং পরবর্তীকালের বহু কবিতার উৎসমূল। রবীন্দ্রনাথের আদিরসাত্মক কবিতার উৎস, তাঁর নব যৌবনের লেখা কড়ি ও কোমল কাব্যগ্রন্থে, ভালোবাসার 'সংশয়ের আবেগ' রয়েছে মানসী কাব্যগ্রন্থে, যুগ্মসত্তার দ্বন্দ্ব ও 'দু:সময়ের' কবিতা পাওয়া যায় চিত্রা ও কল্পনাতে এবং অকাল বসন্তের প্রেমের কবিতার উৎস, শেষ যৌবনের লেখা ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থে, যা' মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে 'লীলা' নামে অভিহিত এবং পরবর্তীকালে কবি শিলাইদহকে 'লীলালোকের লীলাক্ষেত্র' বলে পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে উল্লেখ করেছেন (৫৬৬ পৃষ্ঠা)। তারপরই রয়েছে আধ্যাত্মিক সত্তার বিকাশ 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে, যা' কল্যাণ ধর্মী রূপ নিয়ে 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশে'র মধ্যে নিহিত।

কবিব বিস্মরণধর্মী যৌবনের লেখা কড়ি ও কোমল থেকে স্মরণ পর্যন্ত এই বিভিন্ন পর্বের বিভিন্ন কবিতা সুসংবদ্ধভাবে কবি-মনের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়েও একটি অখণ্ড আত্মারূপে প্রকাশ পেয়েছে। আবার এই কাব্যগ্রন্থগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে দুটি ডায়ারি ছিন্নপত্র চিঠিপত্রগুলি ও কবির ভৌগোলিক অবস্থান। মানসী কাব্যগ্রন্থের প্রথম দিকের বহু কবিতা লেখা হয়েছে কবি-কল্পনার রোম্যান্টিক সহর গাজীপুরে, আর শেষ ভাগে লেখা হয়েছে সমুদ্রের উপর য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারীতে। তাই সেই সময়ের (১৮৮৮-৯০) কবি মনের গতি প্রকৃতি নির্ণযে এই ডায়ারিটি, চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ডটি ও গাজীপুরের পরিবেশ অত্যন্ত মূল্যবান। আবাব ছিন্নপত্রের (১৮৯১-৯৫) সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থ দুটি এবং কুষ্টিয়ার ব্যবসা (ছিন্নপত্র ২৩১ নং), যা কবির 'দুঃসময়' রূপে চিত্রা ও কল্পনাতে 'হতভাগ্যের গানের' মধ্যে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। কবির সবচেয়ে প্রিয় ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থখানি লেখা হয়েছে 'কবির লীলা-লোকের লীলাক্ষেত্র শিলাইদহে' (১৩০৭), যার বিশ্লেষণ রয়েছে পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে এবং পরিচয় দিয়েছেন পূরবীতে। অর্থাৎ ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থের 'চাবি' রয়েছে পূরবীর ক্ষণিকা কবিতায়, পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে এবং চিঠিপত্র অষ্টম খণ্ডে। এই কারণেই অজানার ঘের যদি উন্মোচন করা না যায় এবং কবিতার উৎসের সন্ধান যদি পাওয়া না যায় তবে রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা অর্থহীন হয়ে থাকবে এবং কবির জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ যৌবন অথবা development অন্ধকারে ঢাকা থাকবে। এই 'অজানার ঘেরের মধ্যে'ই রয়েছে কবির অপরিণত ও অপ্রকাশিত জীবন এবং শিল্প কর্মের সৃষ্টি। অর্থাৎ শিল্পী ও 'রোম্যান্টিক' কবি (নবজাতক) সৃষ্টি করেছেন তাঁর যৌবনের মানসভূমি—ভাবকল্পনার অসম্পূর্ণ মানসীকে যা' সম্পূর্ণ হল পূজারিণী (কল্যাণী) নারী ক্ষণিকাতে। তাই কবি শেষ সপ্তক নয় সংখ্যক কবিতায় তাঁর অপরিণত অপ্রকাশিত শিল্পী জীবনের কিছু কিছু আভাস দিয়েছেন—

অপ্রকাশের পর্দা টেনেই কাজ করেন গুণী,
ফুল থাকে কুঁড়ির অবগুণ্ঠনে,
শিল্পী আড়ালে রাখেন অসমাপ্ত শিল্পপ্রয়াসকে,
কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়,
নিষেধ আছে সমস্তটা দেখতে পাওয়ার পথে।
আমাতে তাঁর ধ্যান সম্পূর্ণ হয়নি,

তাই আমাকে বেষ্টন করে এতখানি নিবিড় নিস্তব্ধতা।
তাই আমি অপ্রাপ্য, আমি অচেনা
অজানার ঘেরের মধ্যে এ সৃষ্টি রয়েছে তাঁরি হাতে,
কারো চোখের সামনে ধরবার সময় আসেনি,
সবাই রইলো দূরে,—
যারা বললে "জানি", তারা জানল না।

স্রষ্টা ও শিল্পী কবি 'অজানার ঘেরের মধ্যে' অপ্রকাশের পর্দা টেনে' অনুরাগের ধারা দিয়ে প্রথম যৌবনে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কবি কল্পনার রোম্যান্টিক সহর গাজীপুরে 'সংশয়ের আবেগের' মধ্যে সৃষ্টি করলেন তাঁর ভাব কল্পনার অসম্পূর্ণ মানসীকে (চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড, আত্মপরিচয় ২১০ পৃষ্ঠা)। প্রথম যৌবনের কবি কল্পনার এই অসম্পূর্ণ অর্ধ মানবী মানসীই বহু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সাংসারিক দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে (কুষ্টিয়ার ব্যবসা) কবির শেষ যৌবনে শিলাইদহে পরিপূর্ণ মানবী রূপে পূজারিণী (কল্যাণী) নারী ক্ষণিকাতে সম্পূর্ণ হল। এবং সেই সঙ্গে কবি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে শিলাইদহে কল্যাণকর্মের 'উদ্‌বোধন' করলেন। এই অসম্পূর্ণ 'মানসী' থেকে সম্পূর্ণ 'ক্ষণিকা' পর্যন্ত কবির যৌবনের শিল্পকর্মের সৃষ্টিভূমি বা মানসভূমি এবং সংসারের 'লীলালোকের লীলাক্ষেত্র' (পশ্চিম-যাত্রীর-ডায়রি ৫৬৬ পৃষ্ঠা)। এটাকেই কবি 'অজানার ঘের' অথবা 'অপ্রকাশের পর্দা' বলে উল্লেখ করেছেন। কবির যৌবনের মানসভূমির ধ্বংসের পর (জন্মদিন ১১ সংখ্যক) অথবা ক্ষনিকার বিনাশের পর বিরহী কবি মহাযুদ্ধের পটভূমিকায়, 'কালের আলোতে' (বলাকা ১৯১৪) ব্যথার মধ্যে রামগড়ে মৃত্যুর রূপকে ভেঙে সৃষ্টি করলেন 'মুখ ঢাকা বধূ' রূপে 'ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া' অগোরবা অশরীরী নারী অধরাকে (বলাকা পাঁচ সংখ্যক, শেষ সপ্তক আটত্রিশ সংখ্যক, জন্মদিন এগারো সংখ্যক, আরোগ্য সাতাশ সংখ্যক, বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা ১৫১ পৃষ্ঠা ক্ষিতিমোহন সেন)। এই অধরাই কবির বৃদ্ধ বয়সের মানসভূমি। এই শেষ বয়সের মানসভূমি অধরাকে 'সুরকার ও গীতকার রবীন্দ্রনাথ' (বাঁশিওয়ালা, শেষ সপ্তক ছয় সংখ্যক) শ্যামলী কাব্যগ্রন্থে নূতন নাম ও পরিচয় দিয়ে প্রথম যৌবনের বাংলা দেশের মেয়ে রূপে পরিবর্তিত করে দিলেন— "শুনি আমার নূতন নাম"/—এই বলে তোমাকে চিঠি লিখেছি,/মনেআছে তো ?/ 'আমি তোমার বাংলা দেশের মেয়ে।' শ্যামলী নারী বাংলা দেশের মেয়ের' প্রথম সূচনা শেষ সপ্তক চুয়াল্লিশ সংখ্যক কবিতায়, যা' তিনি মাটির ঘর 'শ্যামলী'র গৃহপ্রবেশের পূর্বে লিখেছেন (১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ ৭৫ তম জন্মদিবস)। কবির শেষ

বয়সের মানসভূমি-অধরা ও বাংলা দেশের মেয়ে এবং প্রথম যৌবনের মানসভূমি—মানসী ও ক্ষণিকা, কবি কল্পনার এই অশরীরী নারীমূর্তিগুলিকে সৃষ্টি করে কবি প্রেমের ধারা দিয়ে কাব্যে ব্যপ্ত করে দিয়েছেন। এই অশরীরী নারীমূর্তিগুলিই কবির কাব্যে 'ছায়াসঙ্গিনী' (বিচিত্রিতা) রূপে বর্ণিত হয়েছে। তাই কবির কাব্যের অন্তরালে পাওয়া যায় কবি-কল্পনাব এই অশরীরী ছায়ারূপিণী শ্যামলী নারীমূর্তিকে, যা একটি নিজস্ব রূপ ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমুজ্জল হয়ে কাব্যের মধ্যে সম্পূর্ণতা লাভ করে 'প্রচ্ছন্ন' হয়ে রয়েছে। কল্পনা প্রবণ 'রোম্যানন্টিক' প্রেমিক (নবজাতক) শিল্পী রবীন্দ্রনাথ (মানসী) নিজের এই সৃষ্টি কর্মের বিশ্লেষণ করে পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে লিখেছেন- 'মেযেদের সৃষ্টিব আলো যেমন এই প্রেম তেমনি পুরুষের সৃষ্টির আলো কল্পনাবৃত্তি। পুরুষের চিত্ত আপন ধ্যানের দৃষ্টি দিয়ে দেখে, আপন ধ্যানের শক্তি দিয়ে গড়ে তোলে। we are the dreamers of dreams এ কথা পুরুষের কথা। পুরুষের ধ্যানই মানুষের ইতিহাসে নানা কীর্তির মধ্যে নিরন্তর রূপ পরিগ্রহ করছে। .... পুরুষের এই সমগ্রতার পিপাসা তার প্রেমেও প্রকাশ পায়। সে যখন কোনো মেয়েকে ভালবাসে তখন তাকে একটি সম্পূর্ণ অখণ্ডতায় দেখতে চায় আপনার চিত্তের দৃষ্টি দিয়ে ভাবের দৃষ্টি দিয়ে। পুরুষের কাব্যে বার বার তার পরিচয় পাওয়া যায়। শেলির এপিসিকীডিয়ন্ পড়ে দেখো' (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২৪) তাই রবীন্দ্রনাথ চিত্তের দৃষ্টি দিয়ে ভাবের দৃষ্টি দিয়ে অনুরাগের ধারা দিয়ে নব যৌবনের শরৎ-পর্যায়ের শরৎ-লক্ষ্মীর (গীতোচ্ছ্বাস—কড়ি ও কোমল), বন্দনা করেছেন অসম্পূর্ণ মানসী মূর্তিতে এবং ক্ষণিকার পরবর্তী অধ্যায়ে শ্যামলী নারীর সৌন্দর্যকে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ দিয়ে বিশ্বলক্ষ্মীরূপে বন্দনা করেছেন তাঁর কাব্যে সাহিত্যে ও গানে। কবি কল্পনার এই শ্যামলী নারীর মানসমূর্তি, এবং কবির প্রকৃত জীবনী সম্বন্ধে আত্মপরিচয়ে লিখেছেন—

'জগতের মধ্যে যাহা অনির্বচনীয় তাহা কবির হৃদয়দ্বারে প্রত্যহ বারংবার আঘাত করিয়াছে, সেই অনির্বচনীয় যদি কবির কাব্যে বচন লাভ করিয়া থাকে—জগতের মধ্যে যাহা অপরূপ তাহা কবির মুখের দিকে প্রত্যহ আসিয়া তাকাইয়াছে সেই অপরূপ যদি কবির কাব্যে রূপলাভ করিয়া থাকে—যাহা চোখের সম্মুখে মূর্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে তাহা যদি কবির কাব্যে ভাবরূপে আপনাকে ব্যপ্ত করিয়া থাকে—যাহা অশরীর ভাবরূপে নিরাশ্রয় হইয়া ফিরে তাহাই যদি কবির কাব্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণতালাভ করিয়া থাকে—

তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সেই সফল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী। সেই জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিটিকে কাব্যরচয়িতার জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা।' অর্থাৎ কবির গীতিকাব্যের মধ্যে যে ছায়ারূপিণী অশরীরী নারীমূর্তি সৃষ্টি করেছেন, সেই নারীমূর্তির পশ্চাতেই রয়েছে কবির বিস্মরণধর্মী যৌবনের কাহিনী এবং এই যৌবন কাহিনীই কবির প্রকৃত জীবনী যা' অজানার ঘেরের মধ্যেই রয়ে গেছে।

এই অজানার ঘের অথবা 'বিস্মরণ ধর্মী' জীবনকে উন্মোচন করবার জন্যই পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে কবির জীবনীকারের উদ্দেশ্যে সর্তক করে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কথা প্রকাশ করে লিখেছেন—'তা ছাড়া, আমার ব্যক্তিগত জীবনের সব সত্যকেই আমি একটিমাত্র সরকারি বাটখারা দিয়ে ওজন করতে চাইনে, কিন্তু বিশেষ ঘটনাব বিশেষ তুলাদণ্ড তৈরি হয়ে উঠতে সময় লাগে। ঘটনা যখনই ঘটে তখনই সেটাকে পাওয়া যায় না। তখন সরকারি পরিমাপের আদর্শ যেটাকে দেখায় ভারী সেটাই হয়তো হাল্‌কা, যেটাকে বুঝি হাল্‌কা সেটাই হয়তো ভারী। দীর্ঘকালে আনুষঙ্গিক অনেক বাজে জিনিস ভুলে যাওয়ার ভিতর দিয়েই বিশেষ জিনিসের বিশেষ ওজন পাওয়া যায়।

যারা জীবনচরিত লেখে তারা সমসাময়িক খাতাপত্র থেকে অতিবিশ্বাস-যোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে লেখে; সেই অচল সংবাদগুলো নিজেকে না কমাতে না বাড়াতে পারে। অথচ, আমাদের প্রাণপুরুষ তার তথ্যগুলোকে পদে পদে বাড়িয়ে কমিয়েই এগিয়ে চলেছে। অতিবিশ্বাসযোগ্য তথ্য স্তূপাকার করে তা দিয়ে স্মরণস্তম্ভ হতে পারে, কিন্তু জীবনচরিত হবে কি করে? জীবনচরিত থেকে যদি বিস্মরণধর্মী জীবনটাই বাদ পড়ে তা হলে মৃত-চরিতের কবরটাকে নিয়ে হবে কী? আমি যদি বোকামি করে প্রতিদিনের ডায়ারি লিখে যেতুম তা হলে তাতে করে হত আমার নিজের স্বাক্ষরে আমার নিজের প্রতিবাদ। তা হলে আমার দৈনিক জীবনের সাক্ষ্য আমার সমগ্র জীবনের সত্যকে মাটি করে দিত।' আবার কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে কবি ছিন্নপত্রে লিখেছেন—'জীবনে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচারণ করা যায়, কিন্তু কবিতায কখনো মিথ্যাকথা বলি নে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের আশ্রয় স্থান।' কবি এই উক্তিগুলির মধ্যে এই কথাই দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছেন যে তাঁর জীবনের অতিবিশ্বাসযোগ্য তথ্য স্তূপাকার করেও কবির জীবনের আসল

সত্যকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কবির জীবনের আসল সত্য রয়েছে কবির কবিতায়—কাব্যগ্রন্থের মধ্যে এবং কবির বিস্মরণধর্মী জীবনের মধ্যে। বিশেষভাবে কবির সবচেয়ে প্রিয় ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থখানি রয়েছে বিস্মরণধর্মী জীবনের মধ্যে অথবা অজানার ঘেরের মধ্যে। তাই কবি বিস্মরণধর্মী জীবনকে উন্মোচন করবার জন্যই পূরবীতে ক্ষণিকার পরিচয় দিয়ে পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে বিশ্লেষণ করেছেন। কবি চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ডে লিখেছেন -'প্রভাতের সঙ্গে সায়াহ্নের যেমন একটা মিল আছে। তেমনি একটা স্বাতন্ত্র্যও আছে। প্রভাতের নবীন আলোয় মধ্যাহ্নের বাণী নেই, কিন্তু সায়াহ্নের পূর্ণতা গূঢ়ভাবে মধ্যাহ্নকে নিয়ে। খেলাঘর থেকে খেলাঘরেই ফিরতে হবে কিন্তু মাঝখানের যাত্রাটা মহামূল্য।' (মাঝখানের যাত্রা—মানসী থেকে বলাকা পর্যন্ত, ১৮৯০-১৯১৬,।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ, ছিন্নপত্র, আত্মপরিচয়, চিঠিপত্র ও ডায়ারি দুটির মাধ্যমে কবি-মনের গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করে অজানার ঘেরকে উন্মোচন করে কবির সত্য পরিচয়কে খুঁজে নিয়ে জীবনচরিতের সঙ্গে সংযুক্ত করা ভিন্ন আর কোনো উপায় নেই। কবির বিস্মরণধর্মী জীবন যদি উন্মোচন করা যায় তবেই কবির কবিতা, উপন্যাস নাটক, গান ও চিত্রকলার মর্মার্থের সন্ধান পাওয়া যায়, কারণ সবই একই রক্তসূত্রে গাঁথা। সবগুলি নিয়েই কবির জীবনের বৃত্ত রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সমালোচনার গুরু কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে জুবেয়ারের মত অনুবাদ করে লিখেছেন, 'লেখকের মনের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়াই সমালোচনার সৌন্দর্য।' আবার আত্মপরিচয়ে লিখেছেন—'সাহিত্য রচনায় লেখকের প্রকৃতি নিজের অগোচরে নিজের পরিচয় দেয়, সেটাই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ।' তাছাড়া রবীন্দ্রজীবনীর শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার রবীন্দ্রনাথ নিজেই। তাঁর যৌবনের বিস্মরণধর্মী জীবন ছড়িয়ে রেখেছেন তাঁর কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে, গানে, চিঠিপত্রে, ছিন্নপত্রে, আত্মপরিচয়ে, ডায়ারিতে, ও চিত্র কলায় এবং বহু কবিতার মর্মার্থ ও শব্দগত অর্থ তিনি নিজেই প্রচ্ছন্নভাবে বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন তাঁর কবিতায় ও সাহিত্যে এমন কি নিজের চরিত্র যৌবনের রবীন্দ্রনাথ) বিশ্লেষণ করে নিজেই ফোটাবার চেষ্টা করেছেন তাঁর কবিতায়, ছিন্নপত্রে, আত্মপরিচয়ে ও ডায়ারি দুটিতে। আবার নিজের জীবনকে ঋতু অনুসারে বিভক্ত করে তাঁর জীবন কাহিনীও প্রকাশ করেছেন, এবং দুর্লভ মুহূর্তের স্মৃতিগুলি কবির চিত্তপটে ধরে রেখে উপন্যাসে ও বহু কবিতায় লিখে রেখে গেছেন। বিশেষভাবে ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থখানি রচনা করেছেন কবির বর্তমানের (শিলাইদহ ১৩০৭) প্রতি

'নিমেষের' কাহিনী দিয়ে এবং ধ্বনির জগতে (বিরহ ও আনন্দধ্বনি) শিল্পী কবি সৃষ্টি করেছেন প্রথম্ যৌবনের ভাব কল্পনার অসম্পূর্ণ মানসীকে (গাজীপুর ১৮৮৮)।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলির পঠন পদ্ধতিরও নির্দেশ দেওয়া আছে আত্ম-পরিচয়ে ও কবির বিভিন্ন লেখাতে। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আপাততঃ একটা বইয়ের মধ্যে যে কবিতাগুলি টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন মনে হয়, তার মধ্যেও এমন একটা যোগ আছে, যদি দেখবার চেষ্টা করা যায় তা হলে দৃষ্টি পড়ে।' কবির একই উক্তি প্রথম কাব্যগ্রন্থাবলীর (১৩০৩ বঙ্গাব্দ) ভূমিকাতেও উল্লেখ করেছেন—'অনেক সময় কবিতা খণ্ড খণ্ড অবস্থায় পাঠকের নিকট অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়, কিন্তু পুঞ্জীভূত আকারে রচনাগুলি পরস্পরের সাহায্যে স্ফুটতর হইয়া দেখা দেয়, লেখকের মর্মকথাটি পাঠকের নিকট সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইয়া উঠে। একবার লেখকের সমস্ত রচনার সহিত সেইরূপ বৃহৎভাবে পরিচয় হইয়া গেলে তখন প্রত্যেক স্বতন্ত্র লেখা তাহার সমস্ত বক্তব্য বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে পারে।' কবি আত্মপরিচয়ে (১৮০ পৃষ্ঠা) নিজের কবিতা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—'কোন গীতিকাব্যরচয়িতার কোন্ কবিতা ভালো কোনটা মাঝারি, তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখানো সমালোচকের কাজ নহে। তাহার সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্ব কোন বাণীরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তাহাই বুঝিবার যোগ্য। কবিকে উপলক্ষ করিয়া বীণাপানি বাণী, বিশ্বজগতের প্রকাশশক্তি, আপনাকে কোন্ আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই দেখিবার বিষয়।' আবার নিজের কবিতা লেখার ধারার কথাও প্রকাশ করেছেন আত্মপরিচয়ে—'আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই—এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম তখন মনে করিয়াছি, আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে। কারণ, সেই খণ্ড কবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই—সেই তাৎপর্যটি কী তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না। এইরূপ পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি- তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল।'

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিগুলিকে অনুসরণ করে, তাঁর টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন কবিতাগুলিকে একত্রিত করে, তাকে সাজিয়ে (শ্রেণী বিন্যাস করে) অবিচ্ছিন্ন ধারায় কবি মনের গতি প্রকৃতির (উত্থান-পতনের) দিকে লক্ষ্য রেখে কবিতা-গুলির যমার্থ বুঝতে চেষ্টা করেছি। কবি-মনের গতি প্রকৃতির সঙ্গে বয়সানুসারে কবির কবিতাগুলিও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, :বিশেষভাবে শেষ যৌবনের ক্ষণিকা পর্ব পর্যন্ত। এই জন্য কবি-মনের গতি প্রকৃতি নির্ণয়ে, কবিতা রচনার স্থান, কাল পরিবেশ এই তিনটি প্রধান উপাদানের প্রয়োজন। কবি যে স্থানে, যে বয়সে কবিতা ও অন্যান্য সাহিত্য রচনা করেছেন, সেই স্থানে যে পরিবেশে বাস করতেন, সেই পরিবেশের প্রভাব এবং সেই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিশেষত্বগুলি ও বয়সা-নুসারে সেই সময়কার কবি মনের গতি প্রকৃতি, এবং দেশ ও কালেব প্রভাব সবই তাঁর কবিতায় জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র, ডায়ারি, চিঠিপত্র এবং সাহিত্যে প্রকাশ করে-ছেন। কবির জীবন ও কাব্যের বিশেষ বিশেষ পর্বের সঙ্গে বয়সানুসারে কবির ভৌগোলিক অবস্থান ও জড়িত রয়েছে, এবং এটাকেই 'রাবীন্দ্রিক ভূগোল' নামে অভিহিত করা যায়। আবার কবির শৈশব কৈশোর ও নব যৌবনের লেখা কাব্য-গ্রন্থ গুলির মধ্যে কবি-মনের তারতম্যগুলিও বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। অর্থাৎ কবির জীবন ও কাব্যের প্রথম পর্বে, যৌবন সমাগমের দরুণ কবি-মন যে ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, সেই ভাবগুলি তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবিতায় ধরে রেখেছেন। বিশেষভাবে কবির শৈশব-কৈশোরের বয়ঃসন্ধিকালের লেখা সন্ধ্যাসংগীতে, কৈশোর যৌবনের বসঃসন্ধিকালের লেখা ছবি ও গানে এবং নব যৌবনের লেখা কড়ি ও কোমল কাব্যগ্রন্থে। এই তিনটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে সন্ধ্যাসংগীতে রয়েছে কবির বয়:সন্ধিকালের অন্তর রহস্যের বিষাদ ও বেদনা। ছবি ও গানে 'রাহুর প্রেম' ও 'জাগ্রত স্বপ্নের' মধ্যে অনাগত 'কে' কবিতায় রয়েছে 'বাতায়ন বাসী' কবির দূরের বঁধূর 'সুখস্বপ্ন' ও রহস্যময় যৌবনের স্থায়ী আগমন। আর কড়ি ও কোমলে রয়েছে কবির নব যৌবনের 'যৌবন স্বপ্ন' ও 'গীতোচ্ছ্বাসের' মধ্য দিয়ে 'ক্ষণিক মিলনের' আনন্দ বেদনার কাহিনী, যা' তিনি নিজের গীতিকাব্যে লিখে গেছেন। কবির মনস্তত্ত্বমূলক কবিতা এব' অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনী ও কল্পনার সংমিশ্রণে রচিত বিচ্ছিন্ন কবিতাগুলি, একটির সঙ্গে আর একটি যুক্ত হয়ে তার তথ্যগুলোকে পদে পদে বাড়িয়ে কমিয়ে এগিয়ে চলেছে এবং কবির জীবনের একটি পর্বের সঙ্গে আরেকটি পর্ব যুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই অপ্রকাশিত জীবনের কাহিনী রচিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের ও কাব্যের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে প্রেম। এই প্রেমই কবিকে শেষ যৌবনে বৈরাগ্যের দিকে টেনে নিয়ে গেল—'কিন্তু সমস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এমন কিছু থাকা চাই, যার ইঙ্গিত ধ্রুবের দিকে, সেই বৈরাগ্যের দিকে যা অনুরাগকেই বীর্যবান ও বিশুদ্ধ করে' (আত্মপরিচয় ২১৫ পৃষ্ঠা)। কবি শৈশবে প্রেমকে খুঁজেছিলেন প্রকৃতির মধ্যে মানবীর মধ্যে, যৌবনে খুঁজেছিলেন দেহের ও রূপের মধ্যে (কড়ি ও কোমল)। এই রূপ ও দেহের মধ্যে প্রেমকে খুঁজে না পেয়ে 'ধ্যানের' (মানসী) মাধ্যমে খুঁজতে চেষ্টা করলেন। কবির এই সংশয়াকুল প্রেমই (সংশয়ের আবেগ-মানসী) অন্তর্দ্বন্দ্ব ও 'দুঃসময়ে'র মধ্যে 'ক্ষণিকা'তে কল্যাণরূপে দেখা দিল। প্রেমের এই কল্যাণরূপেকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করবার পরই কবির আধ্যাত্মিক সত্তার বিকাশ 'নৈবদ্য' কাব্যগ্রন্থে, যা' কল্যাণ ধর্মী রূপ নিয়ে 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশের' মধ্যে নিহিত। শেষ যৌবনে মৃত্যুর মধ্যে প্রেমের এই সত্যরূপ ও কল্যাণরূপকে উপলব্ধি করে কবির জীবনে অসীমের আবির্ভাব হল—'দুঃখবিপদ-বিরোধ মৃত্যুর বেশে অসীমের আবির্ভাব'—ক্ষণিকার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে এরই প্রকাশ। কবির জীবন ও কাব্যের মধ্যে প্রেমের এই কল্যাণ রূপ ও অসীমের প্রকাশ রয়েছে। অর্থাৎ কবির সংশয়াকুল প্রেম ভাব কল্পনার অসম্পূর্ণ 'মানসী' থেকে (ভাব) প্রেমের কল্যাণ রূপ নিয়ে কল্যাণী নারী (রূপ) 'ক্ষণিকা'য় পরিণত হল। কবির এই কল্যাণধর্মী প্রেম মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অরূপ নারী অধরাকে (অরূপ) সৃষ্টি করে (বলাকা ১৯১৪) মৈত্রী ও মানবকল্যাণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অসীমের দিকে প্রসারিত। এই ভাবেই কবি 'শেষ সাতাশের' (পূরবী-১৯২৪) মহামানব বিশ্বপ্রেমিক ও প্রেমিক রবীন্দ্রনাথে পরিণত হয়ে সীমার মধ্যে অসীমকে খুঁজে পেলেন। কবির জীবনে এই একটি মাত্রই পালা যার প্রথম সূচনা ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্য কাব্যে। এই নাট্য কাব্যে কবি নিজেরই জীবন নাট্যের ও কাব্যনাট্যের ভূমিকা রচনা করলেন (আত্মপরিচয় ১৭৮ পৃষ্ঠা)।

বারে বারে অসীমেরে দেখেছি সীমার অন্তরালে।
বুঝিয়াছি, এ জন্মের শেষ অর্থ ছিল সেইখানে,
সেই সুন্দরের রূপে
সে সংগীতে অনির্বচনীয়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থে বাল্য ও যৌবনের স্মৃতিগুলি বিচ্ছিন্নভাবে কবিতায় পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করেছেন। এর যে ভাবগুলি তিনি 'ভাষার অঞ্জলি'র জন্য প্রকাশ

করতে পারেন নি সেই ভাবগুলি তিনি চিত্রকলায় প্রকাশ করেছেন। আমি চিত্রকলা এবং অতীত স্মৃতি এই তুটি পৃথক লেখা সূত্রপঞ্জীর সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছি।

যিনি এই গ্রন্থখানি নামকরণে অলঙ্কৃত করলেন এবং যাঁর পরামর্শ ও প্রভূত সাহায্যের জন্য এই বই প্রকাশিত হল তাঁকে আমাব অসীম কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সাহায্য না পেলে আমার পক্ষে এই বই প্রকাশ করা সম্ভব হত না। অধ্যাপক শচীনন্দন সিংহ, শ্রীঅসিত চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্তা নন্দরাণী চৌধুরী মহাশয়ার কাছ থেকে প্রচুর উৎসাহ ও সাহায্য পেযেছি তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে ববীন্দ্র সাহিত্যের যাঁবা ধারক ও বাহক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী, ড: নীহাররঞ্জন রায়, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য ও সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায তাঁদের অমূল্য সময় নষ্ট করে আমার মতো অনভিজ্ঞা লেখিকার ছোটো লেখাটি (ক্ষণিকা অংশটি) পড়েছেন, ভুলত্রুটি দেখিয়েছেন কোথাও কোথাও মত পার্থক্য সত্ত্বেও উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেককে আমাব অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থে বিভিন্ন চরিত্রের বহু নারীকে পাওয়া যায়। তাঁদের রূপ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে তিনি নানাভাবে রূপায়িত করে নারী এবং নারী-চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাই তাঁর কাব্যে প্রত্যেকটি নারীই তাঁদের আপন চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল ও স্বতন্ত্র। কবির বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে যে কবিতাগুলি তাঁদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন সেই কবিতাগুলির মাধ্যমেই তাঁদের বিভিন্ন চারিত্রিক সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে; এবং কবির সঙ্গে বিভিন্ন সম্পর্কের ধারাও প্রকাশিত। রবীন্দ্র জীবনীতে নারীর প্রভাব অত্যধিক, কারণ এঁদের প্রেরণাই কবিকে উদ্দীপিত করে পূর্ণ বিকাশের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। তাই কবি এই প্রেরণাদাত্রী নারীদের রূপ এবং চারিত্রিক গুণগুলি নানাভাবে ফুটিয়ে তুলে তাঁদের পরিচয় নিয়ে, নিজেরাই জীবন কাহিনী রচনা করেছেন। এবং এই নারীদের বিশেষ বিশেষ দানের কথা স্মরণ করেছেন—'কে সামনে এল, কে পেছনে রইল সেটা সামান্য। অসামান্য সেইটাই যেটা তার দান, কি উপায়ে দিল তা নয়—কি দিল, (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ)।

কবির জীবনে পাঁচজন নারীর বিপুল অবদান আছে, এবং এঁদেরই প্রেরণা কবিকে কাব্যে, সঙ্গীতে, চিত্রকলায় ও কল্যাণকর্মে উদ্দীপিত করে শেষ সাতাশের মহামানব রবীন্দ্রনাথে পরিবর্তিত করে দিল। তাই কবির কাব্যগ্রন্থে একদিকে রয়েছে এই বিচিত্ররূপিণী, আকাশচারিণী, অসামান্য বিদূষী নারীদের কাহিনী, আবার অন্যদিকে রয়েছে একাকিনী ভূতলবাসিনী অগৌরবা কল্যাণী নারীর কাহিনী, এই দুই ধারার প্রবাহ নিয়েই কবির কাব্যগ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়েছে। চিত্রার ভূমিকায় আছে, 'বাইরে যার প্রকাশ বাস্তবে সে বহু, অন্তরে যার প্রকাশ সে একা। এই দুই ধারার প্রবাহেই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। জগতে বিচিত্র-রূপিণী আর অন্তরে একাকিনী কবির কাছে এই দুইই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য।' তাই কবি গদ্যে পদ্যে এবং জীবনে বহু বিচিত্ররূপিণী নারীর কথা ব্যক্ত করে কাব্যগ্রন্থে উজ্জ্বলভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। এই বিচিত্ররূপিণী নারীরাই ছিলেন কবির আকাশ, যাঁদের কবির ভালো লেগেছিল (পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি ৫৭৭, পৃষ্ঠা শেষ সপ্তক পয়াতাল্লিশ সংখ্যক), এবং যাঁদের বহু সমাদর করে

বরণ করে নিয়েছিলেন (বলাকা বিয়াল্লিশ সংখ্যক)। আবার ধীর স্থির একাকিনী অন্তরবাসিনী, যিনি অশরীরী নারীরূপে মলিন বেশে 'প্রচ্ছন্ন' (প্রচ্ছন্ন—খেয়া কাব্যগ্রন্থ—বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, ক্ষিতি মোহন সেন ১০৪, ১·৫ পৃষ্ঠা) হয়ে রয়েছেন, সেই অগৌরবা কল্যাণী নারীর কথাও তাঁর কাব্যে প্রকাশিত। তিনিই কবির ভূতল, যাঁকে কবি ভালোবেসেছিলেন, এবং যাঁকে সমাদর করেন নি (বলাকা ৪২ সংখ্যক) কবির কাছে দুইই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য)।

কবির জীবনের এক-এক পর্যায়ের সঙ্গে এক একটি ঋতুর আধিপত্য রয়েছে। এবং বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ ও বিভিন্ন নারী (কাব্য লক্ষ্মী) সেই বিশেষ বিশেষ ঋতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে কবির জীবনকে ও কাব্যকে প্রভাবান্বিত করে সেই সময়ের প্রেরণাদাত্রী ও কাব্যলক্ষ্মীরূপে নিরূপিত হয়েছেন। কবির জীবনে ও কাব্যে সে সময়ে ও যে ঋতুতে এই প্রেরণাদাত্রী নারীদের আগমন কবি সেই ঋতু অনুসারে নামকরণ করে তাঁদের পরিচয় দিয়েছেন। এবং এই বিভিন্ন ঋতুর নামকরণের মধ্য দিয়ে কবির জীবনের ও কাব্যের বিভিন্ন পর্যায়ের কথা প্রকাশিত। কবির জীবন দুই প্রধান ঋতুতে বিভক্ত—শৈশবের বর্ষাকাল,—বনফুল থেকে ছবি ও গান, এবং যৌবনের শরৎকাল—কড়ি ও কোমল থেকে নৈবেদ্য।

কবি জীবনস্মৃতিতে শৈশবের বর্ষা ও যৌবনের শরৎকাল সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—'সেই বাল্যকালের বর্ষা এবং এই যৌবনকালের শরতের মধ্যে একটা প্রভেদ এই দেখিতেছি যে, সেই বর্ষার দিনে বাহিরের প্রকৃতিই অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সমস্ত দলবল সাজসজ্জা এবং বাজনা-বাদ্য লইয়া মহাসমারোহে আমাকে সঙ্গদান করিয়াছে। আর, এই শরৎকালের মধুর উজ্জ্বল আলোটির মধ্যে যে-উৎসব তাহা মানুষের। মেঘরৌদ্রের লীলাকে পশ্চাতে রাখিয়া সুখদুঃখের আন্দোলন মর্মরিত হইয়া উঠিতেছে, নীল আকাশের উপরে মানুষের অনিমেষ দৃষ্টির আবেশটুকু একটা রঙ মাখাইয়াছে, এবং বাতাসের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের আকাঙ্খাবেগ নিশ্বসিত হইয়া বহিতেছে।'

কবির এই দুই প্রধান ঋতুর মধ্যে কাব্যলক্ষ্মীর (তিনজন কাব্যলক্ষ্মী ও একজন প্রেরণাদাত্রী) আবির্ভাব হয়েছিল, সেই নারীদের বিভিন্ন ঋতুর নামানুসারে সম্বোধন করে, তাঁর জীবন ও কাব্যকে পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন কবি-কাহিনী থেকে স্মরণ ১৩০৯।

কবি জীবনস্মৃতিতে নিজের জীবন কাব্যকে ঋতু অনুসারে বিভক্ত করেছেন।

বর্ষাকাল—কবির শৈশব—কবি কাহিনী থেকে ছবি ও গান। কবির শৈশব থেকে নব যৌবনের সূচনা পর্যন্ত বর্ষাকাল রূপে নিরূপিত করেছেন (১৮৭৮—১৮৮৪)।

বর্ষাপর্যায়ের প্রথম পর্ব—কবির শৈশব।

কাব্যলক্ষ্মী—আন্না তরখড় (শ্রাবণনিশি)। 'তারা দেখা দিয়েছিল কেউ বা বনের ছায়ায়'—কবির প্রথমা প্রিয়া 'কৈশোরিকা'।

কাব্যগ্রন্থ—কবি কাহিনী (১৮৭৮), ভগ্নহৃদয় (১৮৮২), নলিনী (১৮৮৪)।

বর্ষা পর্যায়ের শেষ পর্ব—শৈশব ও কৈশোরের সন্ধিঃকাল থেকে নব যৌবনের সূচনা পর্যন্ত। ***'বাতায়নবাসী কবি'।***

কাব্যলক্ষ্মী—কাদম্বরী দেবী (হে পুরাতন সহচরী। 'কেউ বা নদীর ধারে'—গঙ্গার তীরে চন্দননগর) কবির কাব্যসঙ্গিনী ও কাব্যের প্রেরণাদাত্রী নারী।

কাব্যগ্রন্থ—সন্ধ্যা সংগীত (১৮৮২), প্রভাত সংগীত (১৮৮৩), ছবি ও গান (১৮৮৪)।

কবির ভৌগোলিক অবস্থান—চন্দননগরের গঙ্গারতীর। কবির সন্ধ্যা সংগীত কাব্যগ্রন্থখানির সঙ্গে যুক্ত।

শরৎকাল—কবির যৌবন—কড়ি ও কোমল থেকে নৈবেদ্য। কবির নব যৌবন থেকে শেষ যৌবন পর্যন্ত শরৎকাল (১৮৮৬—১৯০১)।

শরৎ পর্যায়ের প্রথম পর্ব—কবির নব যৌবনের নব বসন্ত। আরম্ভ বেলাকার সাতাশের 'কবি রবীন্দ্রনাথ'।

কাব্যলক্ষ্মী—মৃণালিনী দেবী (শরৎ লক্ষ্মী)। 'নূতন' (কড়ি ও কোমল) এবং বসন্তের নারী, যাঁর আবির্ভাবে আদিরসাত্মক কবিতার সূত্রপাত।

কাব্যগ্রন্থ—কড়ি ও কোমল (১৮৮৬), মানসী (১৮৯০)। য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী (১৮৯০), চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড এবং কবির ভৌগোলিক অবস্থান (গাজীপুর) মানসী কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত।

শরৎ পর্যায়ের দ্বিতীয় পর্ব—পূর্ণ যৌবন, কবির 'বসন্ত দিন'।

প্রেরণাদাত্রী—ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী (লয়ে তোমার পুষ্প পক্ষী—কবির স্নেহভাজন নারী) সংগীতের প্রেরণাদাত্রী—ক্ষণিকার পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত সংগীতের তত্ত্বাবধায়ক ও সংরক্ষক।

কাব্যগ্রন্থ—সোনার তরী (১৩০০), চিত্রা (১৩০২)। এই সময়ের মনোভাব কবি 'ছিন্নপত্রে' বিশ্লেষণ করেছেন ৭ ডিসেম্বর ১৯২৪। ছিন্নপত্র—১৮৯১—৯৫।

শরৎ পর্যায়ের শেষ পর্ব—শেষ যৌবনের শেষ বসন্ত বা অকাল বসন্তের ঘন বরষা।

কাব্যলক্ষ্মী—মৃণালিনী দেবী (কল্যাণী নারী—নূতন আঁখি)। 'কেউ বা ঘরের কোণে'—গৃহলক্ষ্মী। কবির মঙ্গলকর্মের প্রেরণাদাত্রী 'পূজারিণী নারী'। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে কবি শিলাইদহে কর্মযজ্ঞের 'উদ্‌বোধন' করলেন। অধ্যাত্মিক সত্তার বিকাশ (নৈবেদ্য)।

কাব্যগ্রন্থ—ক্ষণিকা (১৯০০), নৈবেদ্য (১৯০১)। চিঠিপত্র ৮ম খণ্ড ও পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারিতে 'ক্ষণিকার' বিশ্লেষণ রয়েছে ৫ অক্টোবর ১৯২৪, এবং পূরবীতে 'ক্ষণিকার' পরিচয় দিয়েছেন।

শেষ সাতাশের শেষ বসন্ত-পূরবী—শেষ সাতাশের নিঃসঙ্গ কবি ***মহামানব রবীন্দ্রনাথ***—৫ অক্টোবর ১৯২৪, ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯২৫ পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি।

প্রেরণাদাত্রী—ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো (তপস্বিনী নারী)। 'কেউ বা পথের বাঁকে'—কবির বিদেশী ফুল ও চিত্রকলার প্রেরণাদাত্রী।

কাব্যগ্রন্থ—পূরবী (১৯২৪—২৫)। পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে পূরবীর কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করে 'ক্ষণিকার' পরিচয় দিয়েছেন (ক্ষণিকা—পূরবী—৬ অক্টোবর ১৯২৪)।

পূরবী—অতীত বসন্তের (কড়ি ও কোমল—ক্ষণিকা) শেষ রাগিণী (গান)।

বর্ষাকাল—কবির শৈশব

১৮৭৮—১৮৮৪

“বাতায়নবাসী কবি”—(ছবি ও গানের ভূমিকা)

কবির শৈশব থেকে যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত (কৈশোর যৌবনের বয়ঃসন্ধি কাল), এবং সেই সময়ের লেখা বনফুল থেকে ছবি ও গান কাব্যগ্রন্থ, বর্ষাঋতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে। কবির বাল্যকালের এই বর্ষার দিনে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একটি সহজ ও নিবিড় যোগ ছিল। কবি বাল্যকালের জীবন সম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন—'জীবনের এক-এক পর্যায়ে এক একটি ঋতু আধিপত্য গ্রহণ করিয়া থাকে। বাল্যকালের দিকে যখন তাকাইয়া দেখি তখন সকলের চেয়ে স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে তখনকার বর্ষার দিনগুলি। বাতাসের বেগে জলের ছাঁটে বারান্দা একেবারে ভাসিয়া যাইতেছে, সারি সারি ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ হইয়াছে, প্যারীবুড়ি কক্ষে একটা বড়ো ঝুড়িতে তরিতরকারি বাজার করিয়া ভিজিতে ভিজিতে জলকাদা ভাঙ্গিয়া আসিতেছে, 'আমি বিনা কারণে দীর্ঘ বারান্দায় প্রবল আনন্দে ছুটিয়া বেড়াইতেছি।'

বর্ষা পর্যায়ের প্রথম পর্ব—

কাব্যলক্ষ্মী—'এসো আমার শ্রাবণ নিশি'।

রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সের বহু রচনায় প্রেরণাস্বরূপা ছিলেন আন্না তরখড়। কবি এঁর নাম দেন 'নলিনী'। কবির কাব্যগ্রন্থের প্রথম যুগে, অপরিণত মনের প্রদোষালোকের প্রথম স্তরের প্রথম পর্বে, কল্পনাপ্রবণ ও আবেগপ্রবণ কবির জীবনে যে কৈশোরিকার আগমন হয়েছিল, সেই প্রথমা প্রিয়ার উদ্দেশ্যে লিখেছেন কবি-কাহিনী, ভগ্নহৃদয়, নলিনী, মায়ার খেলা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এবং বহু গান, আর পরবর্তীকালের কবিতায় লিখেছেন আমি-হারা, উপহার, স্মৃতিপ্রতিমা, কিশোর প্রেম, কনি ও কৈশোরিকা। কবি-কাহিনী, ভগ্নহৃদয়, নলিনী, মায়ার খেলাব বিষয়বস্তু প্রায় একই ধরণের। নায়ক যে শান্ত ভালোবাসা প্রথম জীবনে তাঁর বাল্যসঙ্গিনীর কাছে পেয়েছিলেন সেই ভালোবাসার মর্যাদা বুঝতে না পেরে অন্য এক লীলাময়ী ও ছলনাময়ী নারীর রূপে মোহিত হয়ে সেখানে প্রত্যাখ্যাত হয়ে পুনরায় সেই বাল্যসঙ্গিণীর কাছে ফিরে আসেন। কবি প্রথম পর্বের কাব্যগ্রন্থে লিখেছেন—

আগে একদিন কবি মুগ্ধ প্রকৃতির রূপে
অরণ্যে অরণ্যে একা করিত ভ্রমণ,
এখন দুজনে মিলি ভ্রমিয়া বেড়ায় সেথা
দুই জন প্রকৃতির বালক বালিকা।

সুদূর কানন তলে কবিরে লইয়া যেত
নলিনী, সে যে এক বনেরি দেবতা।

কবির কাব্যগ্রন্থের প্রথম যুগের প্রথম পর্বে প্রকৃতির বালক বালিকার মতোই কবি ও কবির প্রথমা প্রিয়াকে নিয়ে কল্পিত কাব্য কাহিনী রচিত হয়েছে। এবং বনফুল ও কবি কাহিনী কাব্যগ্রন্থে কবিতাকে মোহিনী কল্পনে! 'শুন কল্পনা বালা' বলে সম্বোধন করেছেন। আবার বর্ষা পর্যায়ের শেষ পর্বে সন্ধ্যা সংগীতে, কবির প্রথম যৌবন সমাগমের দরুণ, ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরে নিজের মধ্যেই নিজের যে আবর্তন ও যুদ্ধ সুরু হয়েছিল, সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে কবি শৈশবের প্রথমা প্রিয়া পুরাতন সখীকে কবির শূন্য হৃদয়ের মধ্যে আহ্বান করে নিলেন। এবং তাঁর স্মৃতির মন্দিরখানি উজ্জ্বল করে অতীতের সেই কল্পনা জগতের পুরাতন বিশ্বকে পুরনায় ফিরে পেতে চাইলেন 'আমি হারা' ও 'উপহার' কবিতায়। আর নবযৌবনের নববসন্তের সূচনায় 'ছবি ও গানে' শৈশবের স্মৃতিময়ী মায়া 'স্মৃতি-প্রতিমা' বাল্য সঙ্গিণী কবির শূন্য হৃদয়ে আসন পাতেন।

জীবনস্মৃতিতে 'কবি কাহিনী' বিষয়ে মন্তব্য রয়েছে—'যে'-বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখেন নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা। সেই জন্য ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে—লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে, ইহা তাহাই' (জীবনস্মৃতি)। আবার নিজের বাল্য রচনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিপিবদ্ধ করেন—'যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার অধিকাংশের জন্য লজ্জা বোধ হয় বটে, কিন্তু তখন মনের মধ্যে যে একটা উৎসাহের বিস্ফার সঞ্চারিত হইয়াছিল নিশ্চয়ই তাহার মূল্য সামান্য নহে। সে কালটা তো ভুল করিবারই কাল বটে কিন্তু বিশ্বাস করিবার, আশা করিবার, উল্লাস করিবারও সময় সেই বাল্যকাল। সেই ভুলগুলিকে ইন্ধন করিয়া যদি উৎসাহের আগুন জ্বলিয়া থাকে, তবে যাহা ছাই হইবার তাহা ছাই হইয়া যাইবে কিন্তু সেই অগ্নির যা কাজ তাহা ইহজীবনে কখনোই ব্যর্থ হইবে না।'

তাই পরবর্তীকালের লেখা 'কৈশোরিকা' (বীথিকা) কবিতাটিতে কবি নিজের জীবনের প্রথম প্রণয় কাহিনীর কথা প্রকাশ করেছেন। এই কবিতাটিতে কবি প্রথমা প্রিয়াকে কৈশোর জীবনের আনন্দের মধ্যে তাঁর কাব্যতরণীতে আহ্বান করে কাব্যলক্ষ্মীরূপে বরণ করে নিলেন—

আমি কহিলাম, "তোমাতে আমাতে চলো,

তরুণ রৌদ্র জলে করে ঝলোমলো,—
নৌকা রয়েছে ঘাটে।"

এই কৈশোরিকাই কবির প্রথমা প্রিয়া ও প্রথমা কাব্যলক্ষ্মী যাঁর প্রথম পদার্পনে কবির আনন্দময় কৈশোর জীবনের কাব্যতরণী পূর্ণ হয়।

পেলব প্রাণের প্রথম পসরা নিয়ে
সে তরণী—' পরে পা ফেলেছ তুমি প্রিয়ে,
পাশাপাশি সেথা খেয়েছি ঢেউয়ের দোলা।
কখনো যা কথা কয়েছিলে কানে কানে,
কখনো বা মুখে ছলোছলো দুনয়ানে
চেয়েছিলে ভাষা ভোলা।

কবির শেষ যৌবনে অকাল বসন্তের আগমনে (১৩০৭) ক্ষণিকায়, যৌবনের হিসাব-নিকাশের জন্য অতীত কৈশোরের প্রথমা প্রিয়াকে 'অনবসর' কবিতায় পরিহাস ছলে আহ্বান করে তাঁর উদ্দেশ্যে লিখলেন—'এসো আমার শ্রাবণ নিশি—তুমি এসো।'

কাব্যগ্রন্থ—

কবি কাহিনী—ভারতীতে মুদ্রিত আকারে প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ। বয়স ষোল।

ভগ্নহৃদয়—'বিলাতে আর একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল। কতকটা দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইহা সমাধা করি। ভগ্নহৃদয় যখন আরম্ভ করেছিলেম তখন আমার বয়স আঠারো।'

কবির বাল্যকালের এই বর্ষা পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থের প্রথম পর্ব সম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে আছে, 'আমার পনেরো ষোলো হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ তেইশ বছর পর্যন্ত এই যে একটা সময় গিয়াছে ইহা একটা অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল ছিল। যে যুগে পৃথিবীতে জলস্থলের বিভাগ ভালো করিয়া হইয়া যায় নাই, তখনকার সেই প্রথম পঙ্কস্তরের উপর বৃহদায়তন অদ্ভুত-আকার উভচর জন্তুসকল আদিকালের শাখাসম্পদহীন অরণ্যের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিত। অপরিণত মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলো সেইরূপ পরিমাণ বহির্ভূত অদ্ভুতমূর্তি ধারন করিয়া একটা নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহারা আপনাকেও জানে না, বাহিরে আপনার লক্ষ্যকেও জানে না। তাহারা নিজেকে কিছুই জানে না বলিয়া পদে পদে আর-একটা-কিছুকে নকল করিতে থাকে।'

বর্ষা পর্যায়ের শেষ পর্ব

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র থেকে ছবি ও গান (১৮৭৮-১৮৮৪)।

কাব্যলক্ষ্মী—'হে পুরাতন সহচরী।'

কবির শৈশব থেকে কৈশোর যৌবনের সন্ধিঃকালে পর্যন্ত যে 'স্নেহময়ী' করুণাময়ী (ছবি ও গান) ও অসামান্যা বিদুষী নারী শৈশবের অনাদৃত কবিকে, নিজেব স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসা দিযে কবির জীবনকে আনন্দে অভিষিক্ত করেছিলেন ; কৈশোর জীবনের কাব্যতরণীকে ঠেলে দিয়েছিলেন পূর্ণতার লক্ষ্যে— তিনিই কবির নূতন বৌঠান কাদম্বরী দেবী। জীবনের শেষ পর্বে পৌঁছেও কবি চিত্ত এই নারীকে ঘিরে আলোড়িত হয়। বার বার স্পষ্টভঙ্গিতে বহু কবিতায় ও গানে প্রকাশিত। বহু কাব্যগ্রন্থেব উৎসর্গপত্র তার সাক্ষী। তবু তাঁর স্মৃতিচারণ যেন শেষ হয় না। এই নারীকে ঘিবেই কবির শৈশব ও প্রথম যৌবন পর্যন্ত কবিব জীবন পরিক্রমা ও কাব্য পরিক্রমা এবং তিনিই ছিলেন সে প্রভাতের (কবির শৈশবের প্রান্তে), বর্ষা পর্যায়ের প্রধানা কাব্যলক্ষ্মী।

সে-প্রভাতে তুমিই তো ছিলে
এ বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী। (ছবি)।

এই নারীর প্রেরণাই কবির প্রথম যুগের সাহিত্য সাধনার উৎস—

মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তুলিকা ধরি রসের মুরতি (ছবি)।

আবার কবির বয়ঃসন্ধিকালের লেখা 'ছবি ও গান' কাব্যগ্রন্থে এই 'স্নেহময়ী' নারীর উদ্দেশ্যে রচিত—

ওই-যে তোমার কাছে সকলে দাঁড়ায়ে আছে
ওরা মোর আপনার লোক,
ওরাও আমারি মতো তোর স্নেহে আছে রত
জুঁই বেলা বকুল অশোক।
বড়ো সাধ যায় তোরে ফুল হয়ে থাকি ঘিরে
কাননে ফুলের সাথে মিশে
নয়নকিরণে তোর ফুলিবে পরাণ মোর,
সুবাস ছুটিবে দিশে দিশে। (স্নেহময়ী)

এইসব কামনা ও আশা স্মৃতির মন্দিরে পরম ধনের মতো রক্ষিত হয় বলেই অনেক পরেও 'চৈতালিতে' এই পুরাতন সহচরীর 'স্মৃতি' পুর্নবার তর্পিত হয়—

সে ছিল আরেক দিন এই তরী—' পরে
কণ্ঠ তার পূর্ণ ছিল সুধাগীতিস্বরে।
ছিল তার আঁখি দুটি ঘন পক্ষছায়,
সজল মেঘের মতো ভরা করুণায়।
কোমল হৃদয়খানি উদ্বেলিত সুখে,
উচ্ছ্বসি উঠিত হাসি সরল কৌতুকে। (স্মৃতি)।

কবির স্নেহময়ী করুণাময়ী ও কৌতুকময়ী কাব্যসঙ্গিনীও কাব্যলক্ষ্মী যিনি কবির প্রথম যুগের (আরেক দিন। কাব্যতরণীতে (তরী —' পরে) পদার্পণ করেছিলেন এবং যাঁর স্নেহের ধারায় কবিকে অভিষিক্ত করে রেখেছিলেন তাঁরই স্নেহলীলার কথা 'স্মৃতি' রূপে চৈতালিতে ও ক্ষণিকায় (তথাপি) প্রকাশ করেছেন। শৈশবে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই নারীর স্নেহের কাঙাল. জীবনস্মৃতিতে কবি তা' উল্লেখ করে গেছেন। তিনিই ছিলেন কবির কাব্যের প্রেরণাদাত্রী তাই কবির কাব্য রচনার মূলেও ছিলেন তিনি, আবার শৈশবে মাতৃহীন বালককে কাছে টেনে নিয়েছিলেন বলে জীবনের মূলেও ছিলেন তিনি।

'তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে।'

কবির সঙ্গে কাদম্বরী দেবীর ভাবগত ও চরিত্রগত মিল ছিল (জীবনস্মৃতি, ছবি), দুজনেই ছিলেন কবি। এই একটি মাত্র নারীর সঙ্গে ছিল তাঁর মিল। 'মিলভাঙা' ও 'শেষ সপ্তক ত্রিশ' সংখ্যক কবিতায় কবি লিখেছেন, কবির অসংখ্যের মধ্যে এই একটি মাত্র নারীর সঙ্গে ছিল তাঁর ভাবগত ও চরিত্রগত মিল। দুজনেই ছিলেন কবি, যেন কবিতার দুটি পদ। এই নারীর অকস্মাৎ মৃত্যুতে সেই মিল ভেঙে গেল—যেন বিশ্বকবি তাঁর কবিতার একটি মিলের পদ কৌতুক করে মুছে দিলেন। আবার 'মিলভাঙা' কবিতায়ও সেই একই কথা লিখেছেন। কাদম্বরী দেবী এসেছিলেন কবির শৈশব জীবনে।

মনের মধ্যে তখনো
অসংশয় হয় নি পাখির কাকলী,
বনের মর্মর একবার জাগে
একবার যায় মিলিয়ে।

তিনি নিয়ে এসেছিলেন কবির জীবনের প্রথম বিস্ময়। তারপর বহুলোকের সংসারের মাঝখানে দুজনে মিলে যে কাব্য জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন তার মূল্য ছিল রচনায়। পাখি যেমন খড় কুটো কুড়িয়ে এনে বাসা বাঁধে, সেই রকম ছোট

ছোট উড়ে আসা ভাবনা দিয়ে দুজনে মিলে কাব্য রচনা করতেন। শেষে একদিন এই কাব্য জগৎ থেকে এই নারী জোড় ভেঙে মিলিয়ে গেলেন। কবিও চলে এসেছেন এই নারীর জানা সীমার বাইরে বহুদূরে। তিনি যদি আবার ফিরে আসেন তাঁর বাণী হবে খেলার ভেলা 'খেপা জলের ঘূর্ণিপাকে'। কবির প্রথম যুগের কাব্যরচনায় এই নারীর সহানুভূতি ও উৎসাহ ছিল প্রচুর, এবং দুজনের মনের মিল ছিল বলেই প্রকাশ পেয়েছে নূতন গান, প্রথম সৃষ্টির আনন্দ। ইনিই কবির কিশোর বয়সের কাব্যতরণীকে ঠেলে দিয়েছিলেন বৃহত্তর জগতের দিকে তাই কবির নামের সঙ্গে তাঁর নাম থাকবে বাঁধা।

কবি এই নারীর রূপ চরিত্র এবং সমস্ত গুণগুলি এবং কবির জীবনের বাল্যকালের ঘটনাবলী তিনি জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা, ও কাব্যগ্রন্থে এবং বহুজনের কাছে অকুণ্ঠিত ভাবে প্রকাশ করে গেছেন। 'কাঁচা আম' ও 'শ্যামা' কবিতায় কবি শৈশব জীবনের কাহিনী ব্যক্ত করেছেন এবং এই নারীর ঋণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। কবি এই নারীর রূপ এবং চরিত্র কাব্যের মাধ্যমে পরিষ্কার ভাবে নির্দেশ করে দিয়ে গেছেন। তাই এই নারীকে কবিতার মাধ্যমে খুঁজে নিতে খুব অসুবিধা হয় না, এমন কি যাতে আমরা সহজেই অন্য নারীদের থেকে আলাদা ভাবে খুঁজে নিতে পারি সেই উদ্দেশ্যে কবির দুটি কবিতা 'ছবি' ও 'শ্যামা' বিশেষভাবে যেখানে তাঁর রূপ ও চরিত্রের বর্ণনা আছে সেটাই কবি স্পষ্ট ভাবে বলে গেছেন।

মৃত্যুর প্রথম অভিজ্ঞতা—উদ্‌ভ্রান্তরূপ-জীবনস্মৃতি ১১৮, ১১৯, ১২০ পৃষ্ঠা, বয়স ২৪ বৎসর।

তোমার ভ্রূকুটি ভঙ্গে তরঙ্গিল আসন্ন উৎপাত
নামিল আঘাত।

রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছেন, 'আমার যে পরমাত্মীয় আত্মহত্যা করে মরেন শিশুকাল থেকে আমার জীবনে পূর্ণ নির্ভর ছিলেন, তিনি।' তাঁর সেই মর্মান্তিক ও আকস্মিক মৃত্যুই কবির সুকুমার ও অনুভূতিপ্রবণ মনকে দিশাহারা করে দেয়, এবং তাঁর মর্মান্তিক ও আকস্মিক মৃত্যুর আঘাতের কথা কবি কখনও ভোলেন নি, জীবনস্মৃতিতে ও বহু কবিতায় তার বর্ণনা দিয়েছেন—

ঘোর ঝটিকার রাতে দারুণ অশনিপাতে
বিদীরিল যে গিরি-শিখর
বিশাল পর্বত কেটে, পাষাণ-হৃদয় ফেটে,
প্রকাশিল যে ঘোর গহ্বর—

এই অল্প বয়সের প্রথম মৃত্যুর আঘাত কবিকে অনেকটা উদ্‌ভ্রান্তের মত করে দিয়ে স্থায়ী শোকের বিরাট গহ্বর সৃষ্টি করে দিল। এই নারীর মৃত্যুতে কিছুদিনের জন্য কবির বেশভূষারও পরিবর্তন হয়েছিল। 'কড়ি ও কোমলে' আছে, 'তখন আমার বেশভূষার আবরণ ছিল বিরল। গায়ে থাকত ধুতির সঙ্গে কেবল একটা পাতলা চাদর, তার খুঁটোয় বাঁধা ভোরবেলায় তোলা একমুঠো বেলফুল, পায়ে একজোড়া চটি।' কবি শেষ সপ্তক ত্রিশ সংখ্যকে এই প্রেরণা স্বরূপা নারীকে উদ্দেশ করেন—

চোখে ছিল
একটা দিশাহারা ভয়ের চমক
পাছে কেউ পালায় তাকে না বলে।
তার দুটি পায়ে ছিল দ্বিধা,
ঠাহর পায় নি
কোন্‌খানে সীমা
তার আঙিনাতে।
দেখা হল।
সংসারের আনাগোনার পথের পাশে
আমার প্রতীক্ষা ছিল
শুধু ঐ টুকু নিয়ে।
তার পরে সে চলে গেছে।

এই ছত্র কয়টি বুঝি কাদম্বরী-জীবনের এক গূঢ় রহস্যকে উন্মোচন করতে সক্ষম।

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুশোক কবি জীবনস্মৃতিতে, চিঠিপত্রে, কাব্যগ্রন্থে এবং লিপিকায় উল্লেখ করেছেন যদিও আলাদাভাবে মৃত্যুশোক জনিত In memorium জাতীয় কোন কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন নি। কবির শৈশব যৌবনের লেখা এবং কাদম্বরী দেবীর স্মৃতি বিজড়িত 'ছবি ও গান' কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত কাদম্বরী দেবীকে উৎসর্গ করে গেছেন, এবং কবি জীবনের এই পর্যায়কে শৈশবের বর্ষাঋতুর সঙ্গে তুলনা করেছেন—

আষাঢ়ের আসন্নবর্ষণ সন্ধ্যায়
যখন তোমাকে দেখি মনে মনে
দেখতে পাই তুমি আছ
সেইদিনকার কচি যৌবনের মায়া দিয়ে ঘেরা।

আবার 'ছেলেবেলায়' আছে, 'গঙ্গার ধারে সেই সুর দিয়ে মিনে করা এই বাদল-দিন আজও রয়ে গেছে আমার বর্ষাগানের সিন্দুকটাতে।' এই মৃত্যুর ভিতর দিয়েই কবি জগৎকে সম্পূর্ণ নূতনভাবে দেখলেন—'জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে-দূরত্বের প্রয়োজন, মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম, তাহা বড়ো মনোহর।' কবির প্রথম গদ্যগ্রন্থ য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র এবং শৈশব সংগীত এই নারীর উদ্দেশ্যেই লিখেছেন, এবং এই নারীর মৃত্যুর পর তাঁকে ছয়খানি কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করে তাঁর স্নেহের ও কাব্যের ঋণশোধের প্রচেষ্টা লক্ষণীয় (স্মরণ—সেঁজুতি)।

শ্যামা —(উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ)।

সুন্দর তুমি বাঁধা রেখায়,
প্রতিষ্ঠিত তুমি অচল ভূমিতে (মিল ভাঙা-শ্যামলী)।

কবি এই নারীকে এবং তাঁর রূপকে সৃষ্টি করেন নি, কারণ এই বিদূষী ও অসামান্যা আধুনিকা নারী তাঁর আপন দেহের (রেখায়) সৌন্দর্যে ও রূপে অতুলনীযা ছিলেন। তাই কবি এই নারীকে ও তাঁর রূপকে কাব্যে যথাযথ ভাবেই বর্ণনা দিয়েছেন। অমিতাভ চৌধুরীর লেখা 'রবীন্দ্রনাথের পরলোক চর্চা'তেও কবি এই নারীকে আপন স্বরূপেই দেখতে চেয়েছেন। কবি কাব্য গ্রন্থে যাঁকে সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল ও স্পষ্টভাবে এঁকেছেন তিনি হলেন কবির নূতন বৌঠান কাদম্বরী দেবী। (রূপ ও চরিত্র)।

কাদম্বরী দেবীর রং উজ্জ্বল শ্যামলবর্ণ, গলায় পলার হার কিংবা সোনার হার। বড়ো বড়ো চোখ, চিকণ দেহ, ঘন পক্ষ্মছায (স্মৃতি-চৈতালি), সরস অধর (ভৈরবী গান), পরিহাস প্রিয়া, চঞ্চল ও কৌতুকময়ী (শ্যামা), কবির সঙ্গে স্বভাবের ও মনের মিল ছিল, দুজনেই কবি, কবির অত্যন্ত চেনা নারী (শেষ সপ্তক ত্রিশ), আবেগপ্রবণ ও আধুনিকা—

আধুনিকা যারে বল তারে আমি চিনি যে
কবি যশে তারি কাছে বারো আনা ঋণী যে।

কবি শেষ যৌবনে অকাল বসন্তের আগমনে, শৈশবের এই 'স্মৃতি'রূপিণী পরিহাস প্রিয়া পুরাতন সহচরীর উদ্দেশ্যে ক্ষণিকায় 'অনবসর' কবিতায় স্মরণ করেন—

ছেড়ে গেলে হে চঞ্চলা
হে পুরাতন সহচরী!

অর্থাৎ কবির শেষ যৌবনে 'স্মৃতি' রূপিণী পুরাতন সহচরীর বিদায় এবং 'বাস্তবে'র 'নূতন আঁখির' 'আবির্ভাব'। (আবির্ভাব—ক্ষণিকা ১০ই আষাঢ় ১৩০৭ শিলাই-দহ, তথাপি—ক্ষণিকা)।

কাব্যগ্রন্থ—

সন্ধ্যা সঙ্গীত—সন্ধ্যার মতোই বিষন্ন অন্তরের গান অথবা সন্ধ্যার মতোই আবৃত হৃদয়। হৃদয়—অরণ্যের মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থার গান যা' তিনি শৈশব কৈশোরের বয়ঃসন্ধিকালে লিখেছেন।

স্থান—তেতালার ছাদ ও ঘর, চন্দননগর ও দশ নম্বর সদর ষ্ট্রীট।

যদিও কবির সেই সময় আনন্দ মুখরিত দিনগুলির মধ্যে কবির জীবনের আনন্দ উল্লাসের বার্তা পাওয়া যায় (জীবনস্মৃতি), কিন্তু সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলির মধ্যে তার বিপরীত ভাবের সাক্ষ্য দেয়। এতদিন কবি শৈশবের কাব্যগ্রন্থগুলিতে (কবি-কাহিনী, ভগ্নহৃদয়), প্রধানতঃ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কল্পনা মিশ্রিত বাইরের উপাদান এবং প্রথমা প্রিয়াই কবিতাতে অবলম্বিত হতো। সন্ধ্যাসংগীতে এই প্রথম কবি মোড় ফিরলেন। নিজের যৌবন সমাগমের দরুণ অন্তরের বিষাদ ও বেদনার কথা প্রকাশ করে নিজেরই অন্তর কাহিনীর মনস্তত্ত্বমূলক কবিতার প্রথম সূত্রপাত ঘটালেন তিনি। এবং সেই সঙ্গে কবিতাকে 'বধূ' রূপে সম্বোধন করে সন্ধ্যাসংগীতে 'গান আরম্ভ' করলেন। সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলির মধ্যে কবির যৌবন সমাগম জনিত কবি-মনের পরিবর্তন বিষাদ ও বেদনা এবং অন্তর যুদ্ধের কথা ব্যক্ত করেছেন। 'এমনি করিয়া দুটো একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের আবেগ আসিল, আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল, বাঁচিয়া গেলাম যাহা লিখিতেছি এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই' (জীবনস্মৃতি ৯২ পৃষ্ঠা)। এই কারণেই কবির কাব্য লেখার ইতিহাসের মধ্যে সন্ধ্যাসংগীতই প্রথম স্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ যেখানে কবির নিজস্ব মনের গভীরে নিজেরই অন্তর রহস্যের সন্ধান পেলেন। 'সন্ধ্যাসংগীতে যে বিষাদ ও বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে তাহার মূল সত্যটি সেই অন্তরের রহস্যের মধ্যে। সমস্ত জীবনের একটি মিল যেখানে আছে সেখানে জীবন কোনোমতে পৌঁছিতে পারিতেছিল না। নিদ্রায় অভিভূত চৈতন্য যেমন দুঃস্বপ্নের সঙ্গে লড়াই করিয়া কোনোমতে জাগিয়া উঠিতে চায়, ভিতরের সত্তাটি তেমনি করিয়াই বাহিরের সমস্ত জটিলতাকে কাটাইয়া নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে থাকে, অন্তরের

প্রকাশিত হয়েছে' (জীবনস্মৃতি পৃঃ ৯৮)। কবির বাল্যকালের অর্থাৎ বর্ষার দিনে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একটি সহজ ও নিবিড় যোগ ছিল। সন্ধ্যাসংগীতে যৌবনের প্রথম উন্মেষে কবির সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সেই সহজ যোগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কবি-মনের এই অসামঞ্জস্যের দরুণ কবির ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরে নিজের মধ্যেই নিজের যে আবর্তন ও যুদ্ধ সুরু হয়েছিল, সেই অন্তর প্রকৃতির যুদ্ধের ইতিহাসেরই প্রকাশ রয়েছে কবির 'আশার নৈরাশ্য' দিয়ে হৃদয়ের 'গীতি ধ্বনি'তে' 'দুঃখ-আবাহনের' মধ্যে 'শান্তি গীতে', 'অসহ্য ভালোবাসার' 'হলাহলে' এবং 'পরাজয় সংগীতে'র মধ্য দিয়ে 'সংগ্রাম সংগীতে' ও 'আমি-হারাতে'। কবির অন্তরের গভীরতম প্রদেশের এই দুই শক্তির দ্বন্দ্বের কথা এই কবিতাগুলিতে ভালোভাবে প্রকাশিত। কবি অসহ্য ভালোবাসায় ব্যক্ত করেছেন—

এমন কি কেহ নাই, বল মোরে বল আশা,
মার্জনা করিবে মোর অতি—অতি ভালোবাসা!

আবাব 'হলাহল' কবিতায়—

প্রণয় অমৃত এ কি ? এ যে ঘোর হলাহল—
হৃদয়ের শিরে শিরে প্রবেশিয়া ধীরে ধীরে
অবশ করিছে দেহ, শোণিত করিছে জল।

কবি এই বিকৃত ভালোবাসার থেকে নিজেকে মুক্ত করে জগৎকে আবার আপন স্বরূপে দেখতে চাইলেন—

দূর করো, দূব করো বিকৃত এ ভালোবাসা—
জীবনদায়িনী নহে এ যে গো হৃদয় নাশা।

সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি প্রসঙ্গে কবির মন্তব্যই সম্ভবতঃ শেষ কথাটি উচ্চারণ করে, 'মানুষের মধ্যে অবস্থাবিশেষে একটা আবেগ আসে যাহা অব্যক্তের বেদনা, অপরিস্ফুটতার ব্যাকুলতা। মানুষ্য প্রকৃতিতে তাহা সত্য, সুতরাং তাহার প্রকাশকে মিথ্যা বলিব কী করিয়া। এরূপ কবিতার মূল নাই বলিলে ঠিক বলা হয় না, তবে কি না মূল্য নাই তর্ক বলিয়া করা চলিতে পারে। কিন্তু, একেবারে নাই বলিলে কি অত্যুক্তি হইবে না। কেননা, কাব্যের ভিতর দিয়া মানুষ আপনার হৃদয়কে ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে; সেই হৃদয়ের কোনো অবস্থার কোনো পরিচয় যদি কোনো লেখায় ব্যক্ত হয় তবে মানুষ তাহাকে কুড়াইয়া রাখিয়া দেয়, ব্যক্ত যদি না হয় তবেই তাহাকে ফেলিয়া দিয়া থাকে।'

প্রভাত সংগীত—

মোহিতবাবুর গ্রন্থাবলীতে প্রভাত সংগীতের কবিতাগুলিকে 'নিষ্ক্রমণ নাম দেওয়া হয়েছে। নিষ্ক্রমণ—বহির্গমন। অন্তর প্রকৃতির প্রথম বহির্মুখ উচ্ছ্বাস, প্রভাতের উজ্জ্বল আলোর মতই হৃদয়ারণ্য হইতে বাহিরের বিশ্বে প্রথম আগমনের বার্তা। রাতের অন্ধকার দূর হয়ে প্রভাতের উজ্জ্বল আলোর মধ্যে পৃথিবী যেমন সুন্দর হয়ে দেখা দেয়, তেমনি কবির হৃদয়ও বিষাদের আচ্ছাদন (বিকৃত ভালবাসা) থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠল। প্রভাত সংগীতে কবি অন্তর প্রকৃতির প্রথম বহির্মুখ উচ্ছ্বাস দিয়ে নির্মল অন্তরের গান গাইলেন—

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত-পাখির গান।
না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।

কবি জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন (১০৪পৃষ্ঠা)—'একদিন যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার খোরাকের দাবি করিতে লাগিল, তখন বাহিরের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগটি বাধাগ্রস্ত হইয়া গেল। তখন ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নিজের মধ্যেই নিজের আবর্তন শুরু হইল; চেতনা তখন আপনার ভিতরের দিকেই আবদ্ধ হইয়া রইল। এইরূপে রুগ্ন হৃদযটার আবদারে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের যে সামঞ্জস্যটা ভাঙিয়া গেল, নিজের চিরদিনের যে সহজ অধিকারটি হারাইলাম, সন্ধ্যাসংগীতে তাহারই বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে। অবশেষে একদিন সেই রুদ্ধ দ্বার জানি না কোন্ ধাক্কায় হঠাৎ ভাঙিয়া গেল, তখন যাহাকে হারাইয়াছিলাম তাহাকে পাইলাম। শুধু পাইলাম তাহা নহে, বিচ্ছেদের ব্যবধানের ভিতর দিয়া তাহার পূর্ণতর পরিচয় পাইলাম। এইজন্য আমার শিশু-কালের বিশ্বকে প্রভাত সংগীতে যখন আবার পাইলাম তখন তাহাকে অনেক বেশি পাওয়া গেল। এমনি করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে সহজ মিলন (কবি কাহিনী) বিচ্ছেদ (সন্ধ্যাসংগীত) ও পুনর্মিলন (প্রভাত সংগীত) জীবনের প্রথম অধ্যায়ের একটা পালা শেষ হইয়া গেল।'

ছবি ও গান—বসন্তের সূচনা। 'বাতায়নবাসী বয়ঃ-সন্ধিকালের কবি'—

কবির কৈশোর যৌবনের বয়ঃসন্ধিকালের লেখা। যৌবন আরম্ভের প্রথম পর্ব, বসন্তের সূচনা।

স্থান—'চৌরঙ্গির নিকটবর্তী সার্কুলর রোডের একটি বাগানবাড়িতে আমরা তখন বাস করতাম। তাহার দক্ষিণের দিকে মস্ত একটা বস্তি ছিল। আমি অনেক সময়েই দোতলার জানলার কাছে বসিয়া সেই লোকালয়ের দৃশ্য দেখিতাম। তাহাদের সমস্ত দিনের নানাপ্রকার কাজ, বিশ্রাম, খেলা ও আনাগোনা দেখিতে আমার ভারি ভালো লাগিত—সে যেন আমার কাছে বিচিত্র গল্পের মতো হইত' (জীবনস্মৃতি)।

কবির কৈশোর যৌবনের বয়ঃ সন্ধিঃকালে নব যৌবনের সূচনায় সংসারের নানান্ রূপের ছবিই কবির অন্তরের গান হয়ে 'ছবি ও গানে' মূর্ত হয়। 'সেইদিন নব যৌবনের নানান রঙের বাক্সটা নূতন পাইয়া আপন মনে কেবলই রকম-বেরকম ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিয়া দিন কাটাইয়াছি। সেই সেদিনের বাইশবছর বয়সের সঙ্গে এই ছবিগুলাকে আজ মিলাইয়া দেখিলে হয়তো ইহাদের কাঁচা লাইন ও ঝাপসা রঙের ভিতর দিয়াও একটা কিছু চেহারা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে।' কবি 'ছবি ও গান' কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—'এটা বয়ঃসন্ধিকালের লেখা, শৈশব যৌবন সবে মিলেছে। ভাষায় আছে ছেলেমানুষি, ভাবে এসেছে কৈশোর। তার পূর্বেকার অবস্থায় একটা বেদনা ছিল অনুদ্দিষ্ট, সে যেন প্রলাপ বকে আপনাকে শান্ত করতে চেয়েছে। কিছু আলো আঁধারে রূপের আভাস পায়, স্পষ্ট করে কিছু পায় না। ছবি এঁকে তখন প্রত্যক্ষতার স্বাদ পাবার ইচ্ছা জেগেছে মনে, কিন্তু ছবি আঁকবার হাত তৈরি হয় নি তো। কবি সংসারের ভিতরে তখনও প্রবেশ করেন নি তখনও সে বাতায়নবাসী। দূর থেকে যার আভাস দেখে তার সঙ্গে নিজের মনের নেশা মিলিয়ে দেয়।' এই বাতায়নবাসী বয়ঃসন্ধিকালের কবি নিজের মনের নেশা মিলিয়ে তাঁর দূরের বঁধূর ছবি এঁকে বসন্তের ও নব যৌবনের সূচনা করলেন 'সুখ স্বপ্ন' ও 'জাগ্রত স্বপ্নের' মধ্যে অনাগত 'কে' কবিতাটি লিখে। কবি এই সময়কার নিজের মনের অবস্থার কথা বর্ণনা দিয়েছেন প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ডে; 'সুখস্বপ্ন' ও 'জাগ্রত স্বপ্নের' কবিতার মধ্যে—

উড়িতেছে কেশ উড়িতেছে বেশ,
উদাস পরান কোথা নিরুদ্দেশ,
হাতে লয়ে বাঁশি মুখে লয়ে হাসি
ভ্রমিতেছি আনমনে।
চারিদিকে মোর বসন্ত হসিত,
যৌবন কুসুম প্রাণে বিকশিত,
কুসুমের' পরে ফেলিব চরণ
যৌবন মাধুরী ভরে
চারি দিকে মোর মাধবী মালতী
সৌরভে আকুল করে।
কেহ কি আমারে চাহিবে না?
কাছে এসে গান গাহিবে না?
পিপাসিত প্রাণে চাহি মুখপানে
কবে না প্রাণের আশা?
চাঁদের আলোতে দখিন বাতাসে
কুসুমকাননে বাঁধি বাহুপাশে
শরমে সোহাগে মৃদু মধু হাসে
জানাবে না ভালোবাসা?
আমার যৌবন কুসুম কাননে
ললিত চরণে বেড়াবে না?
আমার প্রাণের লতিকা-বাঁধন
চরণে তাহার জড়াবে না?
আমার প্রাণের কুসুম গাঁথিয়া
কেহ পরিবে না গলে?
তাই ভাবিতেছি আপনার মনে
বসিয়া তরুর তলে।

কবি বয়ঃসন্ধিকালের প্রথম বয়সের বাতায়নে বসে যৌবনের প্রারম্ভে 'জাগ্রত স্বপ্নের' ভাবনার মধ্যে তাঁর দূরের বঁধুব' উত্তরীয়ের সুগন্ধি হাওয়ার আভাস পেলেন, এবং এই সুগন্ধি হাওয়ার 'সুখ স্বপ্নে'র আভাস ও 'জাগ্রত স্বপ্নের' মধ্য দিয়ে বর্ষাপর্যায়ের শেষ পর্বে, কবির ভালো লাগুক বা না লাগুক স্থায়ী-ভাবে কবির জীবনে রহস্যময় যৌবনেব আবির্ভাব হল যা' কবির—

বুকের ভিতরে ছুরির মতন,
মনের মাঝারে বিষের মতন,
রোগের মতন, শোকের মতন
রব আমি অনিবার। (রাহুর প্রেম)।

প্রকৃতির প্রতিশোধ—

কবির জীবন নাট্যের সূচনা। সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের পালা। স্থান—কারোয়ার সমুদ্রতীর। কবি জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন (১০৯ পৃষ্ঠা), এই কারোয়ারে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামক নাট্য কাব্যটি লিখিয়াছিলাম। এই কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া, প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুর বাইরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহ পাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারে ফিরাইয়া আনে।'

বিবাহ-পূর্ব কবি কল্পনার বালিকা-রূপিণী সীমা ও সন্ন্যাসী রূপী অসীমের মিলন সাধনের ভাবরূপ কবির মনে প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্য কাব্যে। এই নাট্য কাব্যে বালিকা-রূপিণী সীমার ভালোবাসার সঙ্গে সন্ন্যাসী রূপী অসীমের শূন্যতার মিলন সাধনের মধ্যেই জীবনের পূর্ণতার কথা প্রকাশ করে নিজেরই জীবন নাট্যের ও কাব্য নাট্যের ভূমিকা রচনা করলেন। বালিকার স্নেহই সন্ন্যাসী অনন্তের ধ্যান থেকে সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। সংসারে এসে সন্ন্যাসীর এই উপলব্ধি হয়—'ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনই পাই তখনই যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই।' বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য ও মানুষের স্নেহ প্রেম দুইই কবিকে মুগ্ধ করেছে, কিন্তু তিনি সেই মোহের দ্বারা বদ্ধ নন। কবি আত্মপরিচয়ে লিখেছেন—'জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদের টানিতেছেন আর কাহারও টানিবার ক্ষমতা নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি।' কবির পরবর্তীকালের সমস্ত রচনার ভূমিকা। ইহাই কবির জীবনে ও কাব্যে এই একটি মাত্র পালা, সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের পালা। কবির কবিতায়ও ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

অসীম যে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

কবির প্রেমের একটি ধারায় রয়েছে বৈরাগ্যের ধারা (অসীম, সন্ন্যাসী সত্তা) যা' তাঁকে শেষ যৌবনে মঙ্গলকর্মের দিকে টেনে নিয়ে গেল। আর এক ধারায় রয়েছে সীমার (নারী, স্নেহ, প্রেম, সত্তা) মধ্যে অসীমের (শূন্যতা সন্ন্যাসীসত্তা) মিলন সাধনের কথা। সেই কথা কবি নানাভাবে নানা রূপে কবিতায় ও গানে প্রকাশ করেছেন। এই সংসারকে সত্য ভাবে গ্রহণ করে তার সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃতে, আনন্দে প্রেমে উত্তীর্ণ হবার কথাই কবি বার বার লিখেছেন। 'আমি বালক বয়সে প্রকৃতির প্রতিশোধ লিখিয়াছিলাম—তখন আমি নিজে ভালো করিয়া বুঝিয়াছিলাম কি না জানি না—কিন্তু তাহাতে এই কথা ছিল যে, এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি। যে জাহাজে অনন্তকোটি লোক যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে তাহা হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া সাঁতারের জোরে সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা সফল হইবার নহে' (আত্মপরিচয় ১৭৮ পৃঃ)।

তাই কারোয়ার হইতে ফিরিবার পথে আনন্দের সঙ্গে কবি 'হ্যাদে গো নন্দরাণী' গানটি রচনা করেন। এবং কারোয়ার হইতে ফিরিয়া আসার কিছুকাল পরে ১২৯০ সালে ২৪শে অগ্রহায়ণে কবির বিবাহ হয়, তখন কবির বয়স বাইশ বৎসর। (জীবনস্মৃতি)।

শরৎ কাল—কবির যৌবন

১৮৮৪-১৯০২

'কবির বিস্মরণধর্মী জীবন'।

অতি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য স্তূপাকার করে তা দিয়ে স্মরণস্তম্ভ হতে পারে, কিন্তু জীবনচরিত হবে কী করে? জীবন চরিত থেকে যদি বিস্মরণধর্মী জীবনটাই বাদ পড়ে তা হলে মৃত চরিতের কবরটাকে নিয়ে হবে কী?

মানসী ও ক্ষণিকা

(যৌবনের মানসভূমি—গাজীপুর, শিলাইদহ)।

তার পরে ?
যে জীবনে আলো নিবল
স্থর থামল,
সে যে এই আজকের সমস্ত কিছুর মতোই
ভরা সত্য ছিল,
সে কথা একেবারেই ভুলবে জানি,
ভোলাই ভালো।
তবু তার আগে কোনো একদিনের জন্য
কেউ একজন
সেই শূন্যটার কাছে একটা ফুল রেখো
বসন্তের যে ফুল একদিন বেসেছি ভালো।

শরৎ কাল—কবির যৌবন

বসন্ত কাল—কড়ি ও কোমল থেকে নৈবেদ্য।

'একদিন বসন্তে নারী এল সঙ্গীহারা আমার বনে
প্রিয়ার মধুর রূপে' (পত্রপুট পনেরো)।

নবযৌবনের শরৎকালে (১২৯১ বঙ্গাব্দ আশ্বিন - শরৎকাল), দূরের বঁধুর আগমনে (১২৯০ বঙ্গাব্দ ২৪শে অগ্রহায়ণ), কবির নববসন্তের ও বসন্তরাতের ফুল (বসন্ত-কল্পনা) 'কড়ি ও কোমল' এবং মানসী' কাব্যগ্রন্থে ফুটে উঠল—

আকাশের দুই দিক হতে দুইখানি মেঘ এল ভেসে,
দুই খানি দিশাহারা মেঘ—কে জানে এসেছে কোথা হতে।

অথবা—

হে রমণী, ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য আভাসে (স্মরণ ২২ সংখ্যক)।

রবীন্দ্র কাব্যের শ্রেষ্ঠ পর্ব—(১৮৮৬-১৯০১) কড়ি ও কোমল থেকে নৈবেদ্য। **যৌবনের মানসভূমি।**

কড়ি ও কোমল—কবির নবযৌবনের গান (১৮৮৬)।

'যৌবন হচ্ছে জীবনে সেই ঋতুপরিবর্তনের সময় যখন ফুল ও ফসলের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা নানা বর্ণে ও রূপে অকস্মাৎ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। কড়ি ও কোমল আমার সেই নবযৌবনের রচনা।' কবির নবযৌবনের নববসন্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দখিণ হাওয়া, নব ফাল্গুণ, চৈত্র পূর্ণিমা, কনক চাঁপা, সর্ষে ফুলের গন্ধের সঙ্গে প্রেমের সুখস্মৃতি এবং তারই সঙ্গে কবির মনের মধ্যে নেশার মতো বয়ে গেছে হেনার গন্ধে ভরা বাসন্তী রং এর আকাশের সঙ্গে বাসন্তী[২] রঙের বসনখানি। কড়ি ও কোমল কবির কাব্যগ্রন্থের প্রথম ডাঙা এবং শূন্য জীবনের প্রথম সৈকত তীর অথবা জীবন নাট্যের প্রথম অঙ্কভাগ। আরম্ভ বেলাকার সাতাশের 'কবি রবীন্দ্রনাথ'—২৭ জুন ১৮৮৭ ছিন্নপত্র।

স্থান—তেতালার ছাদ ও কোণের ঘর, দক্ষিণের বারান্দা, বন্দোরা সমুদ্র-তীর, সোলাপুর ও নাসিক।

কবি ছিন্নপত্রে লিখেছেন—'জীবনে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনো মিথ্যাকথা বলি নে. সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের আশ্রয় স্থান।' তাই কবির কবিতার মধ্যে

প্রচ্ছন্নভাবে 'অশরীরভাবরূপে' যে শ্যামলী নারীকে পাওয়া যায় তিনিও কবির জীবনে গভীর ভাবে সত্য ছিলেন।

সবচেয়ে সত্য করে পেয়েছিনু যারে
সবচেয়ে মিথ্যা ছিল তারি মাঝে ছদ্মবেশ ধরি,
অস্তিত্বের এ কলঙ্ক কভু
সহিত না বিশ্বের বিধান
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি (শেষ লেখা ১৫)।

কবির যৌবনকে এবং শূন্য দিগন্তকে ঘিরে যে নারীর আবির্ভাব ও তিরোভাব তিনিই কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী।

সেখানে দৈবে কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল
জল-ভরা ঘট নিয়ে যে চলে গিয়েছিল
চকিত পদে (শেষ সপ্তক ছয়)।

যাঁর কথা কবি কখনো কোথাও বলেন নি, যাঁকে কবিতায় অশরীরী নারীরূপে মলিন বেশে 'প্রচ্ছন্ন' (খেয়া কাব্যগ্রন্থ) করে রেখেছেন।

শরৎ পর্যায়ের প্রথম পর্ব—

কড়ি ও কোমল, মানসী (১৮৮৬ ১৮৯০ ***কবির নব বসন্ত।***

কাব্যলক্ষ্মী —'এসো আমার শরৎ-লক্ষ্মী'।

কবির যৌবনে এই নারীর আবির্ভাবে কবির কাব্যের ও সাহিত্যের যেমন শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হয়েছিল তেমনি কবির জীবনেরও শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছিল। এই সময়টা কবির কাব্যের (১৮৮৩-১৯০১) স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা যায়। এবং বহু গান, গল্প, কবিতা, নাটক ও উপন্যাসের উৎস স্থান। আর এই শরৎ পর্যায়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ যোগাযোগ হয় (১২৯১ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র—অগ্রহায়ণ।) কবি নিজের প্রথম যুগের কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে কড়ি ও কোমলের তুলনা করে মন্তব্য করেছেন—'আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বাষ্প, এবং বায়ু, এবং বর্ষণ। তখন এলোমেলো ছন্দ ও অস্পষ্ট বাণী। কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমলে কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রঙ নহে, সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারের ছন্দ ও ভাষা নানা প্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।'

কবির এই নব যৌবনের রসোচ্ছ্বাস কেবল যে মানব জীবনের বিচিত্র রসলীলা

কবির মনকে আকৃষ্ট করেছিল তা নয় সেই সঙ্গে কবির চিত্রকলা গান গল্প কবিতা সবই যেন একসঙ্গে কবির অন্ত:স্তরের উৎস থেকে আপনা আপনি উৎসারিত হচ্ছিল। তাই কবি শরৎকালের বর্ণনায় লিখেছেন— মনে পড়ে, দুপুর বেলায় জাজিম-বিছানো কোণের ঘরে একটা ছবি আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি। সে যে চিত্রকলার কঠোর সাধনা তাহা নহে সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন মনে খেলা করা। যেটুকু মনের মধ্যে থাকিয়া গেল, কিছুমাত্র আঁকা গেল না সেইটুকুই ছিল তাহার প্রধান অংশ।' শরৎকালের আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কবির গান ও ছবি আঁকা। এই প্রথম কবি ছবি আঁকার কথা উল্লেখ করলেন অর্থাৎ কবির নবযৌবনের বসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের সমস্ত ইচ্ছা আপনা আপনিই প্রস্ফুটিত হ'তে লাগল, নবযৌবনেই (কড়ি ও কোমল— শরৎকাল কবির ছবি আঁকা উল্লেখযোগ্য ভাবে সুরু হয়েছিল। বৃদ্ধ বয়সে তা সম্পূর্ণতা পায়। এই দিক থেকে কবিজীবনের শরৎ পর্যায় (কড়ি ও কোমল) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কবির নবযৌবনের লেখা কড়ি ও কোমলের ভাষা ও ছন্দ যেমন নানা রূপ ধরে উঠবার চেষ্টা করছে তেমনি কবির গান গল্প চিত্রকলাও বিশিষ্ট রূপ নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হতে লাগল। 'আর এই শরৎ-কালের মধুর উজ্জ্বল আলোটির মধ্যে যে উৎসব তাহা মানুষের। মেঘ রৌদ্রের লীলাকে পশ্চাতে রাখিয়া সুখদুঃখের আন্দোলন মর্মরিত হইয়া উঠিতেছে, নীল আকাশের উপরে মানুষের অনিমেষ দৃষ্টির আবেশটুকু একটা রঙ মাখাইয়াছে, এবং বাতাসের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের আকাঙ্খাবেগ নিশ্বসিত হইয়া বহিতেছে।

মনের সঙ্গে মনের আপস, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার বোঝাপড়া, কত বাঁকাচোরা বাধার ভিতর দিয়া দেওয়া এবং নেওয়া। সেই-সব বাধায় ঠেকিতে ঠেকিতে জীবনের নির্ঝরধারা মুখরিত উচ্ছ্বাসে হাসিকান্নায় ফেনাইয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে, পদে পদে আবর্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠে এবং তাহার গতিবিধির কোন নিশ্চিত হিসাব পাওয়া যায় না' (জীবনস্মৃতি—বর্ষা ও শরৎ)।

কবির এই নবযৌবনের নববসন্তের বাসন্তী রং এর আকাশে, শুক্লা চতুর্থীর চাঁদের আলোতে, এক অচেনা নারী কবির বসন্তরাতে (বসন্ত-কল্পনা, গীতালি ১০৮ সংখ্যক) ভীরু দীপশিখা এবং বর্ণ গন্ধ গান ও বসন্তের রূপ নিয়ে ক্ষণকালের জন্য আসে। আর সেই 'নূতন'কে (কড়ি ও কোমল) 'যৌবন স্বপ্নের' 'গীতোচ্ছ্বাসে'র মধ্যে তিনি বরণ করে নেন। এবং সেই সঙ্গে কবির নীরব

বাঁশিখানি বেজে উঠে আবার বহুদিন পরে কাব্যজগতের নূতন কাব্যলক্ষ্মী 'শরৎ-লক্ষ্মী' রূপে ফিরে আসে—

জগৎ-কমল-বনে কমল-আসনা
কতদিন পরে বুঝি তাই এল ফিরে।

পরবর্তীকালে আকাশ প্রদীপের 'বধূ' কবিতায় কবি শৈশব-কৈশোরের[৪] স্মৃতিচারণ করে বসন্তের নারীর কথাই ব্যক্ত করেছেন। কবির যৌবনের রূপ রস বর্ণগন্ধময় প্রথম বসন্তে, নারীর রহস্যময় স্পর্শের আনন্দের তীব্রতায় অভিভূত মুহূর্তে সেই নারীকেই শুধিয়েছিলেন—

"তুমি কি সেই,
আঁধারের কোন্ ঘাট হতে
এসেছ আলোতে!"

অর্থাৎ তুমিই কি সেই শৈশবের কৈলাশ মুখুজ্যের ছড়ার বধূ (জীবনস্মৃতি, ৭ পৃষ্ঠা)। কবি যৌবনের প্রারম্ভেই 'জাগ্রত স্বপ্নের' ভাবনার মধ্যে এই দূরের বঁধূর উত্তরীয়ের সুগন্ধি হাওয়ার আভাস পেয়েছিলেন! শৈশবের সেই ছড়ার বধূ এতদিনে বুঝি প্রত্যক্ষ সংসারের সীমায় কবির যৌবনে 'বাস্তব বধূ' রূপে প্রকাশিত হয়। আর তারই রহস্যময় স্পর্শে নূতন চেতনায় জেগে ওঠে কবির সুপ্ত যৌবন। 'অকাল ঘুম' (শ্যামলী) কবিতায় ঠিক এই কথাই উচ্চারণ করেন কবি -

"কে তুমি।
তোমার শেষ পরিচয় খুলে যাবে কোন লোকে।"

কড়ি ও কোমলের 'নিদ্রিতার চিত্র'টি পরবর্তীকালে আরও বিস্তারিত বর্ণনায় 'অকাল ঘুম' কবিতায় চিত্রিত। এই 'নিদ্রিতার চিত্র' ভাব ও রূপ এই দুই অংশে বিভক্ত হয়ে অপরূপ সৌকর্যে বিকশিত হয় 'নিদ্রিতা' ও 'সুপ্তোত্থিতা'র ছবি। কড়ি ও কোমলের বহু কবিতা রূপান্তরিত হয়ে অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে লিখিত হয়েছে।

যৌবনে কবি ছিলেন অত্যন্ত আবেগপ্রবণ অনুভূতিপ্রবণ, খেয়ালি সরল ও অধৈর্যপ্রকৃতির; তাই কবির আবেগের গতি যে দিকে যে ভাবে গেছে কবির কবিতাগুলিও সেই পথগামী। এবং কিছুদিনের মধ্যেই কবি মৃত্যুকে এবং 'পুরাতন'কে পশ্চাতে রেখে জীবনের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। 'নূতনে'র উদ্দেশে

রচনা করেন 'তুমি'—যা অদূর ভবিষ্যতে কবির জীবনে বিশেষ রূপ ধরে 'পরিশেষে' দেখা দেয় 'তুমি' আর 'আমি' রূপে। যদিও শরৎ কাল কবির নব যৌবনের নববসন্ত কিন্তু তখনও তিনি 'শেষ কথা' বলেন নি। তাই কড়ি ও কোমলের 'শেষ কথা'য় লিখেছেন—

মনে হয় কী একটি শেষ কথা আছে,
সে কথা হইলে বলা সব বলা হয়।
কল্পনা কাঁদিয়া ফিরে তারি পাছে পাছে,
তারি তরে চেয়ে আছে সমস্ত হৃদয়।

কবি যেন এই একটি কথার জন্যই অপেক্ষা করে আছেন! কিন্তু ২২ অক্টোবর '৮৯০ সালে য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারিতে কবি-মনের পরিবর্তন ঘটে। কবি স্বগতোক্তি করেন 'কোন অসম্ভব সুখ, কোন দুর্লভ ভালোবাসার জন্য চিরদিন নির্বোধের মতো অপেক্ষা করে বসে আছি আমাদের কি অপেক্ষা করবার সময় আছে।' অবশেষে বসন্তের 'সমাপ্তি' ও অকাল বসন্তের সূচনায় চৈতালির 'শেষ কথা'য় কবির হৃদয়ে ভাব যজ্ঞ সুরু হয়ে মহাগানের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল ৩০ চৈত্র ১৩০২।।

এখনি বেদনাভরে ফাটি গিয়া প্রাণ
উচ্ছ্বসি উঠিবে যেন সেই মহাগান।
অবশেষে বুক ফেটে শুধু বলে আসি—
হে চির সুন্দর আমি তোরে ভালোবাসি।

'তনু' কবিতাটি মৃণালিনী দেবীর উদ্দেশেই রচিত এবং যখনই তাঁর রূপের বর্ণনা দিয়েছেন তখনই তনু' 'তনুদেহ' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'তনু' কবিতাটিতে 'পঞ্চদশ' কথাটিও গুরুত্বপূর্ণ এবং কবির বসন্তের সঙ্গে জড়িত। 'পূর্ণা' (পরিপূর্ণা, সফলা—সানাই) কবিতাটিতেও 'পঞ্চদশী' কথাটির উল্লেখ রয়েছে। এই পঞ্চদশী নারী, একদিকে তিনি কন্যা বা মাতৃরূপা অন্যদিকে যৌবনবতী মনোরমা প্রণয়িনী এই ৬টি স্বরূপে তিনি সফলা বা পরিপূর্ণা যাঁর মনের দিগন্তে অকারণ বেদনার গোপন অশান্তি। কবি মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে 'শেষ লেখা ৮ সংখ্যক' কবিতায় পঞ্চদশ কথাটি পরিবর্তিত করে 'বিবাহের পঞ্চম বরষে' পরিণত করেছেন। 'বিবাহের পঞ্চম বরষ' অর্থাৎ সাতাশ বৎসর পর্যন্ত কবির প্রথম বসন্ত, যে বসন্ত বহুস্বপ্নময় যৌবনের পরিণত রসপুঞ্জের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে আর

তা পুষ্পের মঞ্জরী থেকে ফলের স্তবকে পরিণত হয়ে অতিথিকে[৭] আহ্বান করে আনে। আবার বিবাহের প্রথম বৎসরে—

দিকে দিগন্তরে
শাহানায় বেজেছিল বাঁশি
উঠেছিল কল্লোলিত হাসি

কবির নবযৌবনের নববসন্তের প্রথম বৎসরে বিবাহ উৎসবের আনন্দের মধ্যে শাহানায় বসন্ত পঞ্চম রাগ বেজে উঠেছিল আর শেষ যৌবনের শেষ বসন্তে 'শুধু অকারণ পুলকে' বেজে উঠেছিল মুলতান রাগিণীর সঙ্গে প্রেমের গান। কবির আদিরসাত্মক কবিতার সূত্রপাতও কড়ি ও কোমল কাব্যগ্রন্থে। এই রীতির কবিতার প্রথম আধুনিক পথপ্রদর্শকও তিনি, এবং পরবর্তীকালের কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতায় তা প্রকাশ করেছেন। কড়ি ও কোমল কাব্যগ্রন্থখানির অধিকাংশ কবিতা এই পঞ্চদশী নারী ও সাতাশবর্ষীয় কবিকে নিয়েই রচিত হয়েছে যদিও এই নারীর সঙ্গে কবির রূপ ও চরিত্রের যথেষ্ট 'প্রভেদ' (বিচিত্রিতা) অনুধাবন যোগ্য।

এই নারী কবির বিপরীত চরিত্রের ছিলেন, ক্ষণিকার 'দুই তীরে' এবং সোনার তরীর 'দুই পাখি' (নর নারী) কবিতাটিতে তাঁদের দুই বিপরীত চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন—একজন ভালোবাসেন নীড় (খাঁচা), অন্যজন ভালোবাসেন আকাশ (সুদূর, বালুচর), এই নীড় ও আকাশের মাঝে বইছে ভালোবাসার নদী। এই চরিত্রগত পার্থক্যের জন্য তিনি ছিলেন কবির অচেনা[৭]। 'যাকে দশ-বৎসর জানি, সেই দশবৎসরের সুদীর্ঘ অংশ তাকে জানি নে—বোধহয় আজীবন সম্পর্কের জমা খরচ হিসাব করলে খুব একটা বড়ো রকম অঙ্ক হাতে থাকে না। এই তো কেবল চোখের জানা তারপরে মনের জানার তো কথাই নেই। সে কথা ভেবে দেখলে সবাইকেই অপরিচিত বলে বোধহয়।' (ছিন্নপত্র ১৩০)

'তুমি চেন না আমাকে, তোমাকে চিনি নে আমি
আজ পর্যন্ত কেমন করে এটা হল সম্ভব
তাই আমি ভাবি।"

আমি বললেম, "এই না চেনার মাঝখানে
চিরকাল ধরে আমরা দুজনে বাঁধব সেতু,
এই কৌতূহল সমস্ত বিশ্বের অন্তরে।" (পত্রপুট, ১৫ সংখ্যক।)

শ্যামলা[৮], শ্যামলী[৯] কবিতায় এই নারীর রূপ ও চরিত্রের বর্ণনা আছে। বাস্তবের এই ধীর, স্থির, শান্ত, আবেগহীন, সনাতনী, স্বল্পভাষী ও কল্যাণী নারী

এবং কবি কল্পনার অর্ধ মানবী ও অর্ধ কল্পনার মানসীকে ঘিরেই আবেগ প্রবণ কবির ভালোবাসা সম্বন্ধে সংশয়েব সূত্রপাত, যা কবিব ডায়ারি, কাব্য ও গানের অধিকাংশ অধিকার করে রয়েছে। হেমন্তবালা দেবীর প্রশ্নেব উত্তরে লিখিত 'নীহারিকা' (বিচিত্রিতা) কবিতায় এই অশরীরী নারীর উক্তি দিয়ে কবি নিজের সংশয়িত প্রেমেব কথাই ব্যক্ত করেছেন—"আমি যখন তোমাকে চুম্বন করে নিশুতি রাতেব অন্ধকাব ঘরে প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছিলাম, তখন তুমি আমাকে ভালো করে দেখনি, শুধু অর্ধ জাগরণেব মধ্যে দেখেছিলে। আমি তোমাব খেয়ালি পুরুষের প্রথমা নারী, যে তোমার জীবনে বর্ণ গন্ধ গান ও রহস্যময় যৌবনের আভাস নিয়ে প্রথম বসন্তেব ফুল ফুটিয়েছিল (কড়ি ও কোমল, মানসী কাব্যগ্রন্থ)। সেদিন তুমি আমাকে বুঝে নাও নি, জেগে উঠে কোন ভাষাও খুঁজে পাও নি আমাকে সমাদরও কর নি শুধু সংশয়ের দোলায় দুলে তুমি তোমার রাত কাটালে (সংশয়েব আবেগ-মানসী)। আমি যেন তোমার জীবনে এসেছিলাম অকাল বর্ষণেব এক পশলা ধারার মতো তারপরই তো আমাব জয় হল সেই স্বল্প পরিচয় নিয়েই আমি তোমাব ছন্দেব মধ্যে বাসা বেঁধেছি। আমি তোমার চেনা কিংবা অচেনা যাই হই না কেন আমি 'তোমারই'। আমাকে হারিয়ে আমারই বিরহের গান আজ তোমাব বীণায় বাজে। যেদিন আমি তোমার বসন্তে (শরৎকালে) একা এসেছিলাম সেদিন তোমাব যৌবন সুপ্ত ছিল। আমি তোমার সুপ্ত যৌবনকে জাগ্রত করে তোমার বদ্ধ হৃদয়কে ভালোবাসা দিয়ে উন্মুক্ত করে তাকে রাঙিয়ে গন্ধ বিভোল রঙ ছড়ানো বনেব ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছিলাম। আজ তাই তোমাব গানেব সঙ্গে, তোমার গোপন অশ্রুজলের মধ্যে তোমাব আনন্দের মধ্যে আমারই বিরহেব গান রয়েছে এবং আমার প্রিয় হাতের ছোঁয়া[১০] তোমাব কাব্যের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে।"

চিত্রা ও কল্পনা কাব্যগ্রন্থে (১৩০৬ বঙ্গাব্দ) কবির যখন 'দুঃসময়' আরম্ভ হল সেই 'দুঃসময়ে' একমাত্র মৃণালিনী দেবীই ছিলেন ঋণগ্রস্ত কবির 'সান্ত্বনা'-দাত্রী নারী এবং

সুদিনে দুর্দিনে
কল্যাণকঙ্কন করে,
সীমন্ত সীমায় মঙ্গলসিন্দুর বিন্দু,
গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্র শিয়রে।

ঋণভারে জর্জ্জরিত বেহিসাবি[১১] কবি যখন শিলাইদহে ও শান্তিনিকেতনে কর্ম যজ্ঞের 'উদ্‌বোধন' করলেন সেই চরম 'দুর্দিনে' (ক্ষণিকা) এই কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী নারীই কবির কাব্যের ও কল্যাণকর্মের প্রেরণাদাত্রী। নিজের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষাকে তুচ্ছ করে দুঃখ দৈন্যকে সানন্দে বরণ করে নিয়েছিলেন তিনি। ঋণগ্রস্ত কবির সংসারের সমস্ত গুরুভার বহন করেছিলেন একা। আর এভাবে কবিকে দুঃখ দৈন্য থেকে মুক্ত করে রাখেন (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ)। 'কৃতার্থ' কবির 'কৃতজ্ঞ'তা নিম্নের কয়ছত্রে তো নিদারুণ বিধৃত।

তুমি আছ একা সজল নয়নে
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি।
চোখে ঘুম নাই, কথা নাই মুখে
ভীত পাখি সম এলে মোর বুকে
আছে আছে বিধি এখনো অনেক
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি
সকলি ফাঁকি।

এই 'কৃতার্থ' কবিতাটিই পরবর্তীকালে পূরবীতে 'কৃতজ্ঞ' রূপে স্থান পায়। আর তাতেও সেই সময়কার দুঃখ বেদনার কথা গাঁথা আছে।

এই শ্যামল বরণ (সজলনীল-জলদ বরণ, কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীই কবির শেষ পূজারিণী নারী ও শেষ কাব্যলক্ষ্মী। এই নারীই তো কবির 'দুর্দিনে' অকাল বসন্তের ঘন বরষার মধ্যে একলা শুধুমাত্র 'এক আঁটি ধান নিয়ে' ঋণগ্রস্ত কবির কাব্যতরণীতে ধুলা পায়ে আসেন। কেননা কবির আহ্বান ছিল,

এসো এসো নায়ে!
ধুলা যদি থাকে কিছু
থাক-না ধুল পায়ে।
তনু তোমার তনুলতা
চোখের কোণে চঞ্চলতা,
সজলনীল-জলদ-বরণ
বসনখানি গায়ে।
তোমার তরে হবে গো ঠাঁই
এসো এসো নায়ে।

[একা তুমি, তোমার শুধু একটি আঁটি ধান - লক্ষ্মীর প্রতীক বা দূতী। গৃহলক্ষ্মী অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার (পশ্চিম-যাত্রীর-ডায়ারি ৫৭৬ পৃষ্ঠা)। 'বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর আসন টলেছিল। তিনি পাঠিয়ে দিলেন তাঁর কোনো কোনো দূতীকে'—গৃহলক্ষ্মী।]

কবির শেষ যৌবনে এই নারীর 'আবির্ভাবে' কবির জীবনের ধারা ও কাব্যের ধারা পরিবর্তিত হল। কবি মহামানব রবীন্দ্রনাথে পরিণত হলেন। তাই 'আবির্ভাব' কবিতাটি কবির কাব্যে ও জীবনে যেন এক পরম সন্ধিক্ষণে লিখিত হয়েছে। কবির প্রথম যৌবনে, শরৎকালের বাসন্তী রং এর আকাশে যে নারীকে আপন বর্ণ গন্ধ গান ও বসন্তের শরতের রূপ নিয়ে দেখেছিলেন, সেই বসন্তের নারীকেই আবার যৌবনের শেষে সংসারের নানান্ অভিজ্ঞতার মধ্যে বর্ষার শ্যাম সমারোহে আর এক মূর্তিতে দেখলেন দুখের দিনের একমাত্র সাথীরূপে, কল্যাণকর্মের প্রেরণাদাত্রী কল্যাণী নারীরূপে, এবং পূজারিণী বেশে। কবি যৌবনে যার ভরসায় অপেক্ষায়) ছিলেন তিনি এলেন ভরা বরষায় অর্থাৎ যৌবনের শেষে—

আস নাই তুমি নবফাল্গুনে
ছিনু যবে তব ভরসায়।
এসো এসো ভরা বরষায়।
এসো গো গগনে আঁচল লুটায়ে
এসো গো সকল স্বপন ছুটায়ে,
এ পরান ভরি যে গান বাজায়ে
সে গান তোমার করো সায়
আজি জল ভরা বরষায়।

কবি 'আবির্ভাব' প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'এক সময়ে প্রাণ মন ছিল ফাগুন মাসের জগতে কড়ি ও কোমল, মানসী) তখন জীবনের কেন্দ্রস্থলে একটি রূপ দেখা দিয়েছিল আপন বর্ণ গন্ধ গান নিয়ে সে বসন্তের রূপ যৌবনের আবির্ভাব—তার আশা আকাঙ্ক্ষার একটি বিশেষ বাণী ছিল। তারপর জীবনের অভিজ্ঞতা প্রশস্ত তর হয়ে এল, তখন প্রথম যৌবনের বাসন্তী রং-এর আকাশে ঘনিয়ে এল বর্ষার সজল শ্যাম সমারোহ, জীবনে বাণীর বদল হল, বীণায় আর এক সুর বাঁধতে হবে সেদিন যাকে দেখেছিলাম এক বেশে একভাবে আজ তাকে দেখছি আর এক মূর্তিতে খুঁজে বেড়াচ্ছি তারই অভ্যর্থনার নূতন আয়োজন।'

কে জানিত মোরে এত দিবে লাজ ?
তোমার যোগ্য করি নাই সাজ,
বাসর-ঘরের দুয়ারে করালে,
পূজার অর্ঘ্য বিরচন,
এ কি রূপে দিলে দরশন ! (১০ আষাঢ় ১৩০৭)।

এবার কবির কাব্যলক্ষ্মী পূজারিণী বেশে দেখা দিল তাই ক্ষণিকার পরবর্তীকালের রচনা নৈবেদ্য, খেয়া. উৎসর্গ. গীতাঞ্জলি. গীতালি গীতিমাল্য প্রভৃতি কবিতায় কবি পূজার অর্ঘ্যই রচনা করলেন। এই পূজারিণী নারী তাঁর শূন্য পূজার ফুলের সাজি নিয়ে একলা এতদিন পরে কবির 'দুর্দিনে' ক্ষণিকা) অর্থাৎ শেষ যৌবনের বর্ষাতে এলেও কবি তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নিলেন—

যাহা আছে লও প্রসন্ন করে
ও সাজি তোমার ভরে কি না ভরে -
ওই—যে আবার নামে বারিধার
ঝরঝর বরষণে।

কবির যখন যৌবন ছিল সেই মধুমাসে কখনো তাঁর গানের অভাব ঘটে নি, কিন্তু এই শেষ যৌবনে যখন বর্ণ গন্ধ গান রিক্ত হয়ে এসেছে সেই রিক্ত যৌবনের দিনে এবং সাংসারিক দুর্যোগের মধ্যে ঋণগ্রস্ত কবি যখন জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন. সেই সময় কবির জীবনে অমৃতরস নিয়ে এই নারী এল —'এত দিন পরে তুমি যে এসেছ/কী জানি কী ভাবি মনে।' ক্ষণিকার 'দুর্দিন' কবিতাটির মধ্যে রক্তকরবী নাটকটির আভাস রয়েছে। দুর্দিন —কবির দুঃসময় , রিক্ত জীবন ও রিক্ত যৌবনের দিন পশ্চিম -যাত্রীর—ডায়ারি ৫৪৭ পৃষ্ঠা)। কবির জীবনে এই নারী দেরীতে এলেও কবি তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে বললেন এবং ধুলায় লুণ্ঠিত ছিন্ন মলিন ফুলগুলি যত্নে তুলে দিলেন। যদিও কবির শেষ যৌবনে কিছুই অবশিষ্ট নাই তবুও যা 'স্বল্প শেষ' (ক্ষণিকা) আছে সেইটুকু দিয়েই কবি তাঁকে একটি ছোট নূতন গান রচনা করে দিতে পারেন। তাই কবি এই 'কল্যাণী' নারীর বন্দনা করে সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ-গানটি তাঁর উদ্দেশ্যে রেখে দিলেন.—

আমার কাব্যকুঞ্জবনে
কত অধীর সমীরণে

কত যে ফুল কত আকুল
মুকুল খসে পড়ে—
সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান
আছে তোমার তরে। (২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭,।

এই নারীর মৃত্যুর কারণে তাঁকে শ্রেষ্ঠ গানটি শোনাতে পারলেন না, এই দুঃখই কবির সমস্ত কাব্যের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে অবিরাম—

বিরহের কালো গুহা ক্ষুধিতগহ্বর থেকে
ঢেলে দিয়েছে ক্ষুভিত সুরের ঝর্ণা রাত্রিদিন। (পত্রপুট ১২)।

আর, কবি যে কথা কখনো কোথাও বলেন নি, সেই না বলা কথা দিয়ে নূতন বীণায় তার বেঁধে বিশ্ববাসীর উদ্দেশে নূতন গান 'নিবেদন' করলেন—

যে-বাণী আমার কখনো কারেও
হয় নি বলা
তাই দিয়ে গানে রচিব নূতন
নৃত্য কলা। (মহুয়া ২৭ শ্রাবণ, ১৩৩৫।

মৃত্যুর শেষ অভিজ্ঞতা—(কল্যাণরূপ স্মরণ ১৩ সংখ্যক, আরোগ্য বার সংখ্যক, বয়স ৪১)

শুধালেম, 'আরো কিছু আছে না কি,
আছে বাকি
শেষ বজ্রপাত ?'
নামিল আঘাত।
এই মাত্র ? আর কিছু নয় ?
ভেঙে গেল ভয়।

কবির শেষ যৌবনে পর পর মৃত্যু এসে তাঁর জীবনকে ক্ষত বিক্ষত ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিল। তখন সেই দুঃখের আঘাত কবি অসীম ধৈর্য সহকারে হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে সংহত করে কল্যাণ কর্মের দিকে মনকে নিয়োজিত করলেন (আরোগ্য বার সংখ্যক, শেষ সপ্তক দশ)। কবি ধীর স্থির ভাবে শেষ যৌবনে যে মৃত্যু-দুঃখ বহন করেছিলেন, সেই মৃত্যু কবির জীবনে কল্যাণের রূপ ধরে দেখা দিল—'সেদিন অশ্রু-ধৌত সৌম্য বিষাদের (শান্ত বিষাদ) দীক্ষা পেলে তুমি' (শেষ সপ্তক আটত্রিশ)। কবির জীবনে দুই নারীর মৃত্যু দুই রূপে দেখা দিল। প্রথম যৌবনের মৃত্যু কবিকে

উদ্‌ভ্রান্ত ও দিশাহারা করে দিয়ে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল (জীবনস্মৃতি), শেষ যৌবনের মৃত্যু তাঁর সমস্ত শক্তিকে সংহত করে কর্ম যজ্ঞের দিকে টেনে নিয়ে গেল (চিঠিপত্র দশম খণ্ড ১১ পরিচ্ছেদ, স্মরণ ১৩ সংখ্যক, পথে ও পথের প্রান্তে ১৮ সংখ্যক)। এই দুই মৃত্যুর অভিজ্ঞতার প্রভাব তাঁর কাব্যে ও সাহিত্যে রয়েছে।

মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুশোকের কথা কবি কখনো কোথাও বলেন নি বা লেখেন নি। সেই শোকের আঘাত তিনি আজীবন নিঃশব্দে বয়ে বেড়িয়েছেন। প্রকাশ্যভাবে তাঁকে কোন কাব্যগ্রন্থও উৎসর্গ করেন নি। কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে 'উপহার' দিয়েছেন মানসী কাব্য গ্রন্থখানি (মানসী-উপহার)। আর তাঁর উদ্দেশ্য আলাদাভাবে লিখে গেছেন 'স্মরণ' (In memorium) এবং উৎসর্গের বহু কবিতা যা মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর কয়েকমাস পরে লিখিত হয়েছে। কবি শোকের কথা প্রকাশ করেছেন কবিতার মাধ্যমেই যে কবিতা কবির আজন্ম প্রেয়সী এবং কবির জীবনের 'সমস্ত গভীর সত্যের আশ্রয় স্থান।' তাই স্মরণের প্রতিটি কবিতাই অত্যন্ত মূল্যবান কারণ তাঁর শোকের কথা শুধু স্মরণেই প্রকাশ করেছেন আর অন্য কোথাও প্রকাশ করেন নি। এমন কি মৃত্যুজনিত আবেগপ্রবণতার জন্য কবি আত্মচরিত পর্যন্ত প্রকাশ করতে পারেন নি। মংপুতে আত্মজীবনী প্রকাশ করা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—'সে হয় না, সে হয় না। যে পর্যন্ত হয়, সে পর্যন্ত ছবি মাত্র, সে পর্যন্ত ত লিখেছি, কিন্তু যখন সত্যিকারের জীবন সুরু হল সে আর লেখা যায় না। লিখতে গেলে আবার সেই Experience-এর মধ্যে চিন্তা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়,—সে বড় বেদনা। আর দেখো ঐ ডায়ারি, সে আমার দ্বারা কোনো কালে লেখা হল না, Emotion-এর একটা গোপনীয়তা আছে, তা হাটের মাঝখানে প্রকাশ্য নয়।' কবির জীবনে এই মৃত্যুই সবচেয়ে কঠিনতম আঘাত (শেষ বজ্রপাত—মৃত্যুঞ্জয়, পরিশেষ) যা' কবি আজীবন নিঃশব্দে বয়ে বেড়িয়েছেন—'মৃত্যু আছে যে মৃত্যু—সে যে হঠাৎ আসে, তখন জীবন বৃত্তান্ত যেমন করে শোনাতে চাও না তেমন করেই লোকে শোনে' (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ২০২ পৃষ্ঠা)। এই মৃত্যুজনিত আঘাতের জন্যই কবির উৎসর্গপত্রের বিরলতা দেখা দেয়, এমন কি কবির শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'গীতাঞ্জলি'ও উৎসর্গপত্র বিহীন। এবং পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদেও উদাসীন ছিলেন তিনি। ক্ষণিকার পরবর্তী অধ্যায়ে কবির 'শ্রেষ্ঠ গানটি' শোনাতে পারলেন না বলে মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর চার মাস পরে উৎসর্গ ৪০ সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন—

কেন না গেলে শুনি একটি গান আরো—
সে গান শুধু তব সে নহে আর কারো—
তুমিও গেলে চলে সময় হল তারো
ফুটল তব পূজা তরে। (১০ চৈত্র ১৩০৯)।

এই শেষ যৌবনের মৃত্যুতে তাঁর বেশভূষা একেবারেই পাল্‌টে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করলেন। প্রথম যৌবনের লেখা কড়ি ও কোমল কাব্যগ্রন্থে যেমন মৃত্যুশোকের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কবির বসন্ত (শরৎকাল, ফাগুন মাস) তেমনি শেষ যৌবনের লেখা 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মৃত্যুশোকের সঙ্গে মঙ্গল কর্ম। 'কড়ি ও কোমল' যেমন নূতন অধ্যায়ের সূচনা, 'স্মরণ' তেমনি শেষ অধ্যায়ের সূচনা। তাই কবির জীবনে স্মরণ কবিতাটির মূল্য অপরিসীম কারণ স্মরণের' পরেই তিনি রূপ থেকে অরূপে গিয়ে পৌঁছুলেন। ভাব থেকে রূপে এবং রূপ থেকে অরূপে—অর্থাৎ ভাব কল্পনার মানসী থেকে পূজারিণী নারী রূপে ক্ষণিকা, এবং ক্ষণিকা থেকে অশরীরী নারী রূপে অধরা (অরূপ)। এই মৃত্যুর ভিতর দিয়েই কবি প্রেমকে এবং অসীমকে প্রত্যক্ষ করলেন —

সহমরণের বধূ
বুঝি এমনি করেই দেখতে পায়
মৃত্যুর ছিন্নপর্দার ভিতর দিয়ে
নূতন চোখে
চির জীবনের অম্লান স্বরূপ।

এই কল্যাণী নারীর প্রেমের স্মৃতিই কবির পরবর্তীকালের জীবনকে ও কাব্যকে প্রভাবান্বিত করেছিল (চিঠিপত্র ১০ম খণ্ড একাদশ পরিচ্ছেদ), এবং ক্রমে কবির এই প্রেমই বিশ্ব প্রেমে পরিণত হয়ে অসীমের দিকে প্রসারিত।

শ্যামলী (রূপ ও চরিত্র)। মাটির শ্যামল অঞ্জন।

কবি সঙ্কোচের জন্যই ভালোবাসার কথা প্রকাশ করতে পারেন নি। শেষ সপ্তক ছাব্বিশ সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন—

মন অনায়াসে মাথা তুলে বলতে পারে না—
"ভালোবাসি"
সংকোচ লাগে কণ্ঠের কৃপণতায়।

পূরবীর 'চাবি' কবিতায় লিখেছেন—

সেখানে লাজুক পাখি ছায়াঘন শাখে,
মধ্যাহ্নে করুণ কণ্ঠে উদাসীন প্রেয়সীরে ডাকে।

আবার মংপুতে বলেছেন—Emotion এর গোপনীয়তা আছে (১২৫ পৃষ্ঠা)। তাই কবি অশরীরী শ্যামলী নারীমূর্তিকে কবিতার মধ্যে সবচেয়ে গোপন করে রেখেছেন, যাঁর কথা কবি কখনো কোথাও বলেন নি, অথচ বহু কবিতাই কবি এই নারীর উদ্দেশে লিখেছেন। কবির কবিতাগুলির মধ্যে যে অশরীরী নারীমূর্তি কবির কাব্যে অপরূপ মূর্তি পরিগ্রহ করে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে, তার ভাব মূর্তি এবং চরিত্রের পরিচয় তাঁর কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমেই পাওয়া যায়, বিশেষ করে 'শ্যামলা' (বিচিত্রিতা) ও 'শ্যামলী' কবিতায়। শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থে 'দ্বৈত' কবিতায় আছে—

আমি তোমার কারিগরের দোসর,
কথা ছিল তোমার রূপের' পরে মনের তুলি
আমিও দেব বুলিয়ে,
পুরিয়ে তুলব তোমার গড়নটিকে।

অর্থাৎ কবি এই স্বল্প ভাষী (মৌন ভাষা-মানসী) নারীকে অনুরাগের ধারা দিয়ে নিজেই সৃষ্টি করেছেন মানসী' রূপে। এই নারীর রূপ তিনি ভাব ও কল্পনা দিয়ে রসের তুলিতে এঁকেছেন। এই কারণে এই নারীর সান্নিধ্য তাঁর অনুভবের মধ্যেই ছিল (কবি প্রিয়া—উর্মিলা দাস ৪৬ পৃষ্ঠা, রবীন্দ্রনাথের পরলোক চর্চা—অমিতাভ চৌধুরী)।

শ্যামলী—এই নারীর রং শ্যামলা—'তাতে আছে যেন এই মাটির শ্যামল অঞ্জন' তনুদেহ, শান্ত অধর (পুরুষের উক্তি), মুগ্ধ সবল কালো হরিণ চোখ (যুরোপ—যাত্রীর ডায়ারি ৪০২ পৃষ্ঠা, কৃষ্ণকলি, ক্ষতিপূরণ—ক্ষণিকা), ভীরু সঙ্কুচিতা (পঞ্চমী—আকাশ প্রদীপ, ক্ষণিকা—পূরবী), ধীর, স্থির, গম্ভীর (চিত্রা—চিত্রা, শ্যামলা—বিচিত্রিতা), স্বল্পভাষী (মৌনভাষা—মানসী) অভিমানী (য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি, পুরুষের উক্তি—মানসী, অদেয়—সানাই, কবি প্রিয়া—উর্মিলা দেবী) বেদের মেয়ের মতো বাসা ভাঙে বারে বারে, যিনি নিঃশেষে গরীব এবং গাঁঠছড়ার বাঁধন দেন না (অধিকার দাবি করেন না—স্মরণ ১৯ সংখ্যক, শ্যামলা—শ্যামলী), 'ভালো' (বাঁশিওয়ালা—শ্যামলী, মুক্তি-পলাতকা, চিঠিপত্র—১ম খণ্ড), কবির অচেনা (ক্ষণিক মিলন—কড়ি ও কোমল, ক্ষণিকা, বিচিত্রিতা, ছিন্নপত্র ১৩০ সংখ্যক, পত্রপুট ১৫ সংখ্যক), আবেগহীনও সনাতনী (চিরকালিনী) কল্যাণী বাংলা দেশের মেয়ে—

আমাদের কত ত্রুটি আসনে ও শয়নে,
ক্ষমা ছিল চিরদিন তাহাদের নয়নে।

প্রেমদীপ জ্বেলেছিল পুণ্যের আলোকে
মধুর করেছে তারা যত কিছু ভালোকে।
নানা রূপ ভোগ সুধা যা করেছে বরষণ
তারে শুচি করে'ছিল সুকুমার পরশন।

'প্রেম অনেক সহ্য করে, অনেক ক্ষমা করে আঘাতকে গ্রহণ করিয়াই সে আপনার মহত্ত্ব প্রকাশ করে' (আত্মপরিচয়, পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি, শেষ সপ্তক এক, স্মরণ দুই সংখ্যক)। এই রূপটিই কবির কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়, যাঁকে কবি মলিন বেশে 'প্রচ্ছন্ন' করে রেখেছেন। ইনিই কবির-অন্তর বাসিনী বা ভূতল, যাঁর অভিমানের জন্যই কবি আত্মচরিত লেখেন নি—

আঁধার করে আছে আমার সমস্ত জগৎ,
পাই নে খুঁজে সার্থকতার পথ। (অদেয়—সানাই)।

অথবা

মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
যে উদ্ধার কার জীবনকে
সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যা'চ্ছ চলে।

শরৎ পর্যায়ের প্রথম পর্বের কাব্যগ্রন্থ কড়ি ও কোমল (কবি রবীন্দ্রনাথ)।

নবযৌবনের নববসন্ত

কাদম্বরী দেবীর মর্মান্তিক মৃত্যুর পর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থে রয়েছে কবির নবযৌবনের নববসন্তের গান। একদিকে মৃত্যুশোক অন্যদিকে যৌবনের রসোচ্ছ্বাস এই দুই ধারার কবিতা কড়ি ও কোমলের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই কড়ি ও কোমলেব প্রথম দিকের কবিতাগুলিতে দুই বিপরীতধর্মী কবিতা দেখা যায়, জীবন ও মৃত্যু নূতনও পুরাতন, আনন্দ ও বিষাদের কবিতা। পরবর্তীকালে যখনই এই সময়কার কথা কবি কবিতায় প্রকাশ করেছেন তখনই লিখেছেন— বিচ্ছেদে-মিলনে[১২], দুঃখে-সুখে[১৩], আনন্দ ও বিষাদে[১৪], জীবনমৃত্যুর হরণেপুরণে[১৫] ও বিরহানন্দ[১৬] এই বিপরীত দুটি শব্দ এবং বিশ্বপ্রকৃতিতে ধরা দিল ধ্বংস ও সৃষ্টি, ভীষণ ও মধুর রূপে আর নারীর মধ্যে দেখা দিল উদ্‌ভ্রান্ত ও কল্যাণ রূপ।

কড়ি ও কোমলের প্রথম কবিতা 'প্রাণ'। প্রাণ—জীবন, মন হৃদয়স্থ বায়ু। স্বভাবতঃ মন নির্মল আলোকময় ও অমিশ্র। স্বচ্ছ জল যেমন বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণে বিভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয় সেরূপ নির্মল মন ও বিভিন্ন বাহ্যিক উপসর্গের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়। মন যখন দুঃখের সমুদ্রে নিমগ্ন হয় তখনই সে চেষ্টা করে কি ভাবে সে দুঃখকে অতিক্রম করে আনন্দে প্রেমে অমৃতে পৌঁছাবে। কবি যখন দুঃখের সমুদ্রে নিমগ্ন হলেন তখনই তিনি উপলব্ধি করলেন, 'সংসারের বিশ্বব্যাপী অতি বিপুল ভাব জীবনমৃত্যুর হরণেপূরণে আপনাকে আপনি সহজেই নিয়মিত করিয়া চারিদিকে কেবলই প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে সে-ভাব বদ্ধ হইয়া কাহাকেও কোনোখানে চাপিয়া রাখিয়া দিবে না, একেশ্বর জীবনের দৌরাত্ম্য কাহাকেও বহন করিতে হইবে না, এই কথাটা একটা আশ্চর্য নূতন সত্যের মতো আমি সেদিন যেন প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম।' তাই 'কড়ি ও কোমলে' লিখেছেন—

সে কি চায় শুষ্ক বনে গাহিবে বিহঙ্গগণে
আগে তারা গাহিত যেমন ?
আগেকার মতো করে স্নেহে তার নাম ধরে
উচ্ছ্বসিবে বসন্ত পবন ?
নহে নহে সে কি হয়! সংসার জীবনময়
নাহি হেথা মরণের স্থান।
আয়রে নূতন, আয়, সঙ্গে করে নিয়ে আয়,
তোর সুখ, তোর হাসি গান।
ফোটা নব ফুলচয়, ওঠা নব কিশলয়,
নবীন বসন্ত আয় নিয়ে।

এই হচ্ছে প্রাণের ধর্ম দুঃখের মধ্যেও সে ভালোবাসাকে অবলম্বন করে বাঁচতে চায়। তাই কবি নবযৌবনের নববসন্তের প্রারম্ভে 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' এই পংক্তিটি লিখে এই কাব্যগ্রন্থের এবং জীবনের গতি পরিবর্তন করে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করলেন। 'প্রাণ' কবিতার পরেই রয়েছে 'পুরাতন' ও 'নূতন' কবিতা দুটি। নূতন' তাঁর ভালোবাসা দিয়ে কবিকে জীবনমৃত্যুর ভিতর দিয়ে অনন্তের পূজার মন্দিরে নিয়ে গিয়ে কবিকে প্রথম মৃত্যুদুঃখ থেকে উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়। তাই কবি উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' এবং নূতন কবিতায় লিখলেন—

আনে হাসি, আনে গান, আনে রে নূতন প্রাণ,
সঙ্গে করে আনে দিবাকর,
অশোক শিশুর প্রায় এত হাসে এত গায়
কাঁদিতে দেয় না অবসর।

প্রথম যৌবনের লেখা 'প্রাণ' এবং শেষ যৌবনের লেখা 'উদ্‌বোধন' এই দুটি কবিতাই কবির জীবনে ও কাব্যে বড় স্থান অধিকার করে রয়েছে। 'প্রাণ' দিয়ে কবি নবযৌবনকে ও নববসন্তকে আহ্বান করলেন, প্রেম দিয়ে আহ্বান করলেন শেষ যৌবনের অকালবসন্তের পূজারিণীকে। আর তারই সঙ্গে ১৩০৭ বঙ্গাব্দে শিলাইদহে কর্মযজ্ঞের 'উদ্‌বোধন' করেন। নবযৌবনে এই নারীর আগমন তাঁর জীবনের ধারা ও কাব্যের ধারাকে আমূল বদলে দিয়ে যায়। 'কড়ি ও কোমলে'ই কবির আদিরসাত্মক কবিতার সূত্রপাত। যা' কবির পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে লিখিত হয়েছে। 'কড়ি ও কোমলে'র শেষ পর্বে ১৮৮৬ সালের শেষের দিকে কবির অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। কবি-মনের প্রথম পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় 'কেন' এবং 'মোহ' কবিতায় যা পরবর্তীকালে মানসীতে 'ভুল-ভাঙা' কবিতায় পরিবর্তিত হয়ে গেল। কবি মোহ কবিতায় নিজেকে বিশ্লেষণ করেছেন—

কেহ কারে নাহি চিনে আঁধার নিশায়।
ফুল ফোটা সাঙ্গ হলে গাহে না পাখিতে।

আবার মানসীর 'ভুল-ভাঙা' কবিতায় লিখেছেন,

বাঁশি বেজেছিল, ধরা দিনু যেই
থামিল বাঁশি—
এখন কেবল চরণে শিকল
কঠিন ফাঁসি।

এই কবিতা দুটিতে কবির মনের ভাব ভালোভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। কবি 'ভুলে' (মানসী) যে 'মোহে'র (দেহের—কড়ি ও কোমল। আবর্তে পড়েছিলেন, মানসীতে সেই 'ভুল ভেঙে' গেল (ভুলভাঙা—মানসী)। আবার 'পবিত্র প্রেম' ও 'পবিত্র জীবনে' কবি যাঁকে ভালোবেসেছিলেন তাঁকে কামনা বাসনা মুক্ত 'পবিত্র প্রেম' দিয়ে পূজা করে 'পবিত্র জীবন' যাপন করতে চেয়েছিলেন কারণ—

এ নহে খেলার ধন, যৌবনের আশা—
বোলো না ইহার কানে আবেগের বাণী;

নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস,
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিয়ো না টানি।
এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল-আশ্বাস,
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি॥

এই কবিতা দুটির (পবিত্র প্রেম, পবিত্র জীবন) সম্মিলিত ভাব যেমন কবির মানসিক দ্বন্দ্বের কারণ হয়েছিল মানসীতে, তেমনি আবার 'পবিত্র প্রেম' ও 'পবিত্র জীবনে'র পরিণতি হিসাবে 'ধ্যান' কবিতার জন্ম যা সুদূর ভবিষ্যতে—

মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিত-বাহিনী।
মহীয়সী নারী স্নান করে উঠেছে
তারই অতল থেকে।
সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে
আমার সর্ব দেহে মনে,
পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে।
জেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে
চিরবিরহের প্রদীপশিখা।

কড়ি ও কোমলের 'পবিত্র প্রেম' ও 'পবিত্র জীবনে'র শেষ পরিণতি শেষ লেখা দুই, সাত, জন্মদিন (সেঁজুতি-৫৫০ পৃষ্ঠা), প্রান্তিক সাত সংখ্যক কবিতাগুলির মধ্যে ধৃত।

মানসী (শিল্পী রবীন্দ্রনাথ) ১৮৮৮-৯০

পড়েছে তোমার পরে' প্রদীপ্ত বাসনা,
অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।
মানসী-চৈতালি।

সুচনা—মানসীর সূচনা করলেন কবি-কল্পনার রোম্যান্টিক শহর গাজীপুরে ১৮৮৮ সালে (আত্মপরিচয় ২১০ পৃষ্ঠা, মানসী কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা)।

সমাপ্তি—য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী ২৮ অক্টোবর ১৮৯০ সালে, মানসী কাব্যগ্রন্থের 'আমার সুখ' কবিতায়।

উৎপত্তি—ধ্বনির জগতে—বিরহ ও আনন্দ ধ্বনি।

ভৌগোলিক অবস্থান—মানসীর বহু কবিতা কবি-কল্পনার রোম্যান্টিক সহর গাজীপুরে ১৮৮৮ সালে রচনা করেন। কবি গাজীপুরে বৃদ্ধ মহানিম

গাছের তলায় বসে ইঁদারার জলে বাগান সেচ দেবার করুণ ধ্বনি শুনতে শুনতে অদূর গঙ্গার স্রোতে কল্পনাকে অহৈতুক বেদনায় বোঝাই করে দূরে ভাসিয়ে দিয়ে কবি রচনা করেছেন মানসী কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি (আত্মপরিচয় ২১০ পৃষ্ঠা)। তাই পরবর্তীকালে গঙ্গায় গুণটানা নৌকা, গোলক চাঁপার ঘন পল্লব থেকে রৌদ্র-তপ্ত প্রহরে ভেসে আসা কোকিলের-ডাক, প্রাচীন মহানিম গাছ, পিতল-কাঁকন পরা ভজিয়ার যাঁতা ভাঙার শব্দ এবং ইঁদারার জলে বাগান সেচ দেবার করুণ ধ্বনি কবির প্রথম যৌবনের গাজীপুরের 'স্মৃতি' (পুনশ্চ)। গাজীপুর ছাড়া তিনি কবিতা রচনা করেছেন পার্ক ষ্ট্রীট, জোড়াসাঁকো, শান্তিনিকেতন, সোলাপুর, খিরকি, লণ্ডন ও রেড সীতে (Red Sea-য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী)।

উৎপত্তি—রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবন সংবেদনশীল ও রসলোলুপ মনের জন্য পৃথিবীর রূপ রস বর্ণ গন্ধ স্পর্শ[১৭] ও ধ্বনি সবই তাঁর মনোজগতে ধরা পড়ে। কবির সূক্ষ্ম তারে বাঁধা মন অচেনা জগতের ভাষাহীন নানান ধ্বনির আঘাত, কবির হৃদয়কে দোলা দিয়ে বুদ্ধির অগম্য অস্তিত্বের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে যায় এবং জনপূর্ণ জীবনের যে আবেগ, নানা ভাবে পৃথিবীতে প্রতিদিন যা বয়ে চলেছে সেই স্বর, ধ্বনি রূপে তাঁর চেতনাকে জাগ্রত করে সৃষ্টির আদিম ভূমিকায় নিয়ে গেছে।

মানসী কাব্যগ্রন্থ—এই ধ্বনির জগতেই মানসী কাব্যগ্রন্থখানি সৃষ্ট। কবির অন্তরে সংসারের বিচিত্র কলরোলের আনন্দ ধ্বনির মিলিত উচ্ছ্বাস এবং বাইরে বাগান সেচ দেবার করুণ ধ্বনির বিরহী ভাবনা, এই দুই এর ব্যাকুল মনের সুখোচ্ছ্বাসই মানসী (মূর্তিমতী মর্মের কামনা) কাব্যগ্রন্থের মর্মকথা। কবির নিভৃত চিত্ত জগতের এই দুই বিচিত্র তরঙ্গ ধ্বনির মিলিত আঘাত (বিরহানন্দ, ধ্বনিরূপে) কবির হৃদয়ে যা ক্ষণে ক্ষণে বেজে উঠেছিল, সেই মিলিত সুখোচ্ছ্বাস দিয়ে কবি অসীমের সীমাকে, আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে' সৃষ্টি করলেন মানসী প্রতিমার মধ্যে। তাই পরবর্তীকালে সৃষ্টি যুগের প্রথম লগ্নের' এই দিনটির স্মরণে শেষ সপ্তক ছাব্বিশ সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন—

সৃষ্টি যুগের প্রথম লগ্নে
প্রাণ সমুদ্রের মহাপ্লাবনে
তরঙ্গে তরঙ্গে দুলেছিল এই মন্ত্র-বচন।
এই বাণীই দিনে দিনে রচনা করেছে
স্বর্ণচ্ছটায় মানসী প্রতিমা

আমার বিরহ-গগনে
অস্ত সাগরের নির্জন ধূসর উপকূলে।

(মন্ত্র-বচন-ভালোবাসা। সৃষ্টি যুগের প্রথম লগ্নে—শিল্পী কবির প্রথম সৃষ্টি মানসী রচনা কালে।)

শিল্পী ও স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ—

মানসী কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে এই প্রথম নানা রকম ছন্দের প্রকাশ হতে লাগল, এবং কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যেন একজন শিল্পী ও স্রষ্টা এসে যোগ দিল এবার শিল্পী ও স্রষ্টা কবি অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে (সংশয়ের আবেগ) ভাব দিয়ে রূপ দিয়ে অনুরাগের ধারা দিয়ে গড়ে তুললেন মানসী প্রতিমা। এবং কবি নিঃসন্দেহ যে তাঁর নির্মান সম্পূর্ণ হয় নি বাকী থেকে গেছে অনেক কিছুই। তাই প্রমথ চৌধুরীকে লেখে—'আমি ভালোবাসি অনেককেই কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেছি সে মানসেই আছে—সে Artist এর হাতে রচিত ঈশ্বরের অসম্পূর্ণ প্রতিমা, ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কি?' কবি-ভালোবাসেন অনেককেই—অর্থাৎ কবির ভালো লাগে অনেককেই (ভালো লাগা—পশ্চিম-যাত্রীর ডায়েরী ৫৭৭ পৃষ্ঠা), কিন্তু অনেকের মধ্যে কবি যাঁকে ভালোবাসেন তাঁকে মানসীতে খাড়া করেছেন, সে Artist এর হাতে রচিত কবিরই প্রথম অর্ধ মানবী ও অর্ধ কল্পনার অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে তা পূজারিণী নারীরূপে ক্ষণিকাতে সম্পূর্ণ হয় (আবির্ভাব ১৩০৭ শিলাইদহ)। প্রমথ চৌধুরীকে মানসী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'ওর আসল সত্যকথাটুকু হচ্ছে এই যে মানুষ কি চায় তা কিছু, জানে না এক ঘটি জল চায় কি আধ খানা বেল চায় জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারে না,—আমি এমন অবস্থায় মনের সঙ্গে আপোষে বোঝাপড়া করে কল্পনার কল্পবৃক্ষের মায়াফল পাড়বার চেষ্টা করছি।' কবি আরও লিখেছেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি নিজের রচনা ও নিজের মন সম্বন্ধে সমালোচনা করা ভারি কঠিন। আমার চরিত্রের কোনখানে সেই কেন্দ্রস্থল আছে যেখানে গিয়ে আমার সমস্তটা একটি মানে পাওয়া যায়। কড়ি ও কোমলের সমালোচনায় আশু যখন বলেছিলেন জীবনের প্রতি দৃঢ় আশক্তিই আমার কবিত্বের মূল মন্ত্র, তখন হঠাৎ একবার মনে হয়েছিল হতেও পারে তাতে করে পরিস্ফুট হয় বটে। কিন্তু এখন আর মনে হয় না এখন এক এক বার মনে হয় আমার মধ্যে বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে।' অর্থাৎ যিনি কবির মানসেই ছিলেন সেই প্রথম ফুটো যৌবনের অচেনা নারীকে (ক্ষণিক মিলন) সৃষ্টি করলেন অসম্পূর্ণ মানসী রূপে। এই অসম্পূর্ণ মানসীকে ঘিরেই কবির অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত—

দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে,
বুঝাতে না রে আপনায়।
দুজনে একা একা ঝাপটি মরে পাখা
কাতরে কহে—কাছে আয়!' (নর-নারী)।

কবি এই অচেনা, অপরিচিত, শান্ত ও আবেগহীন নারীকে বুঝতে পারতেন না বলেই নিজের মনের সঙ্গে আপোষে বোঝাপড়া করে কল্পনার কল্পবৃক্ষের মায়াফল পাড়বার চেষ্টা করেছেন।

কড়ি ও কোমলের কবিতাগুলিতে কবি নিজের প্রবল আশক্তির কথাই কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু মানসীতে কবির মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব (অন্তর্দ্বন্দ্ব-সংশয়ের আবেগ) চল্‌ছে। একদিকে রয়েছে কবির ভালোবাসা সম্বন্ধে সংশয়—

ভালোবাস কি না বাস বুঝিতে পারি নে,
তাই কাছে থাকি।

আবার অন্য দিকে নিজেকে কামনা বাসনা থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা—

সৌন্দর্য সম্পদ-মাঝে বসি
কে জানিত কাঁদিছে বাসনা।
'ভিক্ষা ভিক্ষা সব ঠাঁই তবে আর কোথা যাই
ভিখারিণী হল যদি কমল-আসনা।

কবির এই বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব (অন্তর্দ্বন্দ্ব) মানসীর কবিতার মধ্যে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কবি নিজেও সেই কথা প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছেন। অর্থাৎ মানসীতে কবির নিজের মনই নিজের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠল। কবির এই মনের পরিবর্তন 'পুরুষের উক্তিতে'ই ভালভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কবিতার প্রথমাংশে আছে 'কড়ি ও কোমলে'র বর্ণ গন্ধ গানময় বসন্ত ও কবির রহস্যময় যৌবনের প্রথম রসোচ্ছ্বাসের কাহিনী।

অজানিত সকলি নূতন,
অবশ চরণ টলমল!
কোথা পথ কোথা নাই, কোথা যেতে কোথা যাই,
কোথা হতে উঠে হাসি কোথা অশ্রুজল!

আর শেষাংশে আছে অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী।

কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে,

রহিলে না ধ্যান-ধারণায়।
সেই মায়া-উপবন কোথা হল অদর্শন,
কেন হায় ঝাঁপ দিতে শুকালো পাথার।
স্বপ্নরাজ্য ছিল ও হৃদয—
প্রবেশিযা দেখিনু সেখানে
এই দিবা এই নিশা এই ক্ষুধা এই তৃষা,
প্রাণপাখি কাঁদে এই বাসনার টানে।

কবির এই মনোভাবের জন্যই (অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য) এই নারীর অভিমান ছিল প্রবল।

কেন হেরি অশ্রুজল হৃদয়ের হলাহল
রূপ কেন রাহুগ্রস্ত মানে অভিমানে।

কবি-মনের ভালোবাসা সম্বন্ধে এই-দ্বিধা-দ্বন্দ্বের চিত্রই মানসীর কবিতাগুলিতে ধৃত। কবি প্রেমকে মিথ্যা রূপের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারলেন না, তাই 'নিষ্ফল প্রযাসে' সেই কথাই ব্যক্ত করলেন—

রূপ নাহি ধরা দেয বৃথা সে প্রযাস।'

আবার 'হৃদযের ধন'কে দেহের মধ্যেও খুঁজে পেলেন না।

নাই, নাই, কিছু নাই শুধু অন্বেষণ—
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিযা।
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলাযন,
দেহ শুধু হাতে আসে— শ্রান্ত করে হিযা।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেহে,
হৃদযের ধন কভু ধরা যায দেহে?

কবি প্রেমের স্বরূপকে নানাভাবে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু হৃদয়ের এই পরম ধনকে তিনি কোথাও খুঁজে পেলেন না। কবি শৈশবে প্রেমকে প্রকৃতির মধ্যে, মানবীর মধ্যে খুঁজে বেড়িযেছেন, যৌবনে প্রেমকে রূপের মধ্যে ও দেহের মধ্যে খুঁজে বেড়ালেন। অবশেষে প্রেমের স্বরূপকে রূপ ও দেহের মধ্যে খুঁজে না পেয়ে ধ্যানের মাধ্যমে উপলব্ধি করবার চেষ্টা এই কাব্যাংশে স্পষ্ট—

সন্ধ্যায় একেলা বসি বিজন ভবনে
অনুপম জ্যোতির্ময়ী মাধুরীমূরতি
স্থাপনা করিব যত্নে হৃদয়-আসনে। (নিভৃত আশ্রম)।

এই দুই বিপরীত ভাবের মধ্য দিয়ে 'ধ্যান' কবিতার জন্ম, যা' পরবর্তীকালে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ধ্যানের মাধ্যমে মহীয়সী নারী 'ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া' অধরার জন্ম দেয়। আর কবি তাকে উৎসর্গ করে দেন বিশ্বের কাছে –

জানি না তোমার নাম,
তোমারেই সঁপিলাম
আমার ধ্যানের ধন খানি ॥ (মহুয়া)।

মানসীতেই প্রথম 'বধূ' কবিতাটি লিখিত হয়েছে। শৈশবে কবিতাকে তিনি 'কবিতা কল্পনালতা'! অথবা 'মোহিনী কল্পনে'! বলে সম্বোধন করেছেন। আবার কবির যৌবন সমাগমের দরুণ কবিতা 'বধূ' রূপে সম্বোধিত হয়, আর কবি সন্ধ্যাসংগীতে 'গান আরম্ভ' করলেন কবিতা রূপিণী বধূকে নিয়ে। কিন্তু নব যৌবনে বধূর আগমনে এই প্রথম মানসীতে 'বধূ' শিরোনামায় গ্রাম্য বালিকা 'বধূ'র কাহিনী রচিত। তারপর সতেরো বৎসর পরে ক্ষণিকার পরবর্তীকালে খেয়াতে পুনরায় 'অতীতের দুঃখদিনের ঝড়ের' কথা লিখে 'বালিকা বধূ'র কথা ব্যক্ত করেছেন। মানসীর 'বধূ' কবিতাটিরই পবিবর্তিত রূপ 'বধূ' (আকাশ প্রদীপ) 'বালিকা বধূ', 'নব-বধূ' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে।

মানসীর শেষ পর্বে য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারীতে কবি-মনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেল। কবির ভালোবাসার ধারাটি রুদ্ধ হয়ে ভালোলাগার ধারা প্রকাশ পেল (আমার সুখ, ছিন্নপত্র ৮ সংখ্যক)। মানসী কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা 'আমার সুখ' কবিতায় কবি-মনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং সোনার তরীর পূর্বাভাসও এই কবিতাটির মধ্যে রয়েছে। মানসী কাব্যগ্রন্থের শেষ পাঁচটি কবিতা য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারীতে সমুদ্রের উপর লিখেছেন এবং ক্ষণিকার সূত্রপাতও য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারিতে ২৬, ২৭।২৮ আগষ্ট ৮৯০ সালে। ক্ষণিকার সূচনা করেই কবির ভালোবাসার ধারাটা রুদ্ধ হয়ে গেল (২২ অক্টোবর ১৮৯০)। কবি অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারিতে মানসীর উদ্দেশে স্বগতোক্তি করলেন— 'তুমি দৈবক্রমে আমার কাছে এসে পড়েছ, এসো—তুমি আমার ভালোবাসা চাও না, যাও, আপন পথে যাও—জিজ্ঞাসা করবার সময় নেই—বিলাপ করবার অবসর নেই— সুখ দুঃখ হিসাব করবার আবশ্যক নেই। যা পাব না প্রসন্নচিত্তে তার মঙ্গল কামনা করে তার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া যাক।' কবির এই সিদ্ধান্তের ৬ দিন পরে 'আমার সুখ' কবিতাটি লিখে তাঁর মনের ব্যথার কথা প্রকাশ করলেন। 'বিকেলটা কাটাবার জন্য বসে বসে একটা কবিতা লেখা গেল। এক-

এক সময়ে কবিতা লিখে মনটা বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠে। এক এক সময়ে কবিতা রচনা মনের উপরে যেন একটা বেদনার রক্ত রেখা রেখে দিয়ে যায়, এবং সেই খানটা বরাবর ব্যথা করতে থাকে' (২৮ অক্টোবর ১৮৯০ সাল ১১ কার্তিক)। এই বেদনার রক্ত রেখা দিয়ে আবেগপ্রবণ ও অধৈর্য প্রকৃতির কবি 'আমার সুখ' কবিতাটি লিখে 'যিনি দৈবক্রমে কবির কাছে এসেছিলেন', তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বপ্নরাজ্যে ভেসে গেলেন।

আমি যা পেয়েছি তাই সাথে নিয়ে ভেসে যাই
কোনো খানে সীমা নাই ও মধু মুখের—
শুধু স্বপ্ন শুধু স্মৃতি তাই নিয়ে থাকি নিতি,
আর আশা নাহি রাখি সুখের দুখের।

যৌবনে কবি ছিলেন অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ (ছিন্নপত্র ৮৯ সংখ্যক), অধৈর্য প্রকৃতির (ক্ষণিকা-পূরবী, ছিন্নপত্র ৪৫ সংখ্যক) হালকা প্রকৃতির কবি-ক্ষণিকা, শেষ সপ্তক ৪১ সংখ্যক, আত্মপরিচয় চতুর্থ পরিচ্ছেদ, আদর্শবাদী, গৃহপ্রিয় য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী ৩৮১, ৩৭৮, ৩৯৭, ৪০০ পৃষ্ঠা), পরিহাস প্রিয়, সরল ও আবেগপ্রবণ (উচ্ছৃঙ্খল—মানসী)। যৌবনে কবির আবেগপ্রবণতার জন্য যেমন অস্বাভাবিক অতিশয্যের প্রকাশ পেত (ছিন্নপত্র ১৩০ সংখ্যক, উচ্ছৃঙ্খল-মানসী, জীবনস্মৃতি ১১৯, ১২০ পৃষ্ঠা), আবার আবেগের গতি রুদ্ধ হলেই মনোকষ্ট পেতেন ও দুঃস্বপ্ন দেখতেন (ছিন্নপত্র ১২০, ১২৪ সংখ্যক, য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী ৪৩৯, ৪৪১ পৃষ্ঠা)। কবির আবেগপ্রবণতা ও অস্থির প্রকৃতির জন্য মানসিক গতিপ্রকৃতি যেমন ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়েছে তেমনি কাব্যধারা ও প্রেমের ধারা (ভালো লাগার ধারা ও ভালোবাসার ধারা) দুইই একই সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়েও এক অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে প্রবাহিত ছিন্নপত্র ৮ সংখ্যক)।

কবির বসন্ত দিন—পূর্ণ যৌবনের দিন—

সোনার তরী—১২৯৮ ফাল্গুন, চিত্রা—১৩০২ ফাল্গুন।

স্থান—শিলাইদহ ১৮৯০-৫ মাঘ, ১৮৯৬ মার্চ।

পূর্ণ যৌবনের বেগে
নিরুদ্দেশ বেদনার জোয়ার উঠেছে মনে জেগে
মানসীর মায়ামূর্তি বহি।
ছন্দের বুনানি গেঁথে অদেখার সাথে কথা কহি।

ছিন্নপত্র—৫ মাঘ ১৮৯১ সাল—১৫ ডিসেম্বর ১৮৯৫।

'বয়স যখন ছত্রিশের নিচে ছিল তখন বলা-ই আমার কাজ ছিল, বুঝিয়ে বলাব ধার ধারতুম না। কেননা তখন তেপান্তর মাঠের মাঝখানটাতে আমার ঘোড়া ছুটছে, যারা না বুঝে কিছুতেই ছাড়ে না তারা আমার ঠিকানা পায় নি' —পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি ৫৬০ পৃষ্ঠা।

শরৎ পর্যায়ের দ্বিতীয় পর্বের কাব্যগ্রন্থ

সোনার তরী (প্রকৃতি প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ)।

পূর্ণ যৌবনের দিন—(১২৯৮-১৩০২)।

এবার কবি ভালোবাসার ধারাকে সম্পূর্ণ রূপে প্রকৃতির মধ্যে নিবদ্ধ করে নিজেকে একাত্মভাবে বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে বিলীন করে দিলেন (ছিন্নপত্র ১৮৯১-৯৫, আত্মপরিচয় ১০৮, ১৭৭ ১৭৮ পৃষ্ঠা)। এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে স্বপ্নের মতো বিচরণ করে রূপকথার জগতে প্রবেশ করলেন (ছিন্নপত্র ৩৫, ১৯, ১৮০ সংখ্যক)। রাজার ছেলে, রাজার মেয়ে, বিম্ববতী, মানস সুন্দরী, নিদ্রিতা, সুপ্তোত্থিতা নিরুদ্দেশ যাত্রা প্রভৃতি কবিতায় তাঁর স্বপ্নময় মনের (রূপকথা) আভাস পাওয়া যায়। কড়ি ও কোমলের 'নিদ্রিতার চিত্রটিকেই' তিনি দুটি অংশে বিভক্ত করে ভাব এবং রূপ দিয়ে অপরূপ করে গড়ে তুললেন 'নিদ্রিতা' এবং সুপ্তোত্থিতা'কে। এবং এই স্বপ্ন কল্পনা ও বাস্তবের সংমিশ্রণে রচনা করলেন তাঁর মানস সুন্দরীকে' যা' তিনি বাস্তব জীবনকেই কল্পনা দিয়ে রসের তুলিতে এঁকেছেন। বাস্তবের প্রেয়সী নারীকে (যাঁকে পরবর্তীকালে পূরবীতে 'লীলাসঙ্গিনী' রূপে সম্বোধন করেছিলেন) প্রেয়সী কবিতা রূপে নানা আভরণ দিয়ে সাজিয়ে রসের তুলিতে স্বপ্ন এবং কল্পনা দিয়ে 'মানস সুন্দরী' রূপে সৃষ্টি করলেন। তাই পরবর্তীকালে কবির 'লীলালোকের' লীলাসঙ্গিনী'কে উদ্দেশ করে লিখেছিলেন—

আবার সাজাতে হবে আভরণে
মানসপ্রতিমাগুলি ?
কল্পনাপটে নেশার বরণে
বুলাব রসের তুলি ?
(লীলাসঙ্গিনী-পূরবী)।

কবি কল্পনার এই শ্রেষ্ঠ কাব্যের ফসল 'মানস সুন্দরী'কে স্বপ্নময় (সোনার)

কাব্যতরণীতে (তরী) উত্তীর্ণ করান তিনি। (শিলাইদহ বোট, ৪ পৌষ ১২৯৯)। আবার বহু বছর পরে 'সানাই' এর মানসী'তে শিলাইদহে পদ্মার বোটে লেখা অতীতের 'মানস সুন্দরী'কে স্মরণ করে তাঁর আহ্বান বেজে ওঠে,—

সুদূর দুর্গম
কোন পথে যায় শোনা
অগোচর চরণের স্বপ্নে আনাগোনা।
প্রলাপ বিছায়ে দিনু আগন্তুক অচেনার লাগি,
আহ্বান পাঠানু শূন্যে তারি পদপরশন মাগি।

'সোনার তরী'তে এই স্বপ্ন ও কল্পনা জগতের মধ্যে বাস্তবের ছবিও রয়েছে—'যেতে নাহি দিব', 'লজ্জা', 'নদীপথে', 'দুর্বোধ', 'বৈষ্ণব কবিতা', 'দুই পাখি' (নর নারী) কবিতাগুলিতে। 'দুই পাখি' কবিতায় কবি তাঁদের দুই বিপরীত চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। আবার 'আকাশের চাঁদ' কবিতায় কবি, বর্তমানের গীতি-গন্ধময় মধুর জীবন—যেখানে ছোট ছোট ফুল, ছোট হাসি ছোট সুখ ও ভালোবাসা, মানব জীবনকে ঘিরে ফুটে উঠেছে ও স্নেহ সুধা নিয়ে গৃহের লক্ষ্মী গৃহকে মধুর করেছে, সেই মধুময় জীবনকে পরিত্যাগ করে বহু দূরে ছায়াপুরীসম অতীত জীবনকে, এবং যাঁদের প্রতি কখনও চোখ তুলে তাকান নি তাঁদেরকেই উজ্জ্বলভাবে এঁকে, কবি সেই অতীতেই ফিরে যেতে চাইছেন। অর্থাৎ বর্তমানের সুন্দর জীবনকে পরিত্যাগ করে ছায়াসম অতীত স্মৃতিকে ধরে রেখেছেন শুধু।

ছিন্নপত্র (১৮৯১-৯৫ শিলাইদহ)।

এই সময় নিজের সঙ্গে বিশ্ব প্রকৃতির যে অবিচ্ছিন্ন যোগ এবং একাত্মতা কবিকে একাত্মভাবে আকর্ষণ করেছিল, ছিন্নপত্রের পাতায় পাতায় তার বর্ণনা পাওয়া যায়। সেই সময় তিনি প্রকৃতির রূপে এতই মুগ্ধ ছিলেন যে মানুষের সঙ্গ পর্যন্ত পরিহার করে চলতেন (ছিন্নপত্র ২০৫, ১১২, ১৫৬, ১৭০ সংখ্যক)। প্রকৃতির স্পর্শ এবং রূপ তাঁর অন্তর বীণাকে নব নব সুর সংগীতে ঝংকৃত করে তুলেছিল এবং তিনি নিজেকে প্রকৃতির মধ্যে বিলীন করে তাঁর অন্তরাত্মাকে চারিদিকে ব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন।—'পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দু'-লোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি।' কবি ছিন্নপত্রে লিখেছেন—'এক সময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলেম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূর-বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ উত্থিত হতে

থাকত আমি কত দূর দূরান্তর দেশদেশান্তরের জলস্থল ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতেম, তখন শরৎসূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, যে-একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎ-ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে।' 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র প্রায় সব কবিতাই শিলাইদহে লেখা হয় তাই 'সোনার তরী', 'বসুন্ধরা','নদীপথে' প্রভৃতি কবিতায় শিলাইদহের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা দেখা যায়। এবং এই প্রথম নিজের সংসারের বাইরে এসে নূতনত্ব ও বৈচিত্র্যের মধ্যে মানুষের সুখ দুঃখের বিচিত্র জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হলেন কবি। সেই বৈচিত্র্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ছোট গল্পের বিচিত্র ধারায় (গল্প গুচ্ছ)। আবার বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিজের একাত্মতা তাঁকে এমনই একাত্মভাবে আকর্ষণ করেছিল যে শিলাইদহের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁর দৈনন্দিন জীবনের চিন্তা ভাবনার বিস্তারিত ছবি ইত্যাদি সবই ইন্দিরা দেবীকে চিঠিতে লিখে জানাতে থাকেন।

কবির বসন্ত দিন

প্রেরণাদাত্রী—'এসো আমার বসন্ত দিন
লয়ে তোমার পুষ্প পক্ষী।'

কবির বসন্ত-দিনের লেখা ***'ছিন্নপত্রে'*** কবির একান্ত স্নেহভাজন নারী ইন্দিরা দেবীকে ৭ অক্টোবর ১৮৯৪ সালে লিখেছেন—'তোকে আমি যে সব চিঠি লিখছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোন লেখায় হয়নি। আমার প্রকাশিত লেখা আমি যাদের দিই, ইচ্ছা করলেও আমি তাদের এ-সমস্ত দিতে পারি নে। সে আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই। তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, তুই আমার কোনো কথা বুঝবি নে, কিম্বা ভুল বুঝবি, কিংবা বিশ্বাস করবি নে, কিম্বা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগুলোকে তুই কেবলমাত্র সুরচিত কাব্য কথা-বলে মনে করবি। সেই জন্যে আমি যেমনটি মনে ভাবি ঠিক সেই রকমটি অনায়াসে বলে যেতে পারি।' তাই কবির বসন্ত-দিনের মধ্যে যিনি পুষ্প পক্ষী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন সেই একান্ত স্নেহভাজন নারীকে 'অনবসর' কবিতায় আহ্বান করলেন—

এসো আমার বসন্ত-দিন
লয়ে তোমার পুষ্পপক্ষী

প্রকৃতি প্রেমের বিচিত্র মনোভাব ও দৈনন্দিন জীবনের চিন্তা ভাবনাগুলি ছিন্নপত্রে প্রকাশিত। আর সে তো এই স্নেহ ভাজন নারীর উদ্দেশেই।

কবি কড়ি ও কোমলের 'মঙ্গল গীতে' একান্ত স্নেহ ভাজন নারী 'মা লক্ষ্মী'র উদ্দেশে লিখেছেন—

মা, আমার এই জেনো হৃদয়ের সাধ
তুমি হও লক্ষ্মীর প্রতিমা
মানবেরে জ্যোতি দাও, করো আশীর্বাদ,
অকলঙ্ক মূর্তি মধুরিমা।

একান্ত স্নেহের পুত্তলি ও সংগীতের প্রেরণাদাত্রী নারীকেই তাই তিনি দিয়ে যান তাঁর সংগীত-সম্ভার সংরক্ষণের এক গুরু দায়িত্ব। ইন্দিরা দেবী যাঁকে জগতের মাঝে মঙ্গলদাত্রী হতে বলেছেন কবি, তিনি আজীবন যত্নে কবির তুলে দেওয়া দায়িত্বভার বহন করে চলেন। কবি তাঁর কবিতায় বলেন—

এ গান যেন রে হয় তোর ধ্রুবতারা
অন্ধকারে অনিমেষে নিশি করে সারা।
তোমার মুখের 'পরে
জেগে থাকে স্নেহভরে
অকূলে নয়ন মেলি দেখায় কিনারা।

কবির অন্তরপ্রকৃতির প্রথম বহির্মুখ উচ্ছ্বাস 'প্রভাত সংগীত' কাব্যগ্রন্থখানি শিশু ইন্দিরা দেবীকে প্রথম উপহার দিয়ে কবি শিশুকালের বিশ্বকে পুনরায় ফিরে পেলেন। এবং প্রকৃতির সঙ্গে সহজ মিলন (কবি কাহিনী), বিচ্ছেদ (সন্ধ্যাসংগীত), ও পুনর্মিলন হল প্রভাত সংগীতে। প্রভাত সংগীত কাব্যগ্রন্থখানি 'সমাপন' করলেন শিশু ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশেই এবং ছিন্ন পত্রাবলী তাঁরই উদ্দেশে রচিত। ১৮৯১-৫ মাঘ-১৮৯৫-১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিয়মিত ভাবে লিখিত হয়েছে।

চিত্রা কাব্যগ্রন্থে কবির আদর্শ ও বাস্তবের সংঘাতের দরুণ যখন 'দুঃসময়' আরম্ভ হল সেই দুঃসময়ে (চিত্রা, কল্পনা তাঁর গানের ও ব্যাঘাত ঘটল দুঃসময়- ১৩০১, ব্যাঘাত ১৩০১) এবং সেই সঙ্গে বাস্তবের কঠিন আঘাতে কবির গানের আসরও ভেঙ্গে গেল (গীতহীন ১৩০২ চৈত্র, দুরাকাঙ্ক্ষা ৪ ফাল্গুন ১৩০২)। তাই ক্ষণিকার পরবর্তীকালে দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই কবি গান সংরক্ষণের দায়িত্ব অর্পন করেন।

চিত্রা (যুগ্মসত্তার দ্বন্দ্ব ১৩০০ মাঘ-২০ ফাল্গুন ১৩০২)। কুষ্টিয়ার ব্যবসা। ***বসন্তের সমাপ্তি-৭ ফাল্গুন*** ১৩০২।

রূপনারাণের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।

চিত্রায় আবার কবি-মনের গতি পরিবর্তিত যেন। কবি দীর্ঘদিন পরে এই প্রথম বাস্তবের সংস্পর্শে এলেন (ছিন্নপত্র ২৩১ সংখ্যক)। আর বাস্তবের কঠিন আঘাতে প্রকৃতির স্বর্গরাজ্য (স্বপ্নরাজ্য থেকে বিদায় নিয়ে মর্তে (সংসারে) নেমে আসেন তিনি তাঁর জীবনে এবার অশান্তির সুর। চিত্রা কাব্যে কবির দ্বৈত সত্তার দ্বন্দ্ব অর্থাৎ ভিতরের আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত। কবি চিত্রার ভূমিকায় লিখেছেন—'পরম দেবতার পূজা যুগ্মসত্তায় মিলে, এক সত্তায় ভিতর থেকে আদর্শের প্রেরণা, আর এক সত্তায় বাহিরে কর্মযোগে তার প্রকাশ। সংসারে এই দুই সত্তার বিরোধ সর্বদাই ঘটে, নিজের অন্তরে পূর্ণতার যে অনুশাসন মানুষ গূঢ়ভাবে বহন করছে তার সম্পূর্ণ প্রতিবাদে জীবন ব্যর্থ হয়েছে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। নিজের মধ্যে নিজের সামঞ্জস্য ঘটতে পারেনি, এই ভ্রষ্টতা মানুষের পক্ষে সব চেয়ে শোচনীয়। আপনার দুই সত্তার সামঞ্জস্য ঘটেছে কি না এই আশঙ্কাসূচক প্রশ্ন চিত্রার কবিতায় অনেকবার প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত চিত্রায় জীবনরঙ্গভূমিতে যে মিলন নাট্যের উল্লেখ হয়েছে তার কোনো নায়ক-নায়িকা জীবের সত্তার বাইরে নেই, এবং তার মধ্যে কেউ ভগবানের স্থানাভিষিক্ত নয়। মানুষের আত্মিক সৃষ্টি কেন, প্রাকৃতিক সৃষ্টিতেও আদিকাল থেকে মূল আদর্শের সঙ্গে বাহ্য প্রকাশের সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া গেছে।' চিত্রা ও তার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে একদিকে যেমন দুঃখ দ্বন্দ্ব নিয়ে কঠিন বাস্তবের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি অন্যদিকে কবির সুখ দুঃখ তার সমস্ত যোগ বিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গেঁথে নিয়ে অমৃতে, আনন্দে উত্তীর্ণ হবার চিত্রও পাওয়া যায়। আবার এই দুঃখ-দ্বন্দ্বের পাশেই রয়েছে বিচিত্ররূপিণী নারীর বর্ণনা—'চিত্রার প্রথম কবিতায় তার একটি সূচনায় বলা হয়েছে—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী

তার পর আছে—

অন্তর মাঝে তুমি শুধু একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

আজ ব্যাখ্যা করে যে কথা বলবার চেষ্টা করছি সেই কথাটাই এই কবিতার মধ্যে ফুটতে চেয়েছিল। বাইরে যার প্রকাশ বাস্তবে সে বহু, অন্তরে যার প্রকাশ সে একা। এই দুই ধারার প্রবাহেই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। জগতে বিচিত্ররূপিণী আর অন্তরে একাকিনী কবির কাছে এই দুইই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য।' তাই চিত্রা কাব্যে যেমন বিচিত্ররূপিণী নারীর কথা ব্যক্ত করেছেন, তেমনি আবার ধীর, স্থির, অন্তরবাসিনী যিনি কবির অন্তরে একা সেই অগৌরবা কল্যাণী নারীর কথাও তাঁর কাব্যে প্রকাশ করেছেন। তাই কবি লিখেছেন—'লোক জীবনের ব্যবহারিক বাণীকে উপেক্ষা করে আমার কাব্যে আমি কেবল আনন্দ মঙ্গল এবং ঔপনিষদিক মোহ বিস্তার করে তার বাস্তব সংসর্গের মূল্য লাঘব করেছি এমন অপবাদ কেউ কেউ আমাকে দিয়েছেন। আমার কাব্য সমগ্র ভাবে আলোচনা করে দেখলে হয়তো তাঁরা দেখবেন আমার প্রতি অবিচার করেছেন। আমার বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত আমি এই বাণীর পন্থাতেই আমার পদ্য ও গদ্য রচনাকে চালনা করেছি—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

উর্বশী, স্বর্গ হইতে বিদায়, প্রেমের অভিষেক, সান্ত্বনা, রাত্রে ও প্রভাতে প্রভৃতি কবিতায় এই বিচিত্ররূপিণী নারী এবং একাকিনী নারী এই দুই ভাবের নারীর কথাই বিধৃত করেছেন। নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের যে প্রকাশ, উর্বশী তারই প্রতীক। সে সৌন্দর্য আপনাতেই আপনার চরম লক্ষ্য, সেইজন্য কোন কর্তব্য যদি তার পথে এসে পড়ে তবে সে কর্তব্য বিপর্যস্ত হয়ে যায়। সে নিছক নারী মাতা কন্যা বা গৃহিণী সে নয়—যে নারী সাংসারিক সম্বন্ধের অতীত, মোহিনী সেই। সে যেন চির যৌবনের পাত্রে রূপের অমৃত—তার সঙ্গে কল্যাণ মিশ্রিত নেই। সে অবিমিশ্র মাধুর্য।' আবার 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় যিনি অপ্সরী রূপে বর্ণিত, তিনি উদাসীন এবং কারো প্রতি শোক বা দুঃখ অনুভব করেন না—

হে অপ্সরী,
তোমার নয়ন জ্যোতি প্রেম বেদনায়
কভু না হউক ম্লান—লইনু বিদায়।
তুমি কারে কর না প্রার্থনা, কারো তরে
নাহি শোক।

আবার যিনি দীনতম ঘরে জন্মগ্রহণ করেন সেই প্রেয়সী নারীই সংসার সমুদ্রের কর্ণধার এবং দুঃখের দিনের সান্ত্বনাদাত্রী—

ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার নদীতীরে
কোন এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটিরে
অশ্বত্থছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার
আমারি লাগিয়া সযতনে। ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩০২।

'প্রেমের অভিষেক' কবিতায় কবি সাধারণ নারীর অসাধারণ প্রেম কথা বর্ণনা করেছেন। 'উর্বশী' কবিতার বহু বছর পরে বলাকা ২৩ সংখ্যক কবিতায় কবি একই কথা লিখেছেন—'একজন সুন্দরী তিনি উর্বশী, বিশ্বের কামনা রাজ্যে আধিপত্য করেন। আর একজন লক্ষ্মী, তিনি কল্যাণী। একজন স্বর্গের অপ্সরী, অন্যটি স্বর্গের ঈশ্বরী। একজন হরণ করেন, আর একজন পূরণ করেন। এক নারী বসন্তের চঞ্চল আবেগকে বাইরের তাপে আন্দোলিত করে দেন, অন্যজন তাকে শিশির স্নাত করে অন্তরের মাধুর্যে ফলবান করে তোলেন।' কবির কবিতায় যেমন এই দুই ভিন্ন চরিত্রের নারীর কথা ব্যক্ত করেছেন, তেমনি উপন্যাসে এই দুই ধরণের নারীর চরিত্রকে রূপায়িত করেছেন 'দুই বোন' নারী চরিত্র দুটিতে এবং বহু উপন্যাসে (বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা—ক্ষিতিমোহন সেন)।

তাই 'চিত্রা' কবিতায় লিখেছেন—
কত না বর্ণে কত না স্বর্ণে গঠিত
কত যে ছন্দে কত সংগীতে রটিত
কত না গ্রন্থে কত না কণ্ঠে পঠিত
কত অসংখ্য কাহিনী। ১৮ অগ্রহায়ণ ১৩০২।

চিত্রা—অদ্ভুতা বিবিধ বর্ণ যুক্তা। দৈনিক অপ্সরা। কবির জীবনে ও কাব্যে এই বিচিত্ররূপিণী নারী ও একাকিনী নারীর পাশেই রয়েছে কবির যুগ্মসত্তার দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ বাস্তব জীবনের দুঃখ-বেদনা, স্বার্থ-দ্বেষ, ভালো-মন্দ নিয়ে যে বাস্তব সত্তা আছে, সেই বাস্তব সত্তাকে (ছোট আমি) কবি বিশ্বের সঙ্গে বিরাটের সঙ্গে বিশ্ব-মানবের সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে উর্ধে তুলে ধরে আদর্শ সত্তায় (বড়ো আমি) উপনীত হতে চেষ্টা করেছেন (আত্মপরিচয়—১৮৯ পৃষ্ঠা)। 'আমার নিজের মধ্যেই বড়ো আছে—যে দ্রষ্টা আমার নিজের মধ্যে ছোট হচ্ছে—যে ভোক্তা। ঐ দুটোকে এক করে ফেললে দৃষ্টির আনন্দ নষ্ট হয়, ভোগের আনন্দ দুষ্ট হয়' (পথে ও পথের

প্রান্তে ৮৪৫ পৃষ্ঠা))। কিংবা মানুষের দুটো রূপ, একটা বিশেষ রূপ আর একটা 'বিশ্ব-রূপ' (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ১৮৯ পৃষ্ঠা)। দুঃসময় (চিত্রা কল্পনা), ব্যাঘাত, স্বর্গ হইতে বিদায়, সান্ত্বনা (চিত্রা), যাত্রী, কাব্য, গীতহীন, স্বার্থ, মৌন, শুশ্রূষা, বিদায় (চৈতালি), হতভাগ্যের গান, ঝড়ের দিনে (কল্পনা), প্রভৃতি কবিতায় কবি-মনের দুঃখ-দ্বন্দ্বের কথা জানা যায়। কবি সাংসারিক জীবনের দুঃখ বেদনা, স্বার্থ-দ্বেষ, অশান্তি প্রভৃতিকে জয় করেছেন 'প্রেমমন্ত্র' দিয়ে (চৈতালি) এবং উদার মঙ্গলমন্ত্র দিয়ে। কবির এই বাস্তব ও আদর্শের সংঘাত যৌবনের বহু কবিতায় ধরা পড়ে। চিত্রা ও তার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে কবির দুঃসময় আরম্ভ হয়ে গেছে, তাঁর গানের আসর গেছে ভেঙে (গীতহীন—চৈতালি ১৩০২) ছিন্নবীণার তার হাতে (ব্যাঘাত—চিত্রা) ঋণগ্রস্ত, সঙ্গীহীন, আশ্রয়হীন ভাগ্যহীন কবির দিন আশঙ্কায় কাটে (দুঃসময়, হতভাগ্যের গান, ঝড়ের দিনে—কল্পনা)। এই দুঃসময়ে প্রেয়সী নারীই তো একমাত্র সহায় ও ভরসাস্থল এবং 'সংসার সমুদ্রে যেন পূর্ণিমার ইন্দু' এবং দুখের দিনের 'সান্ত্বনা' (সান্ত্বনা চিত্রা)। কবির নিজের কথায় 'আমার ঘাড়ে মস্ত একটা দেনা ছিল, সে দেনা সম্পূর্ণ স্বকৃত নয় কিন্তু দায় একেলারই। দেনার পরিমাণ লক্ষ টাকারও অধিক। অর্থের এত অভাব ছিল যে আজ জগদ্ব্যাপী দুঃসময়েও কল্পনা করা যায় না, আর সে কথা কোনো কালেও তা জানবে না কোন ইতিহাসেও তা লিখিত হবে না।' এই সব কবিতায় দুঃখ দ্বন্দ্বের ইতিহাস আছে অপরদিকে অন্তর্যামী, জীবনদেবতা, এবার ফিরাও মোরে অশেষ (কল্পনা) সাধনা প্রভৃতি বহু কবিতায় দুঃখ-দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করে বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস পরিস্ফুট। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন, 'যে শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পথে অভয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয়কে আশ্রয় করেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি এই কবিতার মধ্যে স্পষ্ট' ব্যক্ত হয়েছে। বাঁশির সুরের প্রতি ধিক্কার দিয়েই সে কবিতার আরম্ভ (আত্মপরিচয় ১৯১ পৃষ্ঠা)।

যে দিন জগতে চলে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি।'

আবার শেষাংশে আছে প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষা

হয়তো ঘুচিবে দুঃখ নিশা,
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষা।

আত্মপরিচয়ে ১০ পৃষ্ঠায় 'জীবনদেবতা'[১৮] সম্বন্ধে লিখেছেন, 'এই যে কবি, যিনি আমার ভালমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি জীবন দেবতা নাম দিয়াছি।' কবির এই আদর্শ ও বাস্তব এই দুই সত্তার চিত্র তাঁর কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়। তিনি বাস্তব সত্তাকে (দুঃখ-দ্বন্দ্ব—ছোট আমি) অতিক্রম করে আদর্শ সত্তায় (অমৃত, আনন্দে, প্রেমে—বড়ো আমি) উত্তীর্ণ হতে চান আর ক্রমে সংসারের ঘাত প্রতিঘাত ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে (ছিন্নপত্র ২০১ নং), দুঃখ দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে অখণ্ড সত্যে এসে পৌঁছান। এবং এই সত্যই কবিকে দ্বন্দ্বের তুফান পার করিয়ে দিয়ে আনন্দে অমৃতে প্রেমে উত্তীর্ণ করিয়ে দিল (আত্মপরিচয় ২০৪ পৃষ্ঠা)। এই প্রেমের আলোতে কবির শেষ যৌবনের অকাল বসন্তে. কবিকল্পনার অর্ধ মানবী ও অর্ধ কল্পনার 'অসম্পূর্ণ মানসী' বহু দ্বিধা দ্বন্দ্ব উদাসীনতা ও সাংসারিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে পূজারিণী বেশে ক্ষণিকাতে পরিপূর্ণ মানবী রূপে সম্পূর্ণ হল। কবি-মানসীর এবার পূজারিণী বেশ (আবির্ভাব—ক্ষণিকা)। 'রাজা'[১৯] নাটকটি কবির এই সংশয়িত প্রেমের ও সাংসারিক জীবনেরই দুঃখ দ্বন্দ্বের (আগুন লাগা) রূপক কাহিনী। অস্থির কবি এবার প্রেমের আলোতে স্থির হয়ে গেলেন। কবির পরিপূর্ণ প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধির পরেই তাঁর আধ্যাত্মিক সত্তার বিকাশ হল। এই আধ্যাত্মিক সত্তার প্রথম প্রকাশ তাঁর নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে (১৩০৮ আষাঢ়)। এরপর থেকেই কবির জীবনধারা ও কাব্যধারা দুইই পরিবর্তিত হয়ে গেল। তাই কবি নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে ছবি এঁকে এই পরিবর্তনের সংকেত দিলেন। কবি সাংসারিক দুর্যোগের মধ্যে [দুঃসময় (ঋণগ্রস্ত কবি)] কল্পনা অভয় মন্ত্রকে সম্বল করে, উন্নত শিরে প্রেমকে মানব কল্যাণের পথে চালিত করে কর্ম-যজ্ঞের সূচনা করলেন এবং গৌরবময় অতীত ভারতবর্ষের রূপকে বাস্তবে রূপায়িত করে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে গেলেন (১৩০৭—১৩০৮ বঙ্গাব্দ)। তাই কবি নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে পাখির[২০] ভয়শূন্য চিত্তের উন্নত শিরের ছবিটি এঁকেছেন। [পরবর্তী-কালে এই সময়কার কথা (১৩০৮—১৩২১) বিশ্লেষণ করেছেন বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা ৫৮, ১০২, ১০৩ পৃষ্ঠায়]।

এবার কবির কাব্য লক্ষ্মী পূজারিণী বেশে দেখা দেওয়াতে ক্ষণিকার পরবর্তী-কালের রচনা নৈবেদ্য, উৎসর্গ, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে কবি পূজার অর্ঘ্যই রচনা করলেন। এই কাব্যগ্রন্থের নামগুলির মধ্যেও বিশেষ তাৎপর্য আছে, বিশেষভাবে উৎসর্গপত্র বিহীন গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি

কাব্যগ্রন্থগুলি। কবির প্রথম যুগের কবিতা শৈশব সংগীত, সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাত সংগীত, ছবি ও গান কাব্যগ্রন্থের নামগুলির মধ্যে ভাবটাই প্রধান গীতটা অপ্রধান (গৌণ), যেমন শৈশবের গান, সন্ধ্যার সংগীত, প্রভাতের গান, বাইরে ছবি পড়ে অন্তরে গান হয়ে দেখা দেয়, কিন্তু ক্ষণিকার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি কাব্যগ্রন্থের গীতটাই প্রধান ভাবটা অপ্রধান (গৌণ), এই গ্রন্থগুলিতে গানই উৎসর্গ (অঞ্জলি দিলেন) করলেন কবিতার মাধ্যমে।

চিত্রা কাব্যগ্রন্থের শেষ পর্বে ***বসন্তের সমাপ্তি (৭ ফাল্গুন ১৩০২)।*** কবি 'প্রৌঢ়' কবিতায় বসন্তের দিনগুলির কথা ও বসন্ত অবসানের কথা প্রকাশ করেছেন। কবি যৌবনের (বসন্তের) দিনগুলির কথা প্রকাশ করে লিখেছেন—

যৌবন নদীর স্রোতে তীব্র বেগভরে
একদিন ছুটেছিনু, বসন্ত পবন
উঠেছিল উচ্ছ্বসিয়া, তীর উপবন
ছেয়েছিল ফুল্ল ফুলে, তরু শাখা' পরে
গেয়েছিল পিককুল—আমি ভালো করে
দেখি নাই শুনি নাই কিছু—অনুক্ষণ
দুলেছিনু আলোড়িত তরঙ্গ শিখরে
মত্ত সন্তরণে।

কবির বসন্ত অবসান—(৭ ফাল্গুন ১৩০২)।

আজি দিবা অবসানে
সমাপ্ত করিয়া খেলা উঠিয়াছি তীরে,
বসিয়াছি আপনার নিভৃত কুটিরে,
বিচিত্র কল্লোলগীত পশিতেছে কানে,
কত গন্ধ আসিতেছে সায়াহ্ন সমীরে—
বিস্মিত নয়ন মেলি হেরি শূন্য পানে
গগনে অনন্ত লোক জাগে ধীরে ধীরে।

চিঠিপত্র ৮ম খণ্ডে প্রিয়নাথ সেন চিত্রা কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে দুটি অসাধারণ হেঁয়ালিপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন—'মাঝে মাঝে চিত্রা পড়িতেছি এখনও কিন্তু তোমার...............কে খুঁজিয়া পাইতেছি না।' আবার অন্যত্র লিখেছেন 'চিত্রা' এবং A digit of the moon ভুলিও না' অর্থাৎ মানসীতে

যিনি মানসেই ছিলেন চিত্রায় তিনি A digit of the moon হয়ে দেখা দিয়ে ক্ষণিকাতে পূর্ণচন্দ্রতে পরিণত হল। কবির বসন্তের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর জীবনের গতি স্থিরতার দিকে এগিয়ে চলল—'যেন অনেকদিনের দেখা একটা রৌদ্র রঞ্জিত মাঠ, শীতল স্নিগ্ধ বাতাস, পুষ্করিণীর ধার দিয়ে বাঁকা গ্রামের পথ, ঘটকক্ষ অবগুণ্ঠিত বধূ এবং সেই সঙ্গে ঐ সর্ষেক্ষেতের মৃদু সুগন্ধে অনুপ্রবিষ্ট একটি উদার নির্মল আকাশ মনে পড়ে—যেন কোন এক সময়ের পরিতৃপ্ত প্রেম এবং পরিপূর্ণ শান্তির সুগভীর সুখস্মৃতি ঐ সর্ষে ফুলের গন্ধের সঙ্গে জড়িত আছে' (১১ ডিসেম্বর ১৮৯৫ ছিন্নপত্র)।

শরৎ পর্যায়ের শেষ পর্ব

অকাল বসন্তের সূচনা—চৈতালি (১৩০৩ চৈত্র), কল্পনা (১৩০৬)।

অকাল বসন্ত অথবা শেষ যৌবনের শেষ বসন্ত—ক্ষণিকা (১৩০৭)।

চৈতালি কাব্যগ্রন্থ

চৈতালিতে শেষ সাতাশের আরম্ভে (৩৬-৬৩ বৎসর) ও ***অকাল-বসন্তের সূচনায়*** প্রেমের স্থির পদক্ষেপে কবি জীবন দেবতার (পরাণ বল্লভ উদ্দেশ্যে প্রথম অর্ঘ্য নিবেদন করলেন—

তুমি যদি বক্ষোমাঝে থাক নিরবধি
তোমার আনন্দমূর্তি নিত্য হেরে যদি
এ মুগ্ধ নয়ন মোর,—পরাণ-বল্লভ,
তোমার কোমল কান্ত চরণ পল্লব
চিরস্পর্শ রেখে দেয় জীবন তরীতে
কোন ভয় নাহি করি বাঁচিতে মরিতে।

চৈতালি—চৈত্রমাসে উৎপন্ন শস্য। চৈত্রমাস—বসন্তকাল। কবির বসন্তের ফসল যৌবন ও প্রেম (প্রেম, শেষ কথা) দুইই 'উৎসর্গ' করলেন চৈতালিতে—

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।
পরিপূর্ণ বেদনার ভরে

মুহূর্তেই বুঝি ফেটে পড়ে
বসন্তের দুরন্ত বাতাসে
নুয়ে বুঝি নমিবে ভূতল—
রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে
থরে থরে ফলিযাছে ফল।

বলাকা-কাব্য পরিক্রমাতে (৮৮ পৃষ্ঠা।) কবি একই কথা প্রকাশ করেছেন, 'পৌষ মাসেও মাঝে মাঝে বসন্তের হাওয়া এসে নাড়া দিয়ে যায়। এই রকম একটা ভাব চৈতালির যুগে আমার মনে বার বার আঘাত করেছে।' তাই চৈতালির যুগে অকাল বসন্তের সূচনায় কবির হৃদয়ে যেন ভাব যজ্ঞ সুরু হয়ে গেল।

এখনি বেদনাভরে ফাটি গিয়া প্রাণ
উচ্ছ্বসি উঠিবে যেন সেই মহাগান।
অবশেষে বুক ফেটে শুধু বলে আসি—
হে চির সুন্দর, আমি তোরে ভালোবাসি।
(৩০ চৈত্র ১৩০২)।

কবির বসন্তের সুখ-দুঃখের গোলাজাত ফসল—প্রেম, প্রিয়া, মানসী, শেষ কথা, ক্ষণমিলন, সমাপ্তি, অসময়, স্মৃতি, নারী, যাত্রী, শান্তিমন্ত্র, কাব্য, ধ্যান, স্বার্থ প্রভৃতি ছোট ছোট কবিতায় বিশ্লেষণ করেছেন। এই ছোট ছোট কবিতাগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কবির বহু কবিতার মর্মার্থ এবং কবি-জীবনের গূঢ় রহস্য এই কবিতাগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। 'শেষ কথা' ও 'ক্ষণ মিলন' কবিতা দুটির আরম্ভ কড়ি ও কোমল কাব্যগ্রন্থে, এবং ক্ষণিকা শব্দের উৎপত্তি 'ক্ষণিক মিলন' অথবা 'ক্ষণ মিলন' থেকে। যার বিশ্লেষণ রয়েছে ছিন্নপত্র ১৩০ নং এ।

কল্পনা (১৩০৬)

কবির 'দুঃসময়'—

ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।
(১৫ বৈশাখ ১৩০৪)।

ঋণগ্রস্ত কবি (চিঠিপত্র ৮ম খণ্ড)

হে অলক্ষ্মী, রুক্ষকেশী
তুমি দেবী অচঞ্চলা।

তোমার রীতি সরল অতি,
নাহি জান ছলাকলা।
(৭ আশ্বিন ১৩০৪)।

অত্যন্ত 'দুঃসময়ে' 'অসময়ে' 'হতভাগ্যের গানে'র মধ্য দিয়ে 'ঝড়ের দিনে' 'স্বপ্নে'র মতো কবির জীবনে অতীতের নব বসন্তের (শরৎকাল) আগমন—

এ দুর্দিনে কী কারণে পড়িল তোমার মনে
বসন্তের বিস্মৃত কাহিনী ?

কবি বসন্তের বিস্মৃত কাহিনীর কথা প্রকাশ করেছেন 'বসন্ত' কবিতায়—

আমার বসন্তরাতে চারি চক্ষে জেগে উঠেছিল
সে কয়টা কথা,
তোমার কুসুমগুলি হে বসন্ত, সে গুপ্ত সংবাদ
নিয়ে গেল কোথা ?

যদিও কবি 'স্বপ্নে' অতীতের নব বসন্তের শরৎ কালের মধ্যে ফিরে গিয়েছিলেন, কিন্তু আতিশয্যের দরুণ 'শেষ কথা' বলবার পরম লগ্নটি 'ভ্রষ্ট লগ্নে' পরিণত হল (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ)।

শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
নবীন পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।'

তাই পরবর্তীকালে পূরবীর 'ক্ষণিকা'য় কবির আক্ষেপোক্তি—

হে আত্মবিস্মৃত, যদি দ্রুত তুমি না যেতে চমকি,
বারেক ফিরায়ে মুখ পথমাঝে দাঁড়াতে থমকি,
তা হলে পড়িত ধরা রোমাঞ্চিত নিঃশব্দ নিশায়
দুজনের জীবনের ছিল যা চরম অভিপ্রায়।

ক্ষণিকা (১৩০৭-অকাল বসন্ত—প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ)।

'অকালবসন্তে জেগেছিল ভোরের কোকিল'—পত্রপুট বারো। শেষ যৌবনের শেষ বসন্ত বা অকালবসন্তের 'ঘন বরষার' মধ্যে ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থখানি লিখিত ও প্রকাশিত হয়। কবি চৈতালিতে 'প্রেম' সম্বন্ধে কবিতায় লিখছেন—

দৈবযোগে ঝলি উঠে বিদ্যুতের আলো,
যারেই দেখিতে পাই তারে বাসি ভালো,
তাহারে ডাকিয়া বলি—ধন্য এ জীবন,
তোমারি লাগিয়া মোর এতেক ভ্রমণ।

কবি 'ভৎর্সনা' কবিতাটিতে অভিমানী নারীর উক্তি দিয়েই কবির ভালোবাসার কথা এই প্রথম প্রকাশ করলেন—

কাহার লাগি একলা ছিলে বসে
মুক্ত কেশে আপন বাতায়নে!
তড়িৎ শিখা ক্ষণিক দীপ্তালোকে
হানতেছিল চমক তোমার চোখে,
জানত কে বা দেখতে পাবে তুমি
আছি আমি কোথায় যে কোন্ **কোণে!**

কবি পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতেও (২৬১ পৃষ্ঠা) লিখেছেন—'তারা দেখা দিয়েছে—কেউ বা **ঘরের কোণে।'**

ক্ষণিকাতেই কবির প্রেমের ধারা প্রবল হয়ে দেখা দিল।

উৎপত্তি—

ক্ষণিকা শব্দের উৎপত্তি ক্ষণিক বা ক্ষণ থেকে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই ক্ষণিক বা নিমেষগুলি অত্যন্ত দুর্মূল্য। কবি দুর্লভ মুহূর্ত গুলি আপন স্মৃতিপটে ধরে রেখে কালের বৃহৎ পটভূমিকার সঙ্গে তুলনা করে কবিতায় কিংবা রচনায় বহুবার প্রকাশ করেছেন। যেমন মুহূর্তের হাসি, নিমেষের দৃষ্টি, ক্ষণকালের মিলন, সমুদ্রের উপর সূর্যাস্তের দৃশ্য, গঙ্গাবক্ষে গান, মহানিমের ঝিল্লিঝংকৃত স্তব্ধ রাত, গ্রামের পথে সর্ষেফুলের গন্ধের সঙ্গে প্রেম ও শান্তির সুখ স্মৃতি, প্রথম যৌবনের ঘন্টার শব্দ ইত্যাদি। 'উচ্ছৃঙ্খল' (মানসী) কবিতায়ও কবি লিখেছেন—'আমার কেবল একটি নিমেষ। তারি তরে ধেয়ে আসি।' কবি কড়ি ও কোমল এবং চৈতালিতে 'ক্ষণিক মিলন' ও ক্ষণ মিলনের' কথা কবিতায় লিখে ছিন্নপত্র ১৩০ সংখ্যকে দুর্মূল্য নিমেষের তিলেক মিলনের কথা বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন—'এক এক সময় মনে হয়, এই-যে আমরা গুটিকতক সচেতন প্রাণী জড়মহাসমুদ্রের মধ্যে মাথা তুলে বুদ্বুদের মতো ভেসে উঠেছি এব কাছাকাছি এসে ঠেকেছি এ একটা আকস্মিক সংযোগ—এই সংযোগটুকুর মধ্যে যত বিস্ময় যত প্রেম যত আনন্দ তা আবার অনন্তকালের মধ্যে গড়ে উঠবে কি না সন্দেহ। বসন্ত রায়ের কবিতায় এক জায়গায় একটা লাইন আছে—নিমেখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি। বাস্তবিক মানুষের এক নিমেষের মধ্যে শত যুগের সংযোগ বিয়োগ ঘটতে পারে। সেই জন্যে নিমেষগুলোকে দুর্মূল্য বলে বোধ হয়।' কবি দুর্লভ মুহূর্তের

আকস্মিক সংযোগের কথা বহু কবিতায় উল্লেখ করেছেন যেমন 'ক্ষণিক মিলন', 'ক্ষণ মিলন', 'হঠাৎ মিলন' কবিতায়। এই দুর্মূল্য নিমেষের দুর্লভ মুহূর্তে যে অচেনা নারীর সঙ্গে কবির ক্ষণকালের জন্য আকস্মিক (ক্ষণিক, দৈব) সংযোগ (মিলন) হয়েছিল তিনিই ক্ষণিকা—

অসীম কালের মাঝে তিলেক মিলনে
পরশে জীবন তার আমার জীবনে।
যতটুকু লেশমাত্র চিনি দুজনায়,
তাহার অনন্তগুণ চিনি নাকো হায়।

অথবা—

দুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ গন্ধ গীত করিছে রচনা
হে রমণী, ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য-আভাসে (স্মরণ ২২)।

কবি এই ক্ষণিকারই গান গাইলেন ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থখানিতে। আর চিঠিপত্র ৮ম খণ্ডে, 'প্রিয়ার একটি নিমেষের দৃষ্টি'কে অক্ষয় সংগীতে গেঁথে প্রিয় বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে উপহার দিলেন—

এ বসন্তে প্রিয়া তব পূর্ণিমা-নিশীথে
নব মল্লিকার মালা জড়াইয়া কেশে
তোমার আকাঙ্ক্ষাদীপ্ত অতৃপ্ত আঁখিতে
যে দৃষ্টি হানিয়াছিল একটি নিমেষে
সে কি রাখ নাই গেঁথে অক্ষয় সংগীতে।
সে কি গেছে পুষ্পচ্যুত সৌরভের দেশে।

আবার 'ক্ষণেক দেখা'তে কৌতুক করে লিখলেন—

একটুখানি ফিরে কেন
দেখলে ঘোমটা ফাঁকে ?

সূচনা—

ক্ষণিকার সূচনা য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারিতে, ২৬।২৭।২৮ আগষ্ট ১৮৯০ সালে এবং সমাপ্তি ১৯০০ সালে শিলাইদহে। কবি সুহৃদ লোকেন পালিতই কবির একটি মাত্র বন্ধু যিনি ক্ষণিকাকে সূচনায় দেখেছিলেন।

ক্ষণিকারে দেখেছিলে
ক্ষণিক বেশে কাঁচা খাতায়,
সাজিয়ে তারে এনে দিলেম
ছাপা বইয়ের বাঁধা পাতায়।

কবি যখন ত্রিশ বৎসর বয়সে বিলাত যাত্রা করেন তখন লোকেন পালিত কবির সঙ্গী ছিলেন। সেই সময় গৃহপ্রিয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ধূমপায়ী যুবক লোকেন পালিতের সিগেরেটের ধূম্রজালের মধ্যে।২৬।২৭।২৮ আগষ্ট রাত দুটো পর্যন্ত) যে রসালাপ হয় সেই স্মৃতিগুলি এবং পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতাগুলি সাজিয়ে বন্ধু লোকেন পালিতকেই ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থটি (বাঁধা পাতা) এবং স্মরণোপহার স্বরূপ য়ুরোপ যাত্রীব ডায়ারীখানি (কাঁচা খাতা) উপহার দিলেন। ক্ষণিকার সূচনা এবং কবির 'প্রথম চিঠি'টিও ঐ একই সমযেব লেখা, তাই ২৮ আগষ্ট ১৮৯০ সালটি রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি বিশিষ্ট দিন। রবীন্দ্র-জীবনীতে ক্ষণকালের ঐ দিনটি এবং ৩০ আগষ্টেব লোহিত সাগবেব সূর্যাস্তের দুর্লভ সন্ধ্যাব রংটি কবির ভালোবাসামুগ্ধ হৃদযেব মধ্যে চিবদিনের জন্য অঙ্কিত হয়ে রয়ে গেছে। অতীত যৌবনের সেই দুর্লভ সন্ধ্যাব যে রংটিকে নিয়ে কবি ভালোবাসার লোকের মুখেব উপর ধরে নূতন এবং সুন্দর আলোকে দেখতে চেযেছিলেন, পরবর্তীকালে নিঃসঙ্গ কবি সেই রঙটিকে ধরে রাখলেন চিত্রকলায়—বিষণ্ণ নারীমূর্তি ও বেদনার্ত কবির মুখের উপরে। এবং অতীত যৌবনের সেই ক্ষণকালের দিনটিকে ধরে রাখলেন ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থে, এবং চিঠিব উত্তরটি লিখে রাখলেন লিপিকাব 'প্রথম চিঠি'তে যা' পবিশেষের 'আরেকদিন' কবিতায় ও পূরবীর 'কৃতজ্ঞ'তে এই চিঠিব কথা উল্লেখ করেছেন—৩০ আগষ্ট ১৯২৭ রফিউস জাহাজ।

ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থ—শেষ যৌবনের শেষ বসন্ত।

স্থান—কবির 'লীলালোকের লীলাক্ষেত্র' শিলাইদহে সংসার জীবনের 'লীলা-সঙ্গিনী' 'নিরুপমার উদ্দেশ্যে অকাল বসন্তের ঘন বর্ষার মধ্যে ১৩০৭ বঙ্গাব্দে রচনা করলেন ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থখানি এবং বহু গান। মোর প্রেম এল গান গেয়ে।' নবযৌবনের নববসন্তে কবি যাঁকে প্রথম গান দিয়ে বরণ করে নিয়েছিলেন—'দাঁড়ায়েছ সংগীতের শতদলদলে' (স্মরণ নয় সংখ্যক)। তাই পরবর্তীকালে কবি পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে 'ক্ষণিকা' এবং 'অস্থিতে-মজ্জাতে বেহিসাবি, জন্মগরিব,

কাঁচা ঋণগ্রস্ত' কবিকে স্মরণ করে পূরবীতে অতীতের 'আনন্দের হারানো কণিকা' ক্ষণিকার পরিচয় দিয়েছেন, যিনি ভীরুদীপশিখা নিয়ে কবির বসন্ত রাতে এসেছিলেন (পশ্চিম-যাত্রীর-ডায়ারি ৫৬১, ৫৬৬ পৃষ্ঠা)।

'উদ্‌বোধন'

কবি শেষ যৌবনে কল্যাণী নারীকে আহ্বান করে ১৩০৭ বঙ্গাব্দে শিলাইদহে কল্যাণ কর্মের সূচনা করে নব জীবনের 'উদ্‌বোধন' করলেন। এই কালস্রোতে বর্তমানে কবির জীবনে যারা ক্ষণিকের জন্য এসে হেসে চলে যাচ্ছে কবি তাদেরই গান আনন্দ পুলক ভরে গাইছেন। কবি অতীত জীবনের প্রতি মুহূর্তের কাহিনী ও শোক দিয়ে যে স্মৃতিবাহিনী গেঁথেছিলেন, সেই সব বন্ধন মুক্ত করে শোক দুঃখ স্মৃতি সব কালের পটে মুছে ফেলে দিয়ে দুর্বোধ্য ও অপ্রাপ্য বস্তুর পেছনে না ছুটে 'সহজ'কে (নারী) আদরে ডেকে নিয়ে বর্তমানকে শ্রেষ্ঠ মনে করে আনন্দ-পুলকিত মনে নিজের জীবনের নূতন অধ্যায়ের সূচনা করলেন। কবির এই মনোভাবকে কালের বৃহৎ পটভূমিকার সঙ্গে তুলনা করে 'নদী জলে পড়া আলোর মতন' মহত্তর জীবনের পূর্ণতার দিকে এগিয়ে গেলেন।

অসম্পূর্ণ মানসী থেকে সম্পূর্ণ ক্ষণিকা – কবির যৌবনের মানসভূমি ও তার ভৌগোলিক অবস্থান (১৮৮৮-১৯০১)।

ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই কাব্যগ্রন্থের পটভূমিকারও আলোচনার দরকার। প্রথম যৌবনে কবি সংসার জীবনের আনন্দ ও কবি-কল্পনার 'রোম্যান্টিক সহর' গাজীপুরের নূতনত্বের মধ্যে রচনা করেছেন 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতা (মানসী কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা ১৮৮৮)। ১৮৯১ সালে কবি নিজের পরিচিত সংসার ছেড়ে শিলাইদহে এসে নূতনত্ব ও বৈচিত্র্যের মধ্যে এই প্রথম মানুষের সুখ দুঃখের বিচিত্র জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হলেন। সেই বৈচিত্র্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ছোট গল্পের নিরন্তর ধারায়। সোনার তরী থেকে নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থ শিলাইদহে লেখা হয়। যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা কবি প্রায় একাই শিলাইদহে কাটিয়েছেন ১৮৯১ ৯৯)। এই দীর্ঘ সময় কবির সংসারের ভার কবি-পত্নী একলাই বহন করেছেন মংপুতে রবীন্দ্রনাথ)। শেষ যৌবনে কবি ও কবি-পত্নী জোড়াসাঁকোর সংসার উঠিয়ে দিয়ে শিলাইদহে সুখের সংসার আরম্ভ করলেন (১৮৯৯ ১৯০১)। এই শেষ যৌবনের সংসার জীবনের মধ্যে কবির 'লীলালোকের লীলাক্ষেত্র' শিলাইদহে রচনা করলেন

'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থ (১৩০৭ এবং 'নৈবেদ্য' (১৩০৮)। এই সময় কবিপত্নীই ছিলেন কবির একমাত্র সহায় ও ভরসাস্থল এবং ঋণগ্রস্ত কবির সংসারের গুরু দায়িত্ব সবই তাঁর উপরে ন্যস্ত। তাই কবি 'পথে' কবিতায় লিখলেন—

ওই-যে শুনি মাঝে মাঝে—
না জানি কোন্ নিত্যকাজে
কোথায় দুটি কাঁকন বাজে
গৃহকোণে।
যেতে যেতে এলেম হেথা
অকারণে।

কবি সংশয় দ্বন্দ্ব, বাধা বিরোধ ও সাংসারিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে এতদিন পরে শেষ যৌবনে 'সুখেব বন্দরে' অর্থাৎ সুখের সংসারে এসে পৌঁছুলেন। কবি এই নিভৃত কুটিরে এসে কবির প্রথম যৌবনের হারিয়ে যাওয়া ফাল্গুন মাসের কথা (শরৎকাল—কড়ি ও কোমল) মনে পড়তে লাগল—

আরেক দিন সে ফাগুন-মাসে
বহু আগে
চলেছিলেম এই পথে সেই
মনে জাগে।
আমের বোলের গন্ধে অবশ
বাতাস ছিল উদাস অলস,
ঘাটের পানে বাজছে কলস
ক্ষণে ক্ষণে
সে-সব কথা ভাবছি বসে
অকারণে।

কবির এই বিলম্বের জন্য 'বিলম্বিত' কবিতায় লিখেছেন—হাসি গান আনন্দ উচ্ছ্বাস নিয়ে কবির যে যৌবন যে স্বর্গ যে বসন্ত ছিল সেই নব যৌবনের কবি বসন্তের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কর্মের জগতে সংশয় দ্বন্দ্বের জগতে (মানসী) চলে গেলেন। আবার বহুদিন পরে কবির শেষ যৌবনে যখন পূব হাওয়া বইছে সেই সময় কবি অকাল বসন্তকে তাঁর বর্ণ গন্ধময় প্রথম বসন্তের ফুল ধরিয়ে দিলেন।

হল কালের ভুল,
পুবে হাওয়ায় ধরে দিলেম
দক্ষিণ হাওয়ার ফুল।

শেষ যৌবনে অকালবসন্তের আগমনে কবি ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থখানি বসন্তকালে আরম্ভ করেন এবং ইচ্ছা ছিল বসন্তকালেই এই কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশ করা কিন্তু গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় বর্ষাকালে (চিঠিপত্র ৮ম খণ্ড)। তাই বসন্ত ও বর্ষার দুই রকম কবিতা ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায়। কাব্যগ্রন্থের প্রথম দিকের কবিতাগুলি বসন্তকাল ও বসন্তের নারীকে নিয়ে লেখা (যুগল থেকে অতিথি)।

ক্ষুদ্র আমার এই অমরাবতী—
আমরা দুটি অমর, দুটি অমর।

শেষের কবিতাগুলি বর্ষাকাল ও বর্ষার রূপকে নিয়ে লেখা। তাই প্রথম আষাঢ়ের নব মেঘের নীল, কাল ও শ্যাম রঙের সঙ্গে বসন্তের নারী 'নিরুপমার' রূপের তুলনা দিয়েছেন যেমন—

তোমার দুখানি কালো আঁখি—'পরে
শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে
ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে
যূথীর মালা
তোমারি ললাটে নববরষার
বরণডালা।

অথবা—

আকুল করেছ শ্যাম সমারোহে
হৃদয়সাগর উপকূল
চরণে জড়ায়ে বনফুল।

ক্ষণিকার কবিতাগুলিতে শিলাইদহের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ও বর্ষার বর্ণনা পাওয়া যায় 'পথে' 'মেঘমুক্ত' 'নব-বর্ষা' 'আষাঢ়' 'এক গাঁয়ে' 'বিরহ' 'দুই বোন' ইত্যাদি কবিতায়। 'বিরহ' কবিতাটি কবির অত্যন্ত প্রিয় কবিতা চন্দ্রনাথ বসু এই কবিতা সম্বন্ধে সুন্দর মন্তব্য করেছেন। 'দুই বোন' কবিতাটি অত্যন্ত ভাব সমৃদ্ধ কবিতা। এই কবিতাটিতে দুই সহোদরা কিংবা ভগিনী স্থানীয়া বান্ধবীর জল আনয়নের কথা বিধৃত করেছেন। সম্ভবতঃ দুটি কবিতাই কবির জীবনের বাস্তব

ঘটনা (ছিন্নপত্র ৪১)। কবির এই শেষ যৌবনের আষাঢ় ও বাল্যকালের আষাঢ় এই দুই আষাঢ়ের দুই রকম 'খেলা'র (ক্ষণিকা) কথা কবিতায় প্রকাশ করেছেন। ছেলেবেলার 'বর্ষা পর্যায়ের' আষাঢ়ে নৌকা ভাসানোর খেলা, এবং শেষ যৌবনের 'শরৎ পর্যায়ের' আষাঢ়ে যৌবন লীলার নানান্ 'খেলা'র কথা ক্ষণিকার কবিতাগুলিতে রয়েছে। তাই কবির শেষ যৌবনের অকালবসন্তের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পূব হাওয়া, শ্রাবণ পূর্ণিমা, বর্ষা ও আষাঢ় মাস। আষাঢ়ের সঙ্গে নারীর এত বিচিত্র রূপ কবির আর অন্য কোন কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায় না। ক্ষণিকাতেই বর্ষার সঙ্গে বসন্তের নারীর বিচিত্র রূপের বর্ণনা এবং বিচিত্র লীলার প্রকাশ রয়েছে। শেষ যৌবনের প্রথম আষাঢ়ের (১ আষাঢ় ১৩০৭) ঘন বরষার 'দুর্দিনের' মধ্যে (দুঃসময়) নব বসন্তের পঞ্চদশী নারী (তনু-কড়ি ও কোমল) 'নিরুপমার' 'আবির্ভাবে'র স্মৃতি পরবর্তীকালের বহু কবিতায়, নাটকে ও গানে এবং 'পথে ও 'পথের প্রান্তে' (৩৬ সংখ্যক) প্রকাশ করেছেন। কবি সানাই এর 'শেষ অভিসারে' লিখেছেন—

বসন্তের প্রথম দূতিকা
এনেছিলে আষাঢ়ের প্রথম যূথিকা
অনির্বচনীয় তুমি।

কবি নিজের জীবনের এক-এক পর্যায়ের সঙ্গে এক একটি ঋতুর তুলনা করে পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করেছেন। এই পাঁচটি পর্বের চারটি প্রধান ঋতুর মধ্যে যে চারজন কাব্যলক্ষ্মীর (৩জন কাব্যলক্ষ্মী ও একজন প্রেরণাদাত্রী) আবির্ভাব হয়েছিল তাদেরই উদ্দেশ্যে 'অনবসর' কবিতাটি লেখা হয়েছে যারা কবির কাব্যতরণীতে পদার্পণ করেছিলেন এবং যাঁরা কবির প্রিয় নারী ছিলেন। কবি 'অনবসর' কবিতাটিতে পরিহাস ছলে এই প্রেরণাদাত্রী নারীদের বিভিন্ন ঋতুর নামানুসারে সম্বোধন করে পরিহাস প্রিয়া শৈশবের কাব্যসঙ্গিণী 'পুরাতন সহচরীর' উদ্দেশ্যে লিখেছেন—

এসো আমার শ্রাবণ নিশি
    এসো আমার শরৎ লক্ষ্মী,
এসো আমার বসন্ত দিন
    লয়ে তোমার পুষ্প পক্ষী,
তুমি এসো, তুমিও এসো,
    তুমি এস, এবং তুমি, (পুরাতন সহচরী)

প্রিয়ে, তোমরা সবাই জান
ধরণীর নাম মর্ত্তভূমি—
যে যায় চলে বিরাগভরে
তারেই শুধু আপন জেনেই
বিলাপ করে কাটাই, এমন
সময় যে নেই, সময় যে নেই।

কবি এই অসময়ে ও শেষ যৌবনে এই চারজন কাব্যলক্ষ্মীর মধ্যে আসলটিকে (তথাপি) রেখে দিলেন। এবং 'স্মৃতি' রূপিণী (তথাপি-ক্ষণিকা, স্মৃতি-চৈতালি) 'পুরাতন সহচরী'কে ছেড়ে 'নূতন আঁখি' যিনি বাস্তব নারী তাঁর উদ্দেশ্যে কবির কাব্যের ও হৃদয়ের দ্বার দুইই খুলে দিলেন—'চারের থেকে একের পরেই আমার অভিরুচি'।

আবার শেষ যৌবনে এই অসময়ে 'নূতন' (কড়ি ও কোমল) এবং 'আসল' (তথাপি) কাব্যলক্ষ্মীকে নিয়ে নূতন ভাবে কাব্য রচনা করতে পারবেন কি না এই আশঙ্কাও কবির মনে দেখা দিল—

শেষ বসন্তের সন্ধ্যা-হাওয়া
শস্য শূন্য মাঠে
উঠল হা হা করি।
আর কি হবে নূতন যাত্রা
নূতন রাণীর দেশে
নূতন সাজে সেজে?
এবার যদি বাতাস উঠে
তুফান জাগে শেষে
ফিরে আসবি নে যে (পরামর্শ)।

কবির এই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়েছিল, ক্ষণিকার বিনাশ হল ১৯০২ খৃষ্টাব্দে (জন্মদিন ১১ সংখ্যক)।

প্রেম—'ভৎর্সনা' কবিতাটিতে সঙ্কুচিতা অভিমানী নারীর উক্তি দিয়ে কবির এই প্রথম ভালোবাসার কথা প্রকাশিত। এই নারী কবির সংগীত মুখর আনন্দিত জীবনে কোনো অধিকার বিস্তার করেননি অথবা কামনা বাসনা দিয়ে তাঁকে টেনেও আনেন নি, ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দীনবেশে তাঁর দ্বারে অতিথি হয়ে সাড়াও দেননি, তিনি শুধু পথের শেষে যেখানে গাছের ছায়ায়

পথিকেরা দাঁড়ায় সেখানে কিছুক্ষণের জন্য ঘাসের উপর দাঁড়িয়েছিলেন। কেমন করেই বা তিনি জানবেন যে কবি এই নারীকে বিদ্যুৎ ঝলকের মধ্যে ঘরের কোণায় দেখতে পাবেন! এই নারীর আছে পদ্মদিঘির ধারে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা গৃহখানি। ভালোবাসাকে তিনি ভিক্ষা বা দান স্বরূপ চাননি, তবে কেন কবি তাঁকে ভালোবেসে মিথ্যা লজ্জা দিলেন! এতদিন পরে শেষ যৌবনে কবি সব সংশয় (সংশয়ের আবেগ—মানসী) কাটিয়ে যাঁকে ভালোবাসলেন তিনি ঘরের কোণেই ছিলেন (কেউ বা ঘরের কোণে—পশ্চিম যাত্রীর-ডায়ারী ৫৬১ পৃষ্ঠা)। ক্ষণিকার ভৎর্সনা' কবিতাতেই কবির এই প্রথম দুর্লভ প্রেমের আবির্ভাব, যার জন্য কবি বহুদিন ধরে অপেক্ষা করেছিলেন (শেষ কথা—কড়ি ও কোমল)। 'সানাই'এর আসা যাওয়া কবিতায় প্রেমের এই উপলব্ধির কথা প্রকাশিত—

ভালো বাসা এসেছিল
এমন সে নিঃশব্দ চরণে
তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে,
দিই নি আসন বসিবার।

'স্মরণ তিন সংখ্যক' কবিতায় লিখেছেন—

প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে খুলি দ্বার—
আর কভু আসিবে না।

ভৎর্সনা, নীহারিকা, উদাসীন, আসা যাওয়া, শেষ সপ্তক এক সংখ্যক, পত্রপুট পনেরো সংখ্যক, অদেয় (সানাই), অন্তর্হিতা (পরিশেষ), বলাকা বিয়াল্লিশ সংখ্যক প্রভৃতি কবিতায় এবং বহু গানে প্রায় একই ধরণের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ কবি যাকে ভালোবাসলেন তাঁকে সমাদর করেন নি এবং তাঁর প্রতি উদাসীন ছিলেন।

যে গর্ব আমার ছিল উদাসীন
সে নুয়ে পড়েছে সেই মাটিতে
যেখানে তোমার দুটি পায়ের চিহ্ন আছে আঁকা।

আবার পত্রপুট পনেরো সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন—

ভালোবেসেছি তাকে।
তুচ্ছতার আবরণে অনুজ্জ্বল
অতি সাধারণ স্ত্রী-স্বরূপকে

কথনো করেছে লালন, কথনো করেছে পরিহাস,
আঘাত করেছে কথনো বা।

কবি এই নারীকে কৌতুক পরিহাসে সব সময় উলটো কথা বলে আঘাত দিতেন, তাই কবি গর্ব অথবা 'ভীরুতা'র জন্য এবং সময়াভাবের জন্য ভালোবাসার কথা কোনদিনই বলতে পারেন নি। এই দুঃখ তিনি পত্রপুট বারো সংখ্যক বলাকা বিয়াল্লিশ সংখ্যক কবিতায় এবং বহুগানে ব্যক্ত করেছেন। শেষ সপ্তক উনত্রিশ সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন—

ঠিকমতো সময়টি পাইনি
তাকে সব কথা বলবার,
অনেক কথা বলা হয়েছে যখন-তখন
সে-সব বৃথা কথা
হতে হতে বেলা গেছে চলে।

এই হল কবির 'সমগ্র জীবনের সত্য।' কবি যাঁকে প্রথম যৌবনে হাল্‌কা মনে করেছিলেন, শেষ যৌবনে সেটাই ভারী হয়ে গেল। কবি পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে (৫৪৪ পৃষ্ঠা) নিজের ব্যক্তিগত জীবন প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'সরকারী পরিমাপের আদর্শ যেটাকে দেখায় ভারী সেটাই হয়তো হাল্‌কা, যেটাকে বুঝি হাল্‌কা সেটাই হয়তো ভারী। দীর্ঘকালের আনুষঙ্গিক অনেক বাজে জিনিষ ভুলে যাওয়ার ভিতর দিয়েই বিশেষ জিনিষের বিশেষ ওজন পাওয়া যায়।'

'উৎসৃষ্ট' কবিতায় কবি হৃদয় নিয়ে হৃদয় দেবার কথা উল্লেখ করেছেন, আবার পরিহাস করে লিখেছেন—

আজ যে তাহা ছড়িয়ে গেছে
অনেক দূরে—
অনেক দেশে, অনেক বেশে,
অনেক সুরে।
কুড়িয়ে তারে বাঁধতে পারে
একটি থানে
এমনতরো মোহন-মন্ত্র
কেই বা জানে
নিজের মন তো দেবার আশা
চুকেই গেছে,

পরের মনটি পাবার আশায়
রইনু বেঁচে।

মৃণালিনী দেবী ভালোবাসার মোহনমন্ত্র দিয়েই কবির ছড়ানো হৃদয় বেঁধে দিলেন। অস্থির কবি শেষ যৌবনে অতীতের (য়ুরোপ-যাত্রীর-ডায়ারী) বহু আকাঙ্ক্ষিত 'দুর্লভ ভালোবাসা' অথবা 'যথার্থ নির্জনতাপ্রিয় একাগ্রগভীর ভালোবাসাপূর্ণ একটি হৃদয়' (২৩ অক্টোবর ১৮৯০ য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী) পেয়ে স্থির হয়ে গেলেন। এতকাল কবি ভাবের বসেই ডুবে ছিলেন, ক্ষণিকাতে সেই ভাব হতে রূপে এসে মনের সঙ্গে 'বোঝাপড়া' (ক্ষণিকা) করে নিজেকে 'সম্বরণ' করলেন—

মনেরে আজ কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' এ তাঁর কথায় আছে, 'কে সামনে এলো, কে পেছনে রইল সেটা সামান্য, অসামান্য সেইটাই যেটা তার দান, কি উপায়ে দিল তা নয়—কি দিল। মিলন তখনই যথার্থ বড় মিলন হয়, যখন সে মহত্তর জীবনের মধ্যে প্রেরণা আনে। যেখানে পুরুষ মহৎ, যেখানে সে কর্মের দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে তাকে নিয়ত জাগ্রত করে রাখা কম কাজ নয়।' তাই কবি কল্যাণকর্মের সঙ্গিনীরূপে কল্যাণী নারীকে পেয়েছিলেন বলেই তিনি 'প্রতিজ্ঞায়' (ক্ষণিকা) তাপস হতে পেরেছিলেন।

ক্ষণিকার অন্তর্নিহিত অর্থ এই, কবির জীবনে যখন নববসন্তের ভালোবাসা অকালবসন্তে এলো তখন সেই ভালোবাসার উচ্ছ্বাসে ও আনন্দে কবি কৌতুক পরিহাসে তাঁর ভালোবাসার পাত্রপাত্রীদের উদ্দেশ্যে কবির মনের ভাব এক ঝাঁক বনের পাখির মত নানা খোপখাপের ভেতর থেকে ছেড়ে দিলেন। কবি প্রিয়নাথ সেনকে লিখেছেন—'তারা গানও গাচ্চে এবং উড়চেও। তাদের কণ্ঠে সুর এবং ডানায় লঘুতা দিয়ে দিয়েছি। ঐ লঘুতাটার জন্য একদলের বিরাগ-ভাজন হব। যারা আকাশের পাখির স্বাভাবিক গানের চেয়ে খাঁচার পাখির কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম তক্তপোষে বসে শুনতে চায়—আমার ছাড়া পাখিগুলি অত্যন্ত লঘুতাবশতঃ তাঁদের দাঁড়ের উপর ধরা দিবে না বলে তারা চটবে।' এমনকি চিঠিপত্র ৮ম খণ্ডে 'ক্ষণিকার কবিকে' নিয়েও পরিহাস করেছেন। 'শিলাইদহের ঘাটে যখন ফিরলেম তখন চতুর্দ্দশীর চাঁদ মধ্য গগনে। আমার সেই জ্যোৎস্না জড়িত নদীটি স্মিত বিষণ্ণ হাস্য বল্লেন, আমাদের কলহংসমুখর নির্জ্জন বালুতটে শত শতের মৌন

মিলন সুখ একেবারে বিস্মৃত হয়ে তুমি এখন ডাঙার মথুরায় রাজত্ব করতে গেছ। আমি তার একটি অক্ষর জবাব দিতে পারলুম না একেবারে নির্বোধের মত নি:শব্দে চৌকিটিতে বসে রইলুম (১০ আগষ্ট ১৯০০ সাল)। আবার কবিতায় আনন্দ উচ্ছ্বাসে কৌতুক পরিহাসে 'অতিবাদ' করলেন।

প্রিয়ার পুণ্যে হলেম রে আজ
একটি রাতের রাজ্যাধিরাজ,
ভাণ্ডারে আজ করছে বিরাজ
সকল প্রকার অজস্রত্ব।

ক্ষণিকার এই কবিতাগুলিতে যৌবনের রবীন্দ্রনাথকে কিছু কিছু ধরা যায়। কবি ও কবি-পত্নীর চরিত্রগত 'প্রভেদ' (বিচিত্রিতা) ও জানা যায়। কবি ছিলেন উদাসীন, পরিহাসপ্রিয়, খেয়ালি, ঋণগ্রস্ত (কৃতার্থ ও অস্থির প্রকৃতির মানুষ, ভালোবাসেন নদীর বালুর চর। কবি-পত্নী ছিলেন সরল, হাস্যমুখী, কর্মঠ অতিথি-পরায়ণা সেবাপরায়ণা কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী ভালোবাসেন নীড়কে; এবং শেষ যৌবনে তারা বৃহৎ পরিবারের বাইরে এসে দুজনে একা হলেন—'তোমার সন্ধ্যাপ্রদীপ আলোকে তুমি আর আমি একা।' কবি প্রিয়নাথ সেনকে চিঠিতে লিখেছেন—'এখন ঘরের দিকে মন টানিতেছে...সেখানকার সন্ধ্যাদীপ শিখা কেবলই চোখে পড়িতেছে।' কবিতাগুলিতে কবি পত্নীর চেহারার বর্ণনাও পাওয়া যায়। মৃণালিনী দেবীর রং শ্যামলা (কালো-শ্যামা মেয়ে, কৃষ্ণকলি, যাত্রী) তনু, তনুদেহ, মুগ্ধ কালো হরিণ চোখ এবং কবি ছিলেন মৃণালিনী দেবীর নিন্দুক ভক্ত, এবং কৌতুক পরিহাসে সব সময় উল্টো কথা বলতেন (ভীরুতা)।

'কৃষ্ণকলি' কবিতায় কবি কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখের বর্ণনা দিয়েছেন, এবং নব বর্ষার নব মেঘের কালো রূপের সঙ্গে কালো মেয়ের (শ্যামা মেয়ে) রূপের তুলনা করেছেন। এই শ্যামা মেয়ে অথবা শ্যামা সুন্দরীর (বোধন-মহুয়া) কালো-রূপই কবির সকল রসের ধারা যা' তাঁর কাব্যে ও জীবনে প্রতিফলিত। আর কবির এই পরম সত্য কথাটির 'জবাবদিহি' করেছেন নবজাতকে'। আবার 'হরিণ আঁখির' (য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি ৪০২ পৃষ্ঠা) উদ্দেশ্যে 'ক্ষতিপূরণ' কবিতাটিও লিখেছেন। 'ক্ষতিপূরণ'কবিতায় কবি কেন মহাকাব্য না লিখে গান লিখলেন তার কারণ ও প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, এই সময়ে (১২৯১ বঙ্গাব্দে-জীবনস্মৃতি ১১৩ পৃষ্ঠা) বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার আলাপের সূত্রপাত হয়। আবার বঙ্কিমবাবুও লিখেছেন, 'এই চারমাস (ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১২৯১ বঙ্গাব্দ) মধ্যে

রবীন্দ্রবাবু অনুগ্রহপূর্বক অনেকবার আমাকে দর্শন দিয়াছেন। সাহিত্য বিষয়ে অনেক আলাপ করিয়াছেন।' নগেন্দ্র গুপ্ত প্রবাসীতে লিখেছেন, 'স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে মহাকাব্য লিখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। মহাকাব্য রচনা করা রবীন্দ্রনাথের ঘটিয়া উঠে নাই, কিন্তু তিনি মহাকবি কি না জগতের সকল সাহিত্যে সকল ভাষায় তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।' কবিরও মনে মনে মহাকাব্য রচনা করার সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু হরিণ নয়না নারীর কাঁকনের ঝঙ্কারে কবির কল্পনাটি ফেটে গিয়ে মহাকাব্যের বদলে হাজার গানে পরিণত—

আমি নাবব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে—
ঠেকল কখন তোমার কাঁকন—
কিংকিণীতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।

কবি মহাকাব্য না লেখাতে তাঁর এবং দেশের যে ক্ষতি হল, সেটা গান লিখেই 'ক্ষতিপূরণ' করে দিলেন। পরবর্তীকালে পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে (৫৬২-৫৬৬ পৃষ্ঠা) তাঁর গান সম্বন্ধে অতীতের কথাই (ক্ষতিপূরণ—ক্ষণিকা) আবার পুনরুক্তি করে লিখেছেন—'এ কথাটার এতক্ষণ ধরে আলোচনা করছি এইজন্যে যে, যে লীলালোকে জীবনযাত্রা শুরু করেছিলুম, যে লীলাক্ষেত্রে জীবনের প্রথম অংশ অনেকটা কেটে গেল, সেইখানেই জীবনটার উপসংহার করার উদ্‌বেগে কিছুকাল থেকেই মনের মধ্যে একটা মন কেমন-করার হাওয়া বইছে। 'কদা পদ্মার ধারে আকাশের পারে সংসারের পথে যারা আমার সঙ্গী ছিল তারা বলছে, সেদিনকার পালা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায় নি, বিদায়ের গোধূল-বেলায় সেই আরম্ভের কথাগুলো সাঙ্গ করে যেতে হবে। সেইজন্যেই সকালবেলাকার মল্লিকা সন্ধ্যাবেলাকার রজনী-গন্ধা হয়ে তার গন্ধের দূত পাঠাচ্ছে। বলছে, তোমার খ্যাতি তোমাকে না টানুক, তোমার কীর্তি তোমাকে না বাঁধুক, তোমার গান তোমাকে পথের পথিক করে তোমাকে শেষ যাত্রায় রওনা করে দিক। প্রথম বয়সের বাতায়নে বসে তুমি তোমার দূরের বঁধুর উত্তরীয়ের সুগন্ধি হাওয়া পেয়েছিলে। শেষ-বয়সের পথে বেরিয়ে গোধূলিরাগের রাঙা আলোতে তোমার সেই দূরের বঁধুর সন্ধানে নির্ভয়ে চলে যাও। লোকের ডাকাডাকি শুনো না। সুর যে দিক থেকে আসছে সেই দিকে

কান পাতো—আর সেই দিকেই ডানা মেলে দাও সাগর পারের লীলালোকের আকাশ পথে।'

ক্ষণিকার বিনাশ ও অসীমের আবির্ভাব।

'ক্ষণিকার 'যথাসময়' কবিতায় লিখেছেন, কবি যাঁদের কাছে যত বেশী ঋণী ছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্যেই তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি তত বেশী উৎসর্গ করেছেন। তাই কবি স্নেহময়ী, করুণাময়ী, কাব্যের প্রেরণাদাত্রী কাব্যসঙ্গিনীকে অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থগুলি উৎসর্গ করে তাঁর কাছে স্নেহের ঋণশোধ করে দিলেন। কবি 'যথাসময়' কবিতায় পরিহাস ছলে লিখেছেন—

হঠাৎ পড়ে ঋণশোধেরই পালা,
ঋণী জনের না যায় পাওয়া দেখা,
তখন ঘরে বন্ধ হবে কবি,
খিলের পরে খিল লাগাও খিল।
কথার সাথে গাঁথো কথার মালা,
মিলের সাথে মিল, মিলাও মিল।

কিন্তু ক্ষণিকার বিনাশের পর কবি উৎসর্গ ২০ সংখ্যক কবিতায় এই প্রথম তাঁর শূন্য মন ও অনন্ত প্রেমের ঋণের কথা ব্যক্ত করে জীবনের ব্যর্থতার কথা প্রকাশ করলেন—

ব্যর্থ হয়, ব্যর্থ হয় এ দিনরজনীর,
এ মোর জীবন।
হায় হায় চিরদিন
হয়ে আছে অর্থহীন
এ বিশ্ব ভুবন।
অনন্ত প্রেমের ঋণ
করেছি বহন
ব্যর্থ এ জীবন।

বলাকা কাব্য-পরিক্রমা ১৩৪ পৃষ্ঠায় প্রেমের ঋণশোধ অথবা প্রতিদান সম্বন্ধে কবি ব্যাখ্যা করে বলেছেন—জন্মাবার সময়ই আমরা ঋণ নিয়ে জন্মাই, তারপর জন্ম ভরে সেই ঋণ শোধ করি। ....অন্যের কাছে চাওয়া যায়, কিন্তু নিজের কাছে নিজের চাওয়ার কোনো অর্থ নেই। প্রেমের পথে চাইতে গেলেই প্রেমের অপমান। বরং আমরা তাকে কিছু দিতে পারলে ধন্য হই। শারদোৎসব নাটক-

খানাতে প্রেমের এই ঋণশোধের কথা কিছু বলা হয়েছে।' তাই কবি ক্ষণিকার পরবর্তীকালে, কবির প্রেমময়ী নারী যিনি দুঃখকে গলার হার করে দৈন্যকে মহিমা দিয়েছিলেন (শেষ সপ্তক পাঁচ সংখ্যক,) সেই নারীর অনন্ত প্রেমের ঋণশোধ করলেন মৃত্যুর রূপকে ভেঙে 'ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া' অশরীরী নারী অথবার সৃষ্টি করে (শেষ সপ্তক আটত্রিশ সংখ্যক।। 'দুঃখেরই রূপ মধুর নয়'—কবি উপনন্দের মতো আজীবন দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণশোধ করলেন। কবি নিজেরই প্রেমের ঋণশোধের রূপক কাহিনী লিখেছেন 'শাবদোৎসবে'।

যে-আমি চায় নি কারে ঋণী করিবারে,
বাখিয়া যে যায় নাই ঋণভাব,
সে আমারে কে চিনেছ মর্ত্যকায়ায়। (স্মরণ-সেঁজুতি)।

কবি 'জন্মদিন এগারো সংখ্যক কবিতায় ক্ষণিকার উৎপত্তি, বিনাশ, রূপান্তরিত ক্ষণিকা (মুখ ঢাকা বধূ-অশরীরী নারী) ও অনন্তের আবির্ভাবের কথা প্রকাশ করে নিজের জীবন বৃত্তান্তের কথা ব্যক্ত করেছেন।

ক্ষণিকার বৈশিষ্ট্য ও তার প্রভাব—

ক্ষণিকার কবিতাকে মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে লীলা' নাম দিয়েছেন, প্রেমলীলার এই অঙ্গটির নামের মধ্যেও গভীর অর্থ নিহিত রয়েছে। 'লৌকিক প্রেম অনেক সময় প্রেমের ছায়ামাত্র। এই অবাস্তব ছায়া যথার্থ প্রেমের নিকট তিরস্কার ভাজন না হইয়া কৌতুক ভাজন হইয়াছে এবং তাহার কৌতুক মিশ্রিত কটাক্ষের দ্বারা লজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কৌতুক হাস্যেই লীলার কবিতাগুলি দীপ্তিমান।' রবীন্দ্রনাথও 'একদা পদ্মার ধারে আকাশের পার'কে 'লীলালোকের লীলাক্ষেত্র' বলে পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে উল্লেখ করেছেন। এই কাব্যগ্রন্থটি কবির সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থ বলে মংপুতে কবি নিজেই প্রকাশ করেছেন। পরবর্তীকালের বহু কবিতায় এবং পশ্চিম-যাত্রীর-ডায়ারি ও পূরবীর ক্ষণিকায় এই 'ক্ষনিকা'রই কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। এমন কি 'শেষ অর্ঘ্য' (পূরবী) ও 'নৈবেদ্য' (মহুয়া) রেখে গেলেন ক্ষণিকার উদ্দেশ্যে। যদিও ক্ষণিকার কবিতাগুলি খুবই হাল্কা ধরনের এবং কথ্য ভাষায় লিখিত হয়েছে কিন্তু প্রত্যেকটি কবিতাই খুব অর্থপূর্ণ। য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারীর সেই অস্থির, পরিহাস প্রিয়, আবেগপ্রবণ, গৃহপ্রিয় সুখী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্ষণিকার কোথায় যেন একটা অদৃশ্য যোগসূত্র রয়েছে।

স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে কবি মানসে এই শেষ যৌবনে এবং প্রৌঢ় বয়সে যখন কন্যার পাত্রের সন্ধানে ব্যস্ত সেই সময় হঠাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এত আনন্দ এত উচ্ছ্বাসের কারণ কি হতে পারে। এই কবি শুধু ক্ষণিকারই কবি। এতে মানসীর ভালোবাসার সংশয় নেই, সোনার তরীর স্বপ্নময় মনের আভাস নেই চিত্রার দৈত সত্তার দ্বন্দ্ব নেই কল্পনার দুঃসময়ও নেই, আছে শুধু আনন্দ-উচ্ছ্বাসে কৌতুক পরিহাসে যৌবন ও বসন্তকে আহ্বান করে মাতাল হয়ে পাতাল পানে বাওয়ার গান এবং অতীতের শোক দুঃখ স্মৃতিকে ভুলে গিয়ে যৌবনের ও বসন্তের কবিকে স্মরণ করেছেন। তাই ক্ষণিকার কবি মানসের সঙ্গে অন্য কোন কাব্যগ্রন্থের কবি মানসের কোন যোগ নেই। এই কাব্যগ্রন্থ শুধু দুই যৌবনের (কড়ি ও কোমল ক্ষণিকা) এবং দুই বসন্তের (নববসন্ত ও শেষ বসন্ত) কবিকে নিয়ে। এবং কবি যাঁকে ভালবাসতেন (ভর্ৎসনা) পরিহাস করতেন (অতিবাদ, উৎসৃষ্ট, গর্ব বা ভীরুতারজন্য উল্টো কথা বলে আঘাত করতেন (ভীরুতা), নিন্দেও করতেন আবার ভক্তও ছিলেন (ক্ষতিপূরণ, উৎসর্গ ৩২ সংখ্যক, আবার তাঁর প্রতি উদাসীন ছিলেন (উদাসীন শেষ সপ্তক এক সংখ্যক), সেই সনাতনী 'বাংলা দেশের মেয়ে' টি দ্বারে এ কাব্যগ্রন্থখানি অতি সাধারণ কথা ও ছন্দে কবির পুরাতন প্রাণের কথাটি ('মেঘমুক্ত) আবার নূতনভাবে লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ সহজ ভাষায় সহজ কথায় সোজাসুজি' ভাবে 'কল্যাণী' নারী 'চিরায়মানার' উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছে।

ক্ষণিকার কবিতাগুলি কবির জীবনে ও কাব্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে, তাই কবি নিজেই আবির্ভাব' ও ভীরুতা' প্রসঙ্গে যা লিখেছেন সেই লেখা দুইটিই ক্ষণিক কাব্যগ্রন্থের সারমর্ম ও ভিত্তি স্বরূপ। কবির শেষ যৌবনে শেষ বসন্তে এমন একজন কল্যাণী নারীর 'আবির্ভাব' হল যাকে কবি ভালোবাসলেন, অথচ গর্ব বা ভীরুতার' জন্য বিপরীত পথ অবলম্বন করে গভীর কথাকে কৌতুক পরিহাসে পরিণত করলেন। কবি ভীরুতা' প্রসঙ্গে লিখেছেন—'ভালোবাসা আপনাকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতায় কেবল সত্যকে নহে অলীককে সঙ্গত নহে অসঙ্গতকে আশ্রয় করিয়া থাকে স্নেহ আদর করিয়া সুন্দর মুখকে পোড়ারমুখী বলে, মা আদর করিয়া ছেলেকে দুষ্টু বলিয়া মারে, মিথ্যা ভর্ৎসনা করে। সুন্দরকে সুন্দর বলিয়া যেন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না তোমাকে ভালবাসি বলিলে যেন ভাষায় কুলাইয়া উঠে না, সেইজন্য সোজাসুজি সত্যকথার দ্বারা প্রকাশ করা সম্বন্ধে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া ঠিক

তাহাদের বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে হয়. তখন বেদনার অশ্রুকে হাস্যচ্ছটায় গভীর কথাকে কৌতুক পরিহাসে এবং আদরকে কলহে পরিণত করিতে ইচ্ছা করে।' তাই কবি যাকে ভালোবাসতেন, পরিহাস করতেন, নিন্দেও করতেন আবার ভক্তও ছিলেন এবং উলটো (বিপরীত কথা) কথা বলে যাঁকে আঘাত করতেন সেই ভালোবাসার পাত্রীকে উপলক্ষ করে কবি কৌতুক পরিহাসে নিজের জীবনের গভীর কথা প্রকাশ করেছেন। এবং শৈশব থেকে যৌবনের প্রান্তসীমা পর্যন্ত যে সব নর নারীরা ক্ষণকালের জন্য এসে কবির কাব্য জীবনে এবং কর্ম জীবনে যে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন সেই প্রিয় নর নারীদের উদ্দেশ্যে কবি কৌতুকছলে যৌবনের হিসাব নিকাশও দিয়েছেন। পরবর্তীকালে নিঃসঙ্গ কবি পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে অতীতের সেই প্রিয় নারীদের স্মরণ করে 'ক্ষণিকা'র বিশ্লেষণ করেছেন (৫৬১ পৃষ্ঠা। এবং পূরবীতে অতীতের পূজারিণী নারী 'ক্ষণিকা'কে কবিতায় রূপ দিয়ে তাঁর পরিচয়ও দিয়েছেন (৬ অক্টোবর ১৯২৪)। 'কবির অতীতের সেই আনন্দ উচ্ছ্বাসে ভরা শেষ যৌবনের শেষ বসন্তের ক্ষণিকাকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন যিনি ভীরু দীপশিখা[২১] নিয়ে কবির জীবনে ক্ষণিকের জন্য এসেছিলেন। কবি ভেবেছিলেন সেই নারীকে ভুলেই গেছেন কিন্তু এখন দেখছেন, তাঁর সেই ক্ষীণ পদধ্বনি কবির গানের ছন্দে অধিকার করে রয়েছে, এবং তাঁরই বিরহের কথা কবির কাব্যে প্রকাশিত হচ্ছে। কবির হৃদয়ে ভালো-বাসার আঘাতে যে বীণা মুহূর্তের জন্য বেজেছিল কবি সেই অন্ধকারে থেমে যাওয়া বাণীরই সন্ধান করছেন। কবি নিজের অধৈর্য দিয়ে ভীরু সঙ্কুচিত (ছায়ায় সংকোচন) নারীর হৃদয়কে উন্মোচন করতে পারেন নি. তাই সেই নারীর গোপন হৃদয়ের রহস্য কবির স্বপ্ন দিয়েই উদ্ঘাটন করেছেন। কবি যদি অ স্থবিস্মিত হয়ে চমকে না যেতেন (যেন সে হঠাৎ গাওয়া নূতন ছন্দ বাল্মীকির, চোখ জাগান তোমাকেই-বাঁশিওয়ালা-শ্যামলী) এবং কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াতেন তবে দুজনের জীবনে যে চরম লক্ষ্য ছিল তাই ধরা পড়ে যেত এবং চিরকালের বাণী হয়ে আলোকে উদ্ভাসিত হত। কবির সেই অপূর্ণের লেখাগুলি এবং না বোঝার বাধাগুলি স্বপ্নের মূর্তি হয়ে আলোকে আঁধারে কবির কাছে কাছে ফিরছে। আর সেই অচেনা নারী ক্ষণিকাকে আকুল হয়ে খুঁজছেন—'জলভরা ঘট নিয়ে যে চলে গিয়েছিল চকিত পদে।' ইনিই কবির শেষ পূজারিণী নারী যিনি কল্যাণকর্মের প্রেরণাদাত্রী, যাঁর 'অবির্ভাব' ক্ষণিকাতে যাঁকে অশরীরী নারীরূপে সৃষ্টি করলেন 'বলাকা'তে এবং 'আহ্বান' করলেন পূরবীতে। তাই পূরবীতে কবি 'কৃতজ্ঞ'তার

সঙ্গে লীলালোকের লীলাসঙ্গিনী', প্রথম বসন্তের 'তারা' (তুমি-কাড় ও কোমল) 'ক্ষনিকা'কে স্মরণ করেছেন এবং 'শেষ অর্ঘ্য'ও ক্ষণিকাকে দিয়েছেন এবং শেষ বারের মতো কবি বসন্তের কল্যাণী রমণীকে 'আহ্বান' করে, 'শেষ বসন্ত'র কাছে বিদায় নিলেন। এইকারণে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এবং জীবনীতে তাঁর শেষ যৌবনের শেষ বসন্তের রচনা ক্ষণিকার এত গুরুত্ব।

আজ সামনে যখন দেখি
ফুরিযে এল পথ,
পাথেযের অর্থ আর রইল না কিছুই।
যে প্রদীপ জ্বলছিল মিলন শয্যার পাশে (কড়ি ও কোমল)
সেই প্রদীপ এনেছিলেম হাতে করে।
তার শিখা নিবল আজ,
সেটা ভাসিযে দিতে হবে স্রোতে।

রবীন্দ্র কাব্যে 'শ্যামা' এবং অশরীরী নারী 'শ্যামলী' ছাড়াও আরো কয়েকটি নারীকে কবির কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায়। কয়েকটি নারীকে কবি কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। কনি, কিশোর প্রেম এবং কৈশোরিকা কবিতাটি কবির নিজেরই কিশোর জীবনের প্রথম প্রণয় কাহিনী। 'হঠাৎ দেখা'তে কবি লিখেছেন—

"আমাদের গেছে যে দিন
একেবারেই কি গেছে,
কিছুই কি নেই বাকি।"
একটুকু রইলেম চুপ করে,
তারপরে বললেম,
"রাতের সব তারাই আছে
দিনের আলোর গভীরে।"

কবিও তাঁদের সবাইকে ধরে রেখেছেন তাঁর কাব্যগ্রন্থে তাঁর কবিতার মাধ্যমে, ভাষার অঞ্জলিতে। 'হারানো মনের' শুধু কনক গৌর বর্ণ পা দুখানির কথা আছে, আর কবির ভালোবাসা—

যেন সেই আল-ভেঙে যাওয়া খেতের মতো
অনেক দিন হল চাষি যাকে
ফেলে দিযে গেছে চলে ;

শেষ সাতাশের শেষ বসন্ত—

প্রেরণাদাত্রী—কবির তপস্বিনী নারী—'বিদেশী ফুল'। 'কেউ বা পথের বাঁকে'—কবি যখন বৃদ্ধ বয়সে বিদেশে যান তখন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে পরিচয় হয়। এই নারীর আন্তরিকতায় ও সেবাপরায়ণতায় মুগ্ধ হয়ে কবি তাঁকে পূরবী কাব্যগ্রন্থখানি উৎসর্গ করেন। তিনি কবির চিত্রকলার প্রেরণাদাত্রী ছিলেন। কবি 'অতিথি' কবিতায় লিখেছেন—

প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী,
মাধুর্যসুধায় ; কত সহজে করিলে আপনারি
দূরদেশী পথিকেরে ;

আবার 'বিদেশী ফুল' কবিতায় সেই নারীকে প্রশ্ন করে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করেছেন।

কহিলাম, "বোঝ নি কি তোমার পরশে
হৃদয় ভরেছে মোর রসে ?
কেহ বা আমারে চেনে এর চেয়ে বেশি,
হে ফুল বিদেশী।"

অন্তর্হিতায় লিখেছেন—

"কোন অতিথি দ্বারের কাছে
একলা রাতে বসে আছে ?"
ক্ষণে ক্ষণে তন্দ্রা ভেঙে
মন শুধাল যবে
বলেছিলেম, আর কিছু নয়,
স্বপ্ন আমার হবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবি নিজের হৃদয়ের দৈন্য সম্বন্ধে 'আশঙ্কা' প্রকাশ করে তপস্বিনী নারীকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন—

তপস্বিনী, তোমার তপের শিখাগুলি
হঠাৎ যদি জাগিয়ে তুলি,
তবে সে যে দীপ্ত আলোয় আড়াল টুটে
দৈন্য আমার উঠবে ফুটে।
হবি হবে তোমার প্রেমের হোমাগ্নিতে
এমন কী মোর আছে দিতে।

তাই তো আমি বলি তোমায় নতশিরে
তোমার দেখার স্মৃতি নিয়ে
একলা আমি যাব ফিরে।

কবির 'তপস্বিনী নারী' যাঁর পরশে কবির হৃদয় রসে পরিপূর্ণ হয়েছিল তাঁকে শুধু, দেখার স্মৃতি নিয়েই একলা দেশে ফিরে আসলেন এবং 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থখানি তাঁকে (বিজয়াকে) উৎসর্গ করলেন।

পূরবী কাব্যগ্রন্থ (চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ)

কবির শেষ সাতাশের শেষ বসন্ত ১৯২৪-১৯২৫।

পূরবী—শেষ সাতাশের শেষ রাগিণী—কবির অতীত বসন্তের (ক্ষণিকা) শেষ গান।

খোলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা,—
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে,
গোধূলি—বেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে,
লয়ে তার ভীরু দীপশিখা।
দিগন্তের কোন্ পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা॥

পূরবী কাব্যগ্রন্থে কবি অতীত বসন্তের (পরিচিত মানসভূমি—কড়ি ও কোমল, ক্ষণিকা) সমাপ্তি সংগীত গাইলেন এবং পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে (১৯২৪-২৫) তার বিশ্লেষণ করলেন। পূরবীর 'চাবি' কবিতায় কবি লাজুক হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের জনহীন প্রান্তরের দ্বার উদ্ঘাটন করে 'আনন্দের হারানো কণিকা' ক্ষণিকাকে 'আহ্বান' করলেন। আর কবির নবযৌবনের দুর্লভ মুহূর্তে (প্রত্যূষ বেলার মাহেন্দ্র ক্ষণে) যিনি স্বপ্নের মতো এসে কবির সুপ্ত যৌবনকে প্রথম জাগ্রত করেছিলেন, সেই নবযৌবনের 'তপোভঙ্গ' দূত নববসন্তের 'তারা' (তুমি-কড়ি ও কোমল) ক্ষণিকাকে শেষ অর্ঘ্য ও নিবেদন করলেন। কবির এই নবযৌবনের প্রথম 'তপোভঙ্গে'র কাহিনী রয়েছে পূরবীতে। যা' তিনি কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে বারে বারে এবং ফিরে ফিরে লিখেছেন। 'বসন্ত বারে বারেই ফুলের সমারোহ ভুলে গিয়ে শূন্য সাজি হাতে অন্যমনস্ক হয়ে উত্তরের দিকে চলে যায়, সেই ভুলের ফাঁকা রাস্তা দিয়েই ফুলের দল তাদের নব জন্মের সিংহদ্বার খোলা পায়' (পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি)। আবার আত্মপরিচয়ে রয়েছে ২০২ পৃষ্ঠা), 'পুরাতনই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন চিরনবীনতা প্রকাশ করে এই তো

বসন্তের উৎসব।' তাই কবি বসন্তের উদ্দেশ্যে শেষ কথা লিখেছেন—'এ তো বড় আশ্চর্য, তুমি বারে বারেই প্রথম (নবীন), তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম (নবীন)।' এই প্রথমার উদ্দেশ্যেই (নবযৌবনের নববসন্ত) কবি পূরবী রাগিণীতে অতীত বসন্তের (ক্ষণিকা-১৩০৭) শেষ গান গেয়ে 'শেষ বসন্তের' কাছে বিদায় নিলেন—

ফেলে দিয়ো ভোরে—গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী।

কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে এই তিনজন কাব্যলক্ষ্মী ও দুইজন প্রেরণাদাত্রী নারীর সঙ্গে কবির বিভিন্ন সম্পর্কের ধারা এবং তাঁদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা ছিলেন কবির অত্যন্ত প্রিয় নারী, এই প্রিয় নারীদের প্রেরণাই কবিকে উদ্দীপিত করে পূর্ণ বিকাশের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। তাই কবির জীবনে যে সব অসামান্যা বিদূষী নারীরা বিচিত্ররূপিণী) কবির কাব্যে, সঙ্গীতে, চিত্রকলায় প্রেরণা যুগিয়েছিলেন, সেই অসামান্যা নারীদের দান এবং কল্যাণকর্মের প্রেরণাদাত্রী (একাকিনী) শ্যামলী নারীর ভালোবাসা (অমৃতরস, স্মরণ ৫ সংখ্যক), কবি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে কাব্যের মাধ্যমে স্বীকার করে গেছেন।

"তারা মস্ত বড়ো কিছুই নয়, তারা দেখা দিয়েছে কেউ বা বনের ছায়ায়" —কবির প্রথমা প্রিয়া 'কৈশোরিকা' যিনি কবির কৈশোর জীবনে এসেছিলেন, "কেউ বা নদীর ধারে"—কবির স্নেহময়ী করুণাময়ী অসামান্যা বিদূষী, আধুনিকা নারী যিনি কবির শৈশবে (প্রাতে 'বীণা' হাতে এসেছিলেন, "কেউ বা ঘরের কোণে"—কবির প্রেয়সী পূজারিণী কল্যাণী নারী যিনি কবির যৌবনে বসন্তরাতে[২২] 'কম্পিত দীপশিখা' নিয়ে এসেছিলেন, "কেউ বা পথের বাঁকে"—কবির তপস্বিনী বিদেশী ফুল, যিনি কবির বৃদ্ধ বয়সে এসেছিলেন। কবি এই নারীদের দান স্মরণ করে তাঁদের উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন।

তোমরা এসেছ এ জীবনে
কেহ প্রাতে, কেহ রাতে, বসন্তে, শ্রাবণ-বরিষণে,
কারো হাতে বীণা ছিল কেহ বা কম্পিত দীপশিখা
এনেছিলে মোর ঘরে, দ্বার খুলে দুরন্ত ঝটিকা
বার বার এনেছ প্রাঙ্গনে। যখন গিয়েছ চলে
দেবতার পদচিহ্ন রেখে গেছ মোর গৃহতলে।
আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম,
রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম।

রবীন্দ্রনাথের যৌবনের মানসভূমি ১৮৮৪-১৯০০

ভাব কল্পনার অসম্পূর্ণ নারী—'মানসী'।

সূচনা—গাজীপুর ১৮৮৮ বৈশাখ। সমাপ্তি ২৮ অক্টোবর য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী ও আমার সুখ (১৮৯০, ১১ কার্তিক) মানসী কবিতায়।

উৎপত্তি—বাহিরে বিরহ ধ্বনি ও অন্তরে আনন্দ ধ্বনির মিলিত সুখোচ্ছ্বাসের মধ্যে (বিরহানন্দ) মানসী (মূর্তিমতী মর্মের কামনা) কাব্য গ্রন্থখানি রচিত।

পূজারিণী নারী—'ক্ষণিকা'।

সূচনা—য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি ২৬, ২৭, ২৮ আগষ্ট ১৮৯০ সাল রাত ১টা। কবি সুহৃদ লোকেন পালিতই কবির একমাত্র বন্ধু যিনি ক্ষণিকাকে সূচনায় দেখেছিলেন। এবং চিঠিপত্র ৮ম খণ্ডে প্রিয়নাথ সেনের ক্ষণিকা' সম্বন্ধে সরস মন্তব্য অনুধাবন যোগ্য। সমাপ্তি—১৩০৭ শিলাইদহে। উৎপত্তি—ক্ষণিক থেকে। কালের পটভূমিকায় (য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি) ক্ষণিকাকে সৃষ্টি করে কাব্যগ্রন্থ দুটি উৎসর্গ করলেন লোকেন পালিতকে। আর তার বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন প্রিয়নাথ সেনকে চিঠিপত্র ৮ম খণ্ডে। অসম্পূর্ণ মানসী থেকে সম্পূর্ণ ক্ষণিকা পর্যন্ত শিল্পী কবির শিল্পকর্মের সৃষ্টিভূমি এবং মানসভূমি। এবং কবির লীলালোকের লীলাক্ষেত্র যা' 'অজানার ঘের ও অপ্রকাশের পর্দা' (শেষ সপ্তক নয় সংখ্যক) দিয়ে ঘেরা।

কবির প্রকৃত জীবনী

আত্মপরিচয়—কাব্যের মাধ্যমে, অশরীরী নারীর মাধ্যমে।

অথবা ও বাংলাদেশের মেয়ে—বৃদ্ধ বয়সের অজানা মানসভূমি।

—ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া—

সেদিন অশ্রুধৌত সৌম্য বিষাদের
দীক্ষা পেলে তুমি ;
নিজের অন্তর আঙ্গিনায়
গড়ে তুললে অপূর্ব মূর্তিখানি
স্বর্গীয় গরিমায় কান্তিমতী।
যে ছিল নিভৃত ঘরের সঙ্গিনী
তার রসরূপটিকে আসন দিলে
অনন্তের আনন্দমন্দিরে
ছন্দের শঙ্খ বাজিয়ে।
আজ তোমার প্রেম পেয়েছে ভাষা,
আজ তুমি হয়েছ কবি,
ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া
বক্ষ ছেড়ে বসেছে তোমার মর্মতলে
বিরহের বীণা হাতে।
আজ সে তোমার আপন সৃষ্টি
বিশ্বের কাছে উৎসর্গ-করা।

(শেষ সপ্তক আটত্রিশ সংখ্যক)

রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধ বয়সের মানসভূমি ১৯১৪—১৯৩৫
অশরীরী নারী—'অধরা'।

অগৌরবা নারী—বলাকা পাঁচ সংখ্যক, আরোগ্য সাতাশ সংখ্যক।

সূচনা—রামগড়ে ১৯১৪—১৯১৬ বৈশাখে মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত বলাকা কাব্যগ্রন্থে।

উৎপত্তি—মৃত্যুর রূপকে ভেঙে সৃষ্টি করলেন 'ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া' অধরাকে (শেষ সপ্তক আটত্রিশ সংখ্যক, বলাকা ৪৪ সংখ্যক, বলাকা-কাব্য পরিক্রমা ১৫১ পৃষ্ঠা)।

শ্যামলী নারী—'বাংলা দেশের মেয়ে'।

সূচনা—কবির পঁচাত্তরতম জন্মদিবসে ১৯৩৫ সালে।

উৎপত্তি—শেষ বেলাকার মাটির ঘর 'শ্যামলী'-তে (শেষ সপ্তক চুয়াল্লিশ সংখ্যক)। পরিচয় দিয়েছেন শ্যামলী কাব্যগ্রন্থে 'বাঁশিওআলাতে'।

কবির প্রকৃত জীবনী

আত্মপরিচয়—কাব্যের মাধ্যমে

কবি জীবনস্মৃতিতে 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত গদ্যের মাধ্যমে রচনা করেছেন যা' কবির জীবনের ছবিমাত্র মংপুতে রবীন্দ্রনাথ। তারপর বহুজনের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি জীবনচরিত রচনা করেননি কিন্তু কাব্যের মাধ্যমে কবি-জীবনী যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাই 'আত্মপরিচয়' রূপে লিখে গেছেন। অর্থাৎ যৌবনে সংশয়ের আবেগের মধ্যে মানসী। কবি মন যে ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে সেই ভাবগুলি তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবিতায় ধরে রেখেছেন। এবং এই বিচ্ছিন্ন কবিতাগুলি একটির সঙ্গে আর একটি যুক্ত হয়ে তার তথ্যগুলোকে পদে পদে বাড়িয়ে কমিয়ে এগিয়ে চলেছে। এবং কবির জীবনের একটি পর্বের সঙ্গে আর একটি পর্ব যুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথেরই অপ্রকাশিত জীবনের কাহিনী রচিত হয়েছে (আত্মপরিচয় ১৬৭১-৭৮ পৃষ্ঠা, রবীন্দ্র রচনাবলীর ভূমিকা, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ। এই যৌবন কাহিনীই কবির 'বিস্মরণধর্মী জীবন' অথবা 'সত্যিকারের জীবন যা অপ্রকাশের পর্দার মধ্যে ও অজানার ঘেরের মধ্যেই রয়ে গেছে(মানসী পূরবী)।

আত্মপরিচয়—অশরীরী নারীর মাধ্যমে ১৮০ পৃষ্ঠা।

কবি সৃষ্ট অশরীরী নারীমূর্তি সম্বন্ধে 'আত্মপরিচয়ে যে ব্যাখ্যা করেছেন, সেই ব্যাখ্যার ভিতর দিয়েই কবি প্রচ্ছন্নভাবে নিজের জীবনী প্রকাশ করেছেন।

আত্মপরিচয়ে লিখেছেন—'কোন গীতিকাব্যরচয়িতার কোন্ কবিতা ভালো, কোনটা মাঝারি, তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখানো সমালোচকের কাজ নহে। তাহার সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্ব কোন্ বাণীরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তাহাই বুঝিবার যোগ্য। কবিকে উপলক্ষ করিয়া বীণাপাণি বাণী, বিশ্বজগতের প্রকাশ শক্তি, আপনাকে কোন্ আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই দেখিবার বিষয়।

জগতের মধ্যে যাহা অনির্বচনীয় তাহা কবির হৃদয়দ্বারে প্রত্যহ বারংবার আঘাত করিয়াছে, সেই অনির্বচনীয় যদি কবির কাব্যে বচন লাভ করিয়া থাকে—জগতের মধ্যে যাহা অপরূপ তাহা কবির মুখের দিকে প্রত্যহ আসিয়া তাকাইয়াছে, সেই অপরূপ যদি কবির কাব্যে রূপলাভ করিয়া থাকে—যাহা চোখের সম্মুখে মূর্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে তাহা যদি কবির কাব্যে ভাবরূপে আপনাকে ব্যপ্ত করিয়া থাকে—যাহা অশরীর ভাবরূপে নিরাশ্রয় হইয়া ফিরে তাহাই যদি কবির কাব্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণতালাভ করিয়া থাকে—তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সেই সফল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী। এই জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিটিকে কাব্যরচয়িতার জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা।'

রোম্যান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথ—

কারুশালা হতে তাঁর চুরি করে আনি রঙ-রস,
আনি তাঁরি জাদুর পরশ।
জানি, তার অনেকটা মায়া,
অনেকটা ছায়া।
আমারে শুধাও যবে 'এরে কভু বলে বাস্তবিক?'
আমি বলি, 'কখনো না, আমি রোম্যান্টিক' (নবজাতক)।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রোম্যান্টিক কবি। তাই কাব্যগ্রন্থে সৃষ্টি করলেন মানসী ক্ষণিকা এবং অশরীরভাবরূপে অধরা ও বাংলা দেশের মেয়ে। শিল্পী ও স্রষ্টা কবি প্রথম যৌবনে অজানার ঘেরের মধ্যে অপ্রকাশের পর্দা টেনে রূপ রস ও অনুরাগের ধারা দিয়ে অসীমের সীমাকে সৃষ্টি করলেন 'ভাব কল্পনার মানসীর মধ্যে—'আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে/গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।' কবি-কল্পনার এই অসম্পূর্ণ মানসী প্রতিমা, কবির জীবনে বহু দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও ঘাত

প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে শেষ যৌবনে 'পূজারিণী নারী' রূপে ক্ষণিকাতে সম্পূর্ণ হল (১৩০৭)। ক্ষণিকার বিনাশের পর বিরহী কবি কালের আলোতে (বলাকা ১৯১৪) মৃত্যুর রূপকে ভেঙে ধ্যানের মাধ্যমে মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় সৃষ্টি করলেন তাঁর অজানা মানসভূমি 'ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া' অধরাকে। কবি অধরাকে সৃষ্টি করে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে 'মহুয়া'তে প্রেমকে অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তিতে জাগ্রত (উজ্জীবন) করলেন। এবং তার ধ্যানের ধনখানি ও প্রেমের শাশ্বত বাণী বিশ্বের কাছে উৎসর্গ করে সীমার মধ্যে অসীমের আবির্ভাব জানালেন—

জানি না তোমার নাম
তোমারেই সঁপিলাম
আমার ধ্যানের ধনখানি ॥

উজ্জীবন (মহুয়া)—মূর্ছা বা অচৈতন্যের পর চৈতন্য লাভ। মৃত্যু হতে, ভস্ম-অপমানশয্যা হতে অতনুকে (প্রেমকে) বীরের তনুতে 'উজ্জীবন' (জাগ্রত) করে 'অসমাপ্ত' 'বরণডালা' খানি আবার নূতনভাবে সাজালেন। আর অতীত 'বসন্তে'র শ্যামাসুন্দরীকে (কৃষ্ণকলি—ক্ষণিকা) নব পরিচয়ে নব রূপে 'বোধন' করে কবি নূতনভাবে যাত্রা সুরু করলেন (২২ ফাল্গুন ১৩৩৭ দোল পূর্ণিমা)।

কবি দিনশেষের ধূসর সন্ধ্যার ম্লান আলোর মধ্যে বসন্তের নবজাগরণের ছবিটি এঁকে অতীত বসন্তকে (কড়ি ও কোমল, ক্ষণিকা) নব পরিচয়ে নব রূপে 'পুনরুজ্জীবিত' করলেন। তাই মহুয়া কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদপটে একদিকে রয়েছে দিনশেষের ম্লান আলোর মধ্যে কবির নামটি, অন্যদিকে রয়েছে বসন্তের (সবুজ রং) নব জাগরণের মধ্যে (উজ্জীবন) 'মহুয়া' নামটি—

কানে কানে কহি তোরে
বধূরে যেদিন পাব, ডাকিব মহুয়া নাম ধরে।

কবির শেষ জীবনে এই অধরাই আবার প্রথম যৌবনের 'বাংলা দেশের মেয়ে' রূপে দেখা দিল (১৯৩৫, ২৫ বৈশাখ)। কবি প্রথম যৌবনের ভাব কল্পনার মানসী ও পূজারিণী নারী ক্ষণিকাকে অশরীরী নারী রূপে রূপান্তরিত করে তাকে নানাভাবে সাজিয়ে কবির কাব্যে অপরূপ নারী মূর্তিতে সম্পূর্ণ করে তুলেছেন।

'এঁকেছি বুকের রক্তে মানসীর ছবি বার বার
ক্ষণিকের পটে'

রোম্যান্টিক প্রেমিক—কল্পনাপ্রবণ, রোম্যান্টিক প্রেমিক (নবজাতক) শিল্পী রবীন্দ্রনাথ নিজের এই সৃষ্টি কর্মের বিশ্লেষণ করে পশ্চিম-যাত্রীর-ডায়ারিতে ৫৭১ পৃষ্ঠা লিখেছেন—'মেয়েদের সৃষ্টির আলো যেমন এই প্রেম তেমনি পুরুষের সৃষ্টির আলো কল্পনাবৃত্তি। পুরুষের চিত্ত আপন ধ্যানের দৃষ্টি দিয়ে দেখে, আপন ধ্যানের শক্তি দিয়ে গড়ে তোলে। We are the dreamers of dreams— এ কথা পুরুষের কথা। পুরুষের ধ্যানই মানুষের ইতিহাসে নানা কীর্তির মধ্যে নিরন্তর রূপপরিগ্রহ করছে। এই ধ্যান সমগ্রকে দেখতে চায় বলেই বিশেষের অতিবাহুল্যকে বর্জন করে; যে-সমস্ত বাজে খুঁটিনাটি নিয়ে বিশেষ, সেইগুলো সমগ্রতার পথে বাধার মতো জমে ওঠে।'

'পুরুষের এই সমগ্রতার পিপাসা তার প্রেমেও প্রকাশ পায়। সে যখন কোনো মেয়েকে ভালোবাসে তখন তাকে একটি সম্পূর্ণ অখণ্ডতায় দেখতে চায় আপনার চিত্তের দৃষ্টি দিয়ে, ভাবের দৃষ্টি দিয়ে। পুরুষের কাব্যে বার বার তার পরিচয় পাওয়া যায়। শেলির এপিসিকীডিয়ন্ পড়ে দেখো।'

আবার বহু বৎসর পূর্বে ছিন্নপত্রেও (১৯৭ পরিচ্ছেদ) কবি একই কথা লিখেছেন—'সেদিন শঙ্করাচার্যের আনন্দলহরী বলে একটা কাব্যগ্রন্থ পড়ছিলুম, তাতে সে সমস্ত জগৎসংসারকে স্ত্রী মূর্তিতে দেখছে—চন্দ্র সূর্য আকাশ পৃথিবী সমস্তই স্ত্রী সৌন্দর্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে—অবশেষে সমস্ত বর্ণনা সমস্ত কবিতাকে একটা স্তবে একটা ধর্মোচ্ছ্বাসে পরিণত করে তুলেছে। বিহারী চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল সংগীতটাও ঐ শ্রেণীর। শেলির এপিসিকীডিয়নেরও ঐ অর্থ। কীট্সের অধিকাংশ কবিতা পড়লে মনে ঐ ভাবটার উদ্রেক হয়।'

কবির গীতিকাব্যেও এই ভাবটাই রয়েছে। তাই শ্রেষ্ঠ প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ চিত্তের দৃষ্টি দিয়ে ভাবের দৃষ্টি দিয়ে অনুরাগের ধারা দিয়ে নব যৌবনের শরৎ-পর্যায়ের শরৎ-লক্ষ্মীর বন্দনা করেছেন মানসী মূর্তিতে এবং দূরের শরৎ কালের স্মৃতি বার বার উল্লেখ করেছেন তাঁর 'পথে ও পথের প্রান্তে'। আর, ক্ষণিকার পরবর্তী অধ্যায়ে শ্যামলী নারীর সৌন্দর্যকে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ দিয়ে বিশ্বলক্ষ্মীরূপে বন্দনাকরেছেন তাঁর কাব্যে সাহিত্যে ও গানে—

'গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মী হয়ে।'

রবীন্দ্রকাব্যে অশরীরী নারী 'অধরা'—কবির ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া (শেষ সপ্তক আটত্রিশ সংখ্যক)—বৃদ্ধ বয়সের অজানা মানসভূমি।

উৎপত্তি—বলাকা কাব্যগ্রন্থে মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় (১৯১৪)। কবি মৃত্যুর রূপকে ভেঙে সৃষ্টি করলেন অরূপ নারী অধরাকে—

মৃত্যু যে তার পাত্রে বহন করে
অমৃত রস নিত্য তোমার তরে,
বসে আছে মানিনী তোর প্রিয়া
মরণ-ঘোমটা টানি।
সেই আবরণ দেখ্‌রে উতারিয়া—
মুগ্ধ সে মুখখানি। (বলাকা ৪৪ সংখ্যক)।

রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় অধরার পরিচয় পাওয়া যায়। শেষ সপ্তক তেরো সংখ্যক, আটত্রিশ সংখ্যক, মাটিতে আলোতে (বীথিকা), শেষ দৃষ্টি (নব জাতক), দূরের গান, অধরা (সানাই), দ্বৈত (শ্যামলী), জন্মদিন (সেঁজুতি), আরোগ্য সাতাশ সংখ্যক, জন্মদিন নয় ও এগারো সংখ্যক প্রভৃতি কবিতায় মরণ-ঘোমটায় আবৃত (মুখ ঢাকা বধূ) মানিনী প্রিয়ার কাহিনী (কবিপ্রিয়া-উর্মিলা দাশ ৪৩ পৃষ্ঠা) প্রচ্ছন্ন ভাবে রয়েছে। যাঁকে কবি নামের বাঁধনে বেঁধে দিতে চেয়েছিলেন আরোগ্য সাতাশ সংখ্যক কবিতায়—

বাক্যের যে ছন্দোজাল শিখেছি গাঁথিতে
সেই জালে ধরা পড়ে
অধরা যা চেতনার সতর্কতা ছিল এড়াইয়া
অগোচরে মনের গহনে।
নামে বাঁধিবারে চাই, না মানে নামের পরিচয়।
মূল্য তার থাকে যদি
দিনে দিনে হয় তাহা জানা
হাতে হাতে ফিরে।

কণিকার বিনাশের পর কবি 'ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া' অধরাকে সৃষ্টি করে বিশ্বের কাছে উৎসর্গ করে দিলেন—

ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া
বক্ষ ছেড়ে বসেছে তোমার মর্মতলে
বিরহের বীণা হাতে।
আজ সে তোমার আপন সৃষ্টি
বিশ্বের কাছে উৎসর্গ করা।

কবি নিজেকে বিরহী যক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন—

হে যক্ষ, সেদিন প্রেম তোমাদের
বদ্ধ ছিল আপনাতেই
পদ্ম কুঁড়ির মতো

বিরহী যক্ষ যেমন রামগিরিতে নির্বাসিত হয়েছিল, বিরহী কবিও তেমনি রামগড়ে ব্যথার মধ্যে সৃষ্টি করলেন তাঁর 'ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া অধরাকে'।

এই অধরাই বিচিত্রিতাতে কবির 'ছায়াসঙ্গিনী' রূপে বর্ণিত হয়েছে। অশরীর ভাবরূপে স্বপ্ন রুদ্ধ (স্বপ্ন ঘেরা) বাণী নিয়ে এবং অভিমানের অশ্রুজল নিয়ে (স্তম্ভিত স্তিমিত) যিনি কবির কাব্যে ও জীবনে ছায়ার মতন ফেরেন তিনিই ছিলেন কবির 'ছায়াসঙ্গিনী' (মুখ ঢাকা বধূ) অথবা জীবনের প্রথমা ফাল্গুনী (বসন্তের প্রথমা নারী)। 'দ্বারে' কবিতায় লিখেছেন, এই স্বল্পভাষী (মৌন ভাষা-মানসী) অভিমানী নারীর চোখের জলই অজ্ঞাত কাঁদন) সূক্ষ্মতম আচ্ছাদনের মতো কবির জীবন ও কাব্যকে কঠিন ভাবে বেঁধে রেখেছিল। এই কারণেই পরবর্তী জীবনে মন চাইলেও কবি দূরের ডাকে সাড়া দেন নি (শুধু দেখার স্মৃতি নিয়েই চলে এসেছিলেন)।

'সূক্ষ্মতম সেই আচ্ছাদন,
ভাষাহারা অশ্রুহারা অজ্ঞাত কাঁদন।
দুর্লঙ্ঘ্য—যে সেই মানা
স্পষ্ট যারে নেই জানা।
সবচেয়ে সুকঠিন অবন্ধ বাঁধন' (দ্বারে-বিচিত্রিতা)।

আবার বলাকা ৪২, ৪৩, ৪৪ সংখ্যক কবিতায় কবি নিজেরই অন্তরের গভীরতম কথা প্রচ্ছন্ন ভাবে কবিতায় লিখে গেছেন।

'অর্ধরাতে দেখা দিবে বারেবারে তারি মুখ নিদ্রাহীন চোখে
রজনীগন্ধার গন্ধে তারার আলোকে।
বারে বারে-ফিরে-যাওয়া অন্ধকারে বাজিবে হৃদয়ে
বারেবারে-ফিরে আসা হয়ে।'

অধরা—যাহাকে ধরা যায় নাই। কবিকে যেমন কোনো নারী বেঁধে বা ধরে রাখতে পারেন নি, কবিও তেমনি অধরাকে ধরতে পারেন নি, তিনিও কবির কাছে চিরকাল বিদেশিনীর মতো অপরিচিতা ও অচেনা হয়ে রয়ে গেলেন (ছিন্ন-পত্র ১৩০ সংখ্যক)। কবি বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা (৮০ পৃষ্ঠা) অধরার উদ্দেশ্যে

বলেছেন—'এই না-ধরা দেওয়া বনের হরিণকে বাঁধতে গিয়ে রামচন্দ্র কম দুঃখ পান নি। ঘরের লক্ষ্মী হারিয়ে বনে বনে কেঁদে বেরিয়েছেন। এই সব অধরাকে ধরতে গিয়ে হতভাগা কবিদেরও কম দুর্দশা পেতে হয় না। আমার মনের কথা মনেই রইল। Subjective কে Objective করা গেল না। লোহিত সাগরের দিকে যাচ্ছিলাম। অপরূপ সূর্যাস্ত হলো। মনে হোলো এমন অপরূপ রমণীয় তাকে তো ধরা গেল না। এই চঞ্চলাকে যে ধরতে পারলাম না সেই বেদনা ক্রমাগত মনকে ব্যথা দিতে লাগল।'

তাই পরবর্তীকালে কবি লোহিত সাগরের এই সূর্যাস্তের রং ধরে রাখলেন চিত্রকলায়—নিজের বেদনার্ত প্রতিকৃতিতে এবং বিষন্ন নারীমূর্তির মুখের উপরে 'এই আলো এই শান্তি কেবল চেয়ে দেখবার এবং মুগ্ধ হবার জন্যে নয়, কিন্তু মানুষের ভালোবাসার উপরে এই আলো ফেলবার জন্যে' (য়ুরোপ-যাত্রীর-ডায়ারী) এবং অধরাকে ধরে রাখলেন ছন্দের বাঁধনে—

অধরা মাধুরী ধরা পড়িয়াছে
এ মোর ছন্দবন্ধনে।

যদিও কবি অধরাকে ছন্দের বাঁধনে ধরে রেখেছেন, কিন্তু বিশ্বের কাছে তিনি অখ্যাতা, অনাদৃতা নারী হয়ে রয়ে গেলেন। এই অখ্যাতা নারীর দানই কবির সাহিত্যের 'ভাষা মহাদ্বীপে প্রাণহীন প্রবালের মতো' রয়ে গেল।

অকস্মাৎ পরিচয়ে বিস্ময় তাহার
ভুলায় যদি বা,
লোকালয়ে নাহি পায় স্থান,
মনের সৈকততটে বিকীর্ণ সে রহে কিছুকাল,
লালিত যা গোপনের
প্রকাশ্যের অপমানে
দিনে দিনে মিশায় বালুতে।
পণ্যহাটে অচিহ্নিত পরিত্যক্ত রিক্ত এ জীর্ণতা
যুগে যুগে কিছু কিছু দিয়ে গেছে অখ্যাতের দান
সাহিত্যের ভাষা—মহাদ্বীপে
প্রাণহীন প্রবালের মতো।

বিশ্বযুদ্ধ—মহাযুদ্ধের পটভূমিকাতে কবি রামগড়ে সৃষ্টি করলেন অজানা মানসভূমি অধরাকে। বলাকায় তাঁর কাব্যজগতের ধ্বংসপ্রাপ্ত মানসভূমিকে

বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় রেখে বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পুরাতন মতবাদ ও প্রাচীন সংস্কার সব পরিত্যাগ করে মানব জাতির নব যুগের অরুণোদয়ের যে আভাস পূর্বাকাশে দেখা দিয়েছিল, সেই যুগসন্ধির বিশ্লেষণের মাধ্যমে কবি তুলনা করেছেন তাঁর কাব্যজগতের বিরহী কাব্যতরণীকে (বলাকা ৫ নং)।

বলাকা কাব্যগ্রন্থ—অথরার সূচনা—মহামানব রবীন্দ্রনাথ।

রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায় ;
সত্য যে কঠিন (সত্য প্রেম-মংপুতে রবীন্দ্রনাথ)
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।

ক্ষণিকার বিনাশের পর কবি শূন্য মন (উৎসর্গ ২৩ সংখ্যক), ও শূন্য কাব্যতরণী (বিরহী নেয়ে—বলাকা পাঁচ সংখ্যক) নিয়ে একটা ব্যথার মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন। কবি লিখেছেন—'মীরা ও বৌমা আছেন সঙ্গে। আমার মনের মধ্যে একটা দারুণ বেদনা। সে সব কথা তাঁরা জানবেন কেমন করে? তার কিছু খবর জানতেন এণ্ড্রুজ সাহেব। তিনি যখন রামগড়ে আমার কাছে এসে আমার অন্তরের কথা জিজ্ঞাসা করলেন তখন আমি আমার বেদনা তাঁকে জানালাম।' কবির এই বেদনার মধ্যেই যুদ্ধের বার্তা এসে কবিকে আরও ব্যথিত করে তুলেছিল। কবির কাব্যজগতের সর্বনাশের সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধের সর্বনাশ ও একই সঙ্গে উপস্থিত হল। 'অন্তরে বা বাহিরে যদি সে সর্বনেশে আসে তবে কেমনতরো হবে তার অভ্যর্থনা?' অন্তরের মৃত্যুযুদ্ধ এবং বাইরের বিশ্বযুদ্ধ এই দুইএর বেদনার মধ্যেই বলাকা কাব্যগ্রন্থখানির সৃষ্টি। বলাকাতে কবি, কাব্যজগতের ধ্বংসপ্রাপ্ত মানসভূমিকে বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় রেখে বিশ্লেষণ করেছেন। বলাকা-কাব্য-পরিক্রমার গ্রন্থ ভূমিকায় (৬৩ পৃষ্ঠায়) বলেছেন—'এই কবিতায় আমার কথা, আমার ধ্বনিকে চাপা দিয়ে, তাঁর ধ্বনিই জয়ী হয়েছে। বিশাল পদ্মার কূলভাঙা বিপুল জলরাশি

যেন একটা সংকীর্ণ খালের দুইকূল ভেঙেচুরে তার উপর দিয়ে ভীষণভাবে বয়ে গেল। তেমনি আমার ছোট কথা, আমার সুখদুঃখ, আমার ছোট আয়োজন সব উলট-পালট করে দিয়ে বিশ্ববিধাতা তাঁর বিশ্ববাণী বাজিয়ে নিলেন।'

বলাকাতেই কবি প্রথম মৃত্যুজনিত দুঃখ বেদনার মধ্যে আসন্ন নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয়ের আভাস পেলেন। সেজন্য তাঁর মনের মধ্যে একটা অকারণ উদ্‌বেগ ও উৎকণ্ঠা ছিল। বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা গ্রন্থ-ভূমিকায় বলেছেন 'মানবাত্মার নতুন অভিযান (adventure) যে আসচে তার সূচনা যেন পাচ্ছি। অনেক দুঃখের এই অভিযান, বহু দুঃখ-বেদনা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই অরুণোদয়। হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করে দিয়ে এই নবারুণের অর্ঘ্য রচনা করতে হবে। ভয় পেলে চলবে না। এই অর্ঘ্য রচনা করতেই হবে। সর্বনেশে যুগ-সন্ধি সমাগত। প্রিয়তম পতিকে গ্রহণ করতে হলে নববধূকে যেমন পিতৃগৃহের সব কিছু অতিপ্রিয় অভ্যস্ত সর্ববিধ আচার-বিচার-আরাম ছেড়ে নবরক্তপট্টাম্বরে অজানা সংসার-যাত্রার জন্য ঘরের বাইরে প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াতে হয়, তেমনি আমাদেরও আজ শুধু পুরাতন মতামত নয় প্রাচীন সব আচার-বিচার-সংস্কার ত্যাগ করে যুগ-যুগান্তরের কর্ণধার পতির হাত ধরে অজানার পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতে হবে।' কবি ২য় নং কবিতায় আরও ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। 'আজ দুঃখের মরণের আহ্বানে নিরুদ্দেশের ডাক সেই অপরিচিত জরাজীর্ণ অভ্যাসের মূলোচ্ছেদ হল। চিরপরিচিত সংস্কারের ভিত হল অভ্যস্ত নির্দিষ্ট আশ্রয়।'

মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় মানবাত্মার সঙ্গে কবির অন্তরাত্মারও চিরপরিচিত জরা-জীর্ণ সংস্কারের মূলোচ্ছেদ করে নূতন অভিযানের কথা বিশ্লেষণ করেছেন। কবি এই প্রথম তাঁর অন্তরাত্মাকে পরিচিত মানসভূমি (নির্দিষ্ট আশ্রয়) থেকে অপরিচিত অজানা মানসভূমির দিকে নিয়ে গেলেন এবং এই আনন্দ যাত্রায় প্রেমের অর্ঘ্য দিয়ে তাঁর শূন্য কাব্যতরণীকে (বিবহী নেয়ে বলাকা ৫ নং কবিতা) পূর্ণ করলেন। কবির অন্তরাত্মার পরিচিত মানস ভূমি ত্যাগ করে অপরিচিত অজানা মানসভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রাকে পতিগৃহে যাত্রার সঙ্গে তুলনা করেছেন। একেই তাঁর কাব্য জগতের 'সর্বনেশে যুগ সন্ধি সমাগত' বলে লিখেছেন। এই নূতন সৃষ্টি অজানা মানসভূমি 'অশরীরী নারী অধরার' জন্য কবির উদ্‌বেগ ও উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না কারণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও জীবনে দেখা যায় জীবিত নারীরাই ছিলেন কবির কাব্যলক্ষ্মী ও প্রেরণাদাত্রী। তাই কড়ি ও কোমলে কবি মৃত্যু দুঃখের মধ্যেও পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নূতনের উদ্দেশ্যে লিখেছেন—

সে কি চায় শুষ্ক বনে গাহিবে বিহঙ্গগণে
আগে তারা গাহিত যেমন?
আগেকার মতো করে স্নেহ তার নাম ধরে
উচ্ছ্বসিবে বসন্ত পবন?
নহে নহে সে কি হয়! সংসার জীবনময়
নাহি হেথা মরণের স্থান।
আয় রে নূতন আয়, সঙ্গে করে নিয়ে আয়,
তোর সুখ, তোর হাসি গান।

কিন্তু ক্ষণিকার বিনাশের পর কবির কেবল মতামত নয় প্রাচীন সংস্কার প্রভৃতি যা কিছু প্রিয়, সব পিতৃগৃহের মতো ত্যাগ করে নবরক্তপট্টাম্বরে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে অশরীরী অদেখা দূত অধরাকে গ্রহণ করলেন। এই অধরাই এবার কবির কাব্যলক্ষ্মী ও প্রেরণাদাত্রী হয়ে 'সজলনীল-জলদবরণ বসনখানি গায়ে' দিয়ে (শ্যামলী নারী) 'মুখ ঢাকা বধূ সেজে' গোপনে দেখা দিলেন। এটাকেই কবি অপরিচিত সর্বনেশে বলে উল্লেখ করেছেন; অজানা বলে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। বলাকার কয়েকটি কবিতা কবি রামগড়ে রচনা করেন। তিনি লিখেছেন '৫ই জ্যৈষ্ঠ হতে ১২ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে আমার দুই, তিন চার নম্বর কবিতা একে একে এলো। বলাকার মতোই একে একে এরা আমার মানসলোক হতে বেদনাহত হয়ে কোন্ নিরুদ্দেশে যাত্রা করেছে। এদের মধ্যেও ভিতরে ভিতরে বলাকার মতোই একটি পংক্তিগত যোগ রয়েছে তাই এই কবিতাগুলির বলাকা নাম সার্থক হয়েছে।'

চিত্রা এবং বলাকা এই দুই কাব্যগ্রন্থ কবির জীবনে ও কাব্যে তাঁর গতি পরিবর্তনের নির্দেশক রূপে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। চিত্রা কাব্যগ্রন্থটি যেমন মানসীর অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে বাস্তবের আঘাতে মুক্ত হয়ে সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছিল (আত্মপরিচয় ২০৩, ২০৪ পৃষ্ঠা), তেমনি বলাকা কাব্যগ্রন্থটি কবিকে স্থির প্রতিজ্ঞ হয়ে অস্পষ্ট আহ্বানের পথে অধরার উদ্দেশ্যে এবং মৈত্রী ও মানবকল্যাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। 'বলাকা' নামের মধ্যে কবির এই ভাবটি নিহিত রয়েছে, যে, হংস বলাকা তাদের পরিচিত বাসা ছেড়ে পথহীন সমুদ্রের উপর দিয়ে কোন সিন্ধুতীরে অন্য এক বাসার দিকে উড়ে চলেছে, সেই ভাবে কবিও পরিচিত মানসভূমিকে ছেড়ে অশরীরী নারী অধরার উদ্দেশ্যে, অজানা মানসভূমিতে পাড়ি দিলেন। বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা ৩৬ নং কবিতায়

রয়েছে—'বিশ্বের যা কিছু সবই বলাকার মত উড়ে চলেছে, আমার আপন অন্তরের সব আশা আকাঙ্ক্ষাও তখন সেই সঙ্গে উধাও হয়ে চলেছে। এরা সব কোথায় চলেছে কে জানে? আমি বসে বসে নিখিলের সব পাখার ঝাপটে একই বাণী শুনচি।'

হেথা নয়, হেথা নয়
আর কোনো খানে।

'হেথা নয়' তো বুঝলাম; কিন্তু সেই 'আর কোনো খান' যে কোথায় তা কে জানে? (কবির মন্তব্য)।

বলাকার পাখার ঝাপটের শব্দে নিখিলের স্তব্ধতাকে ভেঙে যে গতির বাণী ছুটে চলে গেল, সেই পাখার তরঙ্গাঘাত কবির অন্তরে বেগের সঞ্চার করে কবির মনে চলার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিল। রবীন্দ্রনাথ চিরকাল গতির উপাসক, তাই তাঁর কাব্যেও ধরা পড়ে এই গতির বাণী। প্রথমবার এই গতি কিছুটা ব্যহত হয় কল্পনার 'দুঃসময়ে'। সেই সময় কবি লিখেছেন—'বন্ধ করো না পাখা'। (বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা ১৯ পৃষ্ঠা)। আবার এই গতি রুদ্ধ হয়ে আসে গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি কাব্যগ্রন্থ লেখার পরেই। তাই কবি ব্যথার মধ্য দিয়ে বলাকাতে মৃত্যুর রূপকে ভেঙে তাকে নব নব রূপে রূপান্তরিত করে তাঁর কাব্যের গতিকে প্রবাহিত করে দিলেন। এবং বিশ্ব ও বিশ্বমানবের কল্যাণধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অসীমে উপনীত হলেন।

'মৃত্যুর মধ্যে ডুব দিয়েই সীমা পায় অসীমত্বের অমৃত আশীর্বাদ। মৃত্যুর ভয়ে রূপ যদি তার গতি ছেড়ে দিয়ে অচল স্থবির হয়, যদি সে তার জীবন-প্রবাহ-তারল্য (fluidity) হারায়, তবেই তার সর্বনাশ। সেইখানেই তার অচল সমাধি। মৃত্যুই জরাজীর্ণ জীবনকে বার বার মুক্তি দিয়ে নতুন করে দেয়। মানব-ইতিহাসে দেখা যায় গতি যখনই প্রথায় বন্ধ হয় তখনই প্রলয় এসে সেই বন্ধন ঘুচে দেয়। এরই নাম নবযুগ। সীমা ছাড়া অসীমের প্রকাশ অসম্ভব। অথচ একটি বিশেষ সীমার মধ্যেই অসীম-প্রকাশের চরম সার্থকতা নেই। রূপের মধ্যে যখন সে বন্ধ হয় তখন মৃত্যুই সেই বাধা ভেঙে দিয়ে অসীমের গতিকে নবরূপে সঞ্চালিত করে। সীমার বেড়াভাঙা হল উল্টো (Negative) দিক্। বেড়া ভেঙে নবজীবনের নবীন আনন্দে প্রবাহিত হওয়াই হল তার সোজা (Positive) দিক্' (বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা ১৫১ পৃষ্ঠা, আত্মপরিচয় ১২৬ পৃষ্ঠা, ২০১, ২০২ পৃষ্ঠা)। অর্থাৎ ক্ষণিকাকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অশরীরী নারী অধরাতে রূপান্তরিত করে তাঁর কাব্যের প্রবাহকে

পুনঃ প্রবর্তিত করলেন। এবং মৈত্রী ও মানব কল্যাণের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে অসীমে উপনীত হলেন। কবি এভাবেই সীমার বেড়াকে ভেঙে (মৃত্যুর রূপকে ভেঙে) অসীমের গতিকে নব রূপে সঞ্চালিত করে কাব্যের নবযুগের সূচনা করলেন। আর, একেই তার কাব্যের নবযুগ বলে অভিহিত করেন।

বলাকার পঞ্চম কবিতাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই কবিতাটি মহাযুদ্ধের খবর পাবার পরে লেখা. তাই কবি এই কবিতাটি মহাযুদ্ধের পটভূমিকার উপর লিখে তাঁর কাব্যের নব যুগের সূচনা করলেন (৫ ভাদ্র ১৩২১ কলিকাতা)। এই কবিতায় কবি বিরহী নেয়েকে (শূন্য কাব্য তরণী অথবা কাব্যলক্ষ্মীবিহীন কাব্য তরণী) নিয়ে মৃত্যু যুদ্ধের ভিতর দিয়ে পাড়ি দেওয়াকে বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবির জীবন যেমন মৃত্যুঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে নিঃসম্বল ও নিঃসহায় অবস্থায় (উৎসর্গ ৪১ সংখ্যক) মৈত্রী ও কল্যাণবার্তার পতাকা বহন করে একাকী পাড়ি দিচ্ছে, তাঁর কাব্যতরণীও ঠিক সেই ভাবেই অকূল সমুদ্রের মৃত্যু ঝটিকার উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়ে দিশাহারা হয়ে একটি অস্পষ্ট আহ্বানের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁর কাব্যতরণী এগিয়ে চলেছে সেই অগৌরবার উদ্দেশ্যে যে তারি জন্য অচেনা আঙ্গিনাতে পূজার বাতি জ্বালিয়ে ভাঙা ঘরে অপেক্ষা করে রয়েছে। কবির কাব্যতরণী এবার রজনীগন্ধার গুচ্ছ নিয়ে আনমনে গান গেয়ে মৃত্যুযুদ্ধের ভিতর দিয়ে 'তোমরা যাহার নাম জান না'[২১] সেই অখ্যাতা[২২] অগৌরবার উদ্দেশ্যে মত্ত (মৃত্যু) সাগর পাড়ি দিচ্ছে। কবির এই কাব্যতরণী (বিরহী নেয়ে) বহুকাল আগে ক্ষণিকার আমলে শ্যামলী নারীকে (সজলনীল জলদবরণ) নিয়ে প্রথম যাত্রা সুরু করেছিল (যাত্রী—ক্ষণিকা ১৩০৭ শিলাইদহ)। এখন সে মৃত্যুতরঙ্গের ভিতর দিয়ে অকালে অদিনে সবার অগোচরে গৌরবহীনা পূজারিণী নারীর উদ্দেশ্যে প্রেমের পুষ্পমালা নিয়ে আসছেন। তাঁর এই আগমন কেউ জানতেই পারবে না কারণ তাতে কোনো সমারোহ হবে না, তার উদ্দেশ্যে কোন তূর্যধ্বনিও বাজবে না। শুধু সেই পূজারিণী নারীর সব দৈন্য ধন্য হবে চিরদিনের সন্দেহ (অভিমান) দূর হয়ে যাবে এবং অন্ধকার কেটে গিয়ে তার ঘর আলোতে ভরে উঠবে। রবীন্দ্রনাথের খেয়া কাব্যগ্রন্থের মধ্যে যে অভাগিনী নারী মলিন বেশে 'প্রচ্ছন্ন'[২৩] (খেয়া) হয়ে সবার পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন, বলাকায় সেই 'প্রচ্ছন্ন' নারীর উদ্দেশ্যে কবি প্রেমের পুষ্পহার নিয়ে বেরুলেন (বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা ১০৪, ১০৫ পৃষ্ঠা)।

রবীন্দ্রকাব্যে শ্যামলী নারী—বাংলা দেশের মেয়ে

(শেষ সপ্তক, শ্যামলী)।

উৎপত্তি—কবি শেষ যৌবনে অশরীরী নারীমূর্তিকে আবার প্রথম যৌবনের বাস্তব নারীতে রূপান্তরিত করে নূতন নাম দিলেন 'বাংলা দেশের মেয়ে' অর্থাৎ গ্রাম বাংলার মেয়ে যার উৎপত্তি 'শেষ সপ্তক' কাব্যগ্রন্থে—

অধরা ছিল তোমার দূরে চাওয়া চোখের
পল্লবে,
অধরা ছিল তোমার কাঁকন পরা নিটোল হাতের
মধুরিমায়।
ওকে ভিক্ষে দিলে পাঠিয়ে
ও গেল চলে,
জানলে না এইখানে তোমারই কথা।

এই রূপ পরিবর্তিত নারীমূর্তির উদ্দেশ্যে কবি পশ্চিম যাত্রীর-ডায়ারিতে লিখেছেন (৫৪৪ পৃষ্ঠা) 'এই হারিয়ে যাওয়ার ভিতর দিয়ে এক যখন আর সেজে এসে হাজির হয় তখন তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তিওআলা বৈজ্ঞানিক যদি সওয়াল জবাব করতে শুরু করে, তা হলে মুশকিল। তখন বিশ্লেষণের চোটে বেরিয়ে পড়তে পারে যেটাকে নতুন বলছি সেটা পুরোনো, যেটাকে আমার বলছি সেটা আর কারোও। কিন্তু, সৃষ্টির তো এই লীলা, এই জন্যেই তো তাকে মায়া বলে।'

সূচনা—কবির শেষ সৃষ্টি 'বাংলা দেশের মেয়ের' রূপ দিলেন কবির পঁচাত্তরতম জন্মদিনে ১৯৩৫ সালে শান্তিনিকেতনে, তাঁর শেষ বেলাকার মাটির ঘর 'শ্যামলীতে' (শেষ সপ্তক চুয়াল্লিশ সংখ্যক)। এই 'বাংলা দেশের মেয়েকেই' কবি ভালোবেসেছেন অর্থাৎ কবি ভালোবেসেছেন গ্রাম বাংলার শ্যামলী মেয়েকে—

যে দেখায় সে আমার চোখ ভুলিয়েছে
তাতে আছে যেন এই মাটির শ্যামল অঞ্জন,
ওর কচি ধানের চিকন আভা।

কবি 'শ্যামলীর' গৃহপ্রবেশের আগেই শ্যামলী সম্বন্ধে কবিতাটি লিখে শেষ সপ্তকে প্রকাশ করলেন। শেষ সপ্তক কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ খ্রী. ২৫ বৈশাখ কবির ৭৫তম জন্মদিনে। কবির ৭৫তম জন্মদিনের কবিতায় (শেষ সপ্তক তেতাল্লিশ সংখ্যক) নিজের জীবন কাহিনী উদ্ধৃত করে সাতাশের তরুণ কবির

প্রথম বাসন্তীরঙের জন্মদিনের উৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন। এবং শেষ সপ্তক চুয়ালিশ সংখ্যকে বাংলা দেশের মেয়েকে সৃষ্টি করে শ্যামলী কাব্যগ্রন্থের বাঁশিওআলাতে তার পরিচয় দিয়েছেন। পত্রপুট ও শেষ সপ্তক কাব্যগ্রন্থ-দুটি কবির নিজেরই জীবন কাহিনী।

কাব্যগ্রন্থ—শ্যামলী

কবি 'শ্যামলী নারী বাংলা দেশের' মেয়ের রূপকে গড়ে তুলে দুয়ের গ্রন্থিতে বেঁধে দিলেন শ্যামলী কাব্যগ্রন্থের দ্বৈত' কবিতায়।

আমি তোমার কারিগড়ের দোসর
কথা ছিল তোমার রূপের 'পরে মনের তুলি
আমিও দেব বুলিয়ে,
পুরিয়ে তুলব তোমার গড়নটিকে।

কবির প্রথম যৌবনের প্রথম সৃষ্টি অসম্পূর্ণ মানসীকেই কবি শেষ বয়সে নূতন ভাবে বাস্তব নারীতে গড়ে তুলে নাম দিলেন 'বাংলা দেশের মেয়ে' এবং পরিচয় দিলেন বাঁশিওআলাতে।

বাঁশিওআলা—গীতিকার ও সুরকার রবীন্দ্রনাথ

(১৬ জুন ১৯৩৬)। কবি বাংলা দেশের মেয়ের চরিত্রকে রূপায়িত করে তার পরিচয় দিয়েছেন বাঁশিওআলাতে।

"ওগো বাঁশিওআলা
বাজাও তোমার বাঁশি
শুনি আমার নূতন নাম"
—এই বলে তোমাকে প্রথম চিঠি লিখেছি
মনে আছে তো?
আমি তোমার বাংলা দেশের মেয়ে।

কবির এই শ্যামলী নারী 'বাংলা দেশের মেয়ে' যিনি ঘরে কাজ করেন শান্ত হয়ে এবং 'সবাই বলে ভালো'[২৪] তিনিই পরবর্তীকালে অন্ধকার ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে এসে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিলেন।

তোমার ডাক শুনে একদিন
ঘরপোষা নির্জীব মেয়ে
অন্ধকার কোণ থেকে

বেরিয়ে এল ঘোমটা-খসা নারী।
যেন সে হঠাৎ-গাওয়া নতুন ছন্দ বাল্মীকির,
চমক লাগল তোমাকেই।

কবি বাঁশিওআলাতে নিজের ও বাংলা দেশের মেয়ের পরিচয় দিয়েছেন। বাঁশিওআলা—রবীন্দ্রনাথ। প্রাণরঙ্গভূমিতে ছিলুম বাঁশি বাজিয়ে (শেষ সপ্তক ছয়)।

প্রাণরঙ্গভূমি—অন্তর লোকের নাট্যশালায়।

বাঁশি বাজিয়ে—কবি, গীতিকার ও সুরকার।

কবি নিজের পরিচয় নিজেই দিয়েছেন। কবি বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে কবিতা গান ও সুর রচনা করেছেন। তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে গানের অংশই বেশী, তাই কাব্যগ্রন্থের নামকরণের মধ্যে সংগীত কথাটা যুক্ত। কবিতাই সংগীতে পরিবর্তিত হয়েছে আবার সংগীতেও কাব্যের রস পাওয়া যায়। দুটো ধারা একই সঙ্গে প্রবাহিত হয়েছে এবং তারই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রেমের ধারা। এই প্রেম সংগীত (আনন্দ সংগীত ও ব্যথার সংগীত) বিশ্বমানবের কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অসীমের দিকে ধাবিত হয়েছে। এই সংগীতই তিনি বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে রচনা করেছেন, আর রচনা করেছেন বাংলা দেশের মেয়ের উদ্দেশ্যে—

সে নামবে না গানের আসন থেকে
সে লিখবে তোমাকে চিঠি
রাগিণীর আবছায়ায় বসে।
তুমি জানবে না তার ঠিকানা।
ওগো বাঁশিওআলা,
সে থাক্ তোমার বাঁশির সুরের দূরত্বে।

আবার স্মরণ নয় সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন—

'দাঁড়ায়েছ সংগীতের শতদলদলে।'

সংগীত ও প্রেম—

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের নামকরণে সংগীত কথাটা যুক্ত এবং এই কাব্যগ্রন্থের নামকরণের মধ্য দিয়ে কবির জীবনের গতিপ্রকৃতিও নির্ণয় করা যায়। কবির কবিতাই সংগীতে পরিবর্তিত হয়েছে, আবার সংগীতেও কাব্যের রস পাওয়া যায়। তাই কবির সংগীতে সুর এবং কথা দুটোরই সমান প্রাধান্য। কবির

সংগীত, প্রেম ও কাব্য তিনটি ধারা (ত্রিধারা) কবি-মনের গতি প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে অসীমের দিকে প্রবাহিত। তাই কাব্যগ্রন্থের শিরোনামার অর্থ (নামকরণের মধ্যে), সূচনা ও উৎসর্গপত্র, কাব্যের প্রথম ও শেষ কবিতাটি এবং কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মর্মার্থ, স্থান, কাল ও পরিবেশের মধ্যে কবির বয়সানুসারে জীবনের গতি প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়। এবং শিল্পী স্রষ্টা ও সুরকার রবীন্দ্রনাথকেও খুঁজে পাওয়া যায়।

কবির সংগীত ও প্রেম (ভালোলাগা-পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি ৫৭৭ পৃষ্ঠা) কাব্যগ্রন্থে যুক্ত হয়ে ***সন্ধ্যাসংগীতে*** প্রথম প্রকাশিত হল। যৌবনের প্রথম উন্মেষে 'হৃদয়ারণ্যে' যে অন্তর্বেদনায় কবি আবদ্ধ হয়ে ছিলেন, সেই বেদনাই প্রকাশ করেছেন সন্ধ্যার মতোই বিষন্ন অন্তঃরের গান দিয়ে। ***প্রভাত সংগীতে*** কবির অন্তর প্রকৃতির প্রথম বহির্মুখ উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে প্রভাতের মতোই নির্মল অন্তরের গান গাইলেন। আর বাতায়নবাসী কবির নবযৌবনের সূচনায় সংসারের নানান্ রূপের ছবিই কবির অন্তরের গান হয়ে ***ছবি ও গানে*** দেখা দিল। তারপরই কবি যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের মধ্যে অন্তরের অন্তঃস্থলের উৎস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নবযৌবনের ও নববসন্তের প্রেমসংগীত (ভালোবাসা) গাইলেন ***কড়ি ও কোমল*** কাব্যগ্রন্থে—

তরুণ যৌবনের বাউল
সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে,
ডেকে বেড়াল
নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে
অনির্দেশ্য বেদনার খ্যাপা সুরে।

কবি 'নূতন'কে আহ্বান করে নিলেন—

আয় রে নূতন, আয়, সঙ্গে করে নিয়ে আয়,
তোর সুখ তোর হাসি গান।
ফোটা নব ফুলচয়, ওঠা নব কিশলয়,
নবীন বসন্ত আয় নিয়ে।

তারপরই কবির কাব্যগ্রন্থের নামকরণে সংগীত কথাটার সাময়িক ছেদ পড়ে গেল। এবার কবির যৌবনের নূতন দিগন্তে দেখা দিল 'শিল্পী কবির' নূতন সৃষ্টি

তার কল্পনার এবং ভালোবাসার অসম্পূর্ণ **মানসীকে**—'আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে,/তাহে ভালোবাসা দিয়ে/গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।'

অথবা—

স্বষ্টিযুগের প্রথম লগ্নে
প্রাণসমুদ্রের মহাপ্লাবনে
তরঙ্গে তরঙ্গে দুলেছিল এই মন্ত্র-বচন। (মন্ত্র-বচন-প্রেম)
এই বাণীই দিনে দিনে রচনা করেছে
স্বর্ণচ্ছটায় মানসী প্রতিমা
আমার বিরহ-গগনে
অস্তসাগরের নির্জন ধূসর উপকূলে।

এবার কবির সংগীত ও প্রেম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও দুঃসময়ের নানান্ ঘাত প্রতিঘাত ও বক্রতার মধ্য দিয়ে আবার শেষ যৌবনে **ক্ষণিকায়,** ক্ষণিকের গানে দেখা দিল। তাই কবি আনন্দ-উচ্ছ্বাসে কৌতুক পরিহাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে অকারণ পুলকে প্রেম সংগীত গাইলেন—

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে!

বসন্তের উদ্দেশ্যে গাইলেন—

আজ বসন্তে বিশ্বখাতায়
হিসেব নেইকো পুষ্পে পাতায়।

কবি-হৃদয়ের উদ্দেশ্যে গাইলেন—

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে হৃদয়
নাচে রে।

এবার কবির **'নূতন'** (কড়ি ও কোমল) কাব্যলক্ষ্মী পূজারিণী বেশে দেখা দেওয়াতে তাঁর কাব্যের ধারাকে পরিবর্তিত করে পূজার অর্ঘ্য রচনা করলেন—নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থ'।

বাসর-ঘরের দুয়ারে করালে
পূজার অর্ঘ্য বিরচন;
এ কি রূপে দিলে দরশন!

প্রেম—রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের নামকরণে যেমন সংগীত কথাটা যুক্ত, তেমনি অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে প্রেমও যুক্ত হয়ে রয়েছে। কবির কবিতা ও প্রেম দুইই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কাব্যের গতি প্রকৃতির সঙ্গে প্রেমেরও উত্থান পতন হয়েছে। কবির জীবনের ও কাব্যের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রেম, এই প্রেমই কবির জীবন ও কাব্যকে আলোকিত করে অসীমের দিকে প্রসারিত করে দিয়েছে (আত্মপরিচয়-১৭১, ১৭৮, ২০৫, ২১৫ পৃষ্ঠা)। প্রথম যৌবনের আবেগ-প্রবণতা ও অস্থির প্রকৃতির জন্য কবির জীবন যেমন ভুল ভ্রান্তি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েও শেষ যৌবনে কল্যাণ কর্মের 'উদ্‌বোধন' করে স্থির হয়ে গেল, তেমনি কবির সংশয়াকুল প্রেম (মানসী কাব্যগ্রন্থ-অন্তর্দ্বন্দ্ব) জীবনের ঘাত প্রতিঘাত ও দুঃসময়ের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে ক্ষণিকাতে পূর্ণতা লাভ করে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অসীমে মিলিত হল। ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থটি কবির জীবনে ও কাব্যের মহা সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাই কবি শেষ সপ্তক পয়তাল্লিশ সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন—

দুইদিকে প্রসারিত দেখি দুই বিপুল নিঃশব্দ,
দুই বিরাট আধখানা,—
তারি মাঝখানে দাঁড়িয়ে
শেষ কথা বলে যাব—
দুঃখ পেয়েছি অনেক,
কিন্তু ভালো লেগেছে,
ভালোবেসেছি।

অর্থাৎ ক্ষণিকার একপারে রয়েছে ভালোলাগার দৌরাত্ম্য (ভোগের তৃপ্তি), অন্যপারে রয়েছে ভালোবাসার আমন্ত্রণ (ত্যাগের সাধন-পশ্চিম যাত্রীর-ডায়ারি ৫৭৭ পৃষ্ঠা)। এই দুটো ধারার প্রেম নিয়েই কবির জীবন সত্য এবং কাব্যও সম্পূর্ণ হয়েছে। তাই ক্ষণিকার পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থে কখনো ভালোলাগার ধারাটা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে কখনো বা ভালোবাসার ধারাটা। প্রেমের এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে কবির জীবন ও কাব্য চালিত হয়ে শেষ যৌবনে ক্ষণিকাতেই কবির ভালোবাসার ধারাটা প্রবল হয়ে দেখা দিল। এই প্রেম মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অসীমের সঙ্গে মিলিত হয়েছে—'দুঃখবিপদ-বিরোধমৃত্যুর বেশে অসীমের আবির্ভাব'—ক্ষণিকার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে এরই প্রকাশ।

ক্ষণিকার পরবর্তীকালের কাব্যগ্রন্থে প্রেম এবং সংগীত ব্যথার সংগীতে (ক্ষুভিত সুরের ঝর্ণা রাত্রিদিন-পত্রপুট ১৫ সংখ্যক) পরিবর্তিত হয়ে পূজার অর্ঘ্য রচনা করলেন (স্মরণ দুই নং)। কবি এবার ব্যথার প্রেম সংগীতকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পূজার থালায় অঞ্জলি দিলেন—***গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি কাব্যগ্রন্থ।*** তাই কবির কবিতার মধ্যে যে ব্যথার ধারা চলছে, তা তাঁর সংগীতেও ধরা পড়েছে (ক্ষুভিত সুর) এবং চিত্রকলাতেও (বিষন্ন মুখ)। ***বলাকায়*** নিঃসঙ্গ বেদনার্ত কবি অধরার সৃষ্টি করে প্রেমের ধারা, কাব্যের ও সংগীতের ধারাকে নব নব রূপে পুনঃ প্রবর্তিত করলেন এবং দুঃখের মধ্যে আনন্দকে খুঁজে পেলেন। ***পূরবী*** কাব্যগ্রন্থে অতীত বসন্তের নারী 'আনন্দের হারাণো কণিকা ক্ষণিকাকে' শেষ বারের মতো 'আহ্বান' করে পূরবী রাগিণীতে অতীত বসন্তের শেষ গান করে 'শেষ বসন্তের' কাছে বিদায় নিলেন।

ফেলে দিয়ো ভোরে-গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি।
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী।

পূরবী কাব্যগ্রন্থই কবির শেষ সাতাশের শেষ সংগীত। এরপরই কবির শেষ দিগন্তে (মহুয়া) দেখা দিল অদেখা দূত অধরা ও অসীম। কবির শেষ কবিতাগুলি ও শেষ গান এই অধরা ও অসীমের উদ্দেশ্যে গাইলেন, কিন্তু কাব্যগ্রন্থের নামকরণে সংগীত অথবা গীত (রাগিণী) কথাটা আর রইল না।

কবির ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া ও কবির বিরহী সত্তা—

বিরহের দূতী এসে তার সে স্তিমিত দীপখানি
চিত্তের অজানা কক্ষে কখন রাখিয়া দিল আনি।
সেখানে যে বীণা আছে অকস্মাৎ একটি আঘাতে
মুহূর্ত বাজিয়াছিল ; তার পরে শব্দহীন রাতে
বেদনা পদ্মের বীণাপানি
সন্ধান করিছে সেই অন্ধকারে-থেমে-যাওয়া বাণী।

রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ রোম্যান্টিক (নবজাতক) এবং বিরহী কবি। শৈশব থেকেই তিনি কাল্পনিক বিরহের কবিতা লিখতে শুরু করেন। অবশেষে কবির 'জীবন দেবতা নানা ভাঙা গড়া জয়পরাজয়, বাধা বিরোধ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণভাবে বিরহী কবিতে পরিণত করে দিল। তাই 'রূপকারে' লিখেছেন—জীবন দিয়ে গড়িছে গুণী স্বপন দিয়ে নয়' (বীথিকা)। কবি নিজের এই বিরহী সত্তার পরিচয়

দিয়েছেন উৎসর্গ দশ সংখ্যক কবিতায় এবং উৎসর্গ কাব্যগ্রন্থে। তিনি লিখেছেন তাঁর সত্তার মধ্যেই রয়েছে বিরহিণী নারী—

আমার মাঝারে .য আছে কে গো স
কোন বিরহিণী নারী ?
আপন করিতে চাহিনু তাহারে,
কিছুতে নাহি পারি।
রমণীরে কে বা জানে—
মন তার কোন্‌খানে।

কবির এই বিরহী সত্তা পরিপূর্ণ মিলনের মধ্যেও জাগ্রত হয়ে রয়েছে, লিপিকায় তার বর্ণনা দিয়েছেন। ছিন্নপত্র ১৩০ সংখ্যকে এবং পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারিতে (৪৪৮-৫৫৪ পৃষ্ঠা, পূর্ণতা-পূরবী তিনি বিস্তারিতভাবে প্রেম ও বিরহ মিলনের কথা বিশ্লেষণ করেছেন - 'বিয়াত্রিচে দান্তের কল্পনাকে যেখানে তরঙ্গিত করে তুলেছে সেখানে বস্তুত একটি অনাম বিরহ। দান্তের হৃদয় আপনার পূর্ণচন্দ্রকে পেয়েছিল বিচ্ছেদের দূর আকাশে।' রবীন্দ্রনাথও যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের মধ্যে এবং পরিপূর্ণ মিলনের মধ্যেও ক্ষণিক মিলন) যার সঙ্গে মিলন হল না তাঁকেই কবি খুঁজে পেলেন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বিচ্ছেদের দূর আকাশে ধ্যানের মাধ্যমে 'ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়ার' মধ্যে—

ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া
বক্ষ ছেড়ে বসেছে তোমার মর্মতলে
বিরহের বীণা হাতে।

আবার পত্রপুট পনেরো সংখ্যকে কবি একই কথা লিখেছেন—

সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে
আমার সর্ব দেহে মনে,
পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে।
জেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে
চির বিরহের প্রদীপশিখা।

কবির আধ্যাত্মিক সত্তার বিকাশ—

ক্ষণিকায় প্রেমের কল্যাণরূপকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করবার পরই কবির আধ্যাত্মিক সত্তার বিকাশ হোলো। এই আধ্যাত্মিক সত্তার প্রথম প্রকাশ তাঁর

নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে। তাই কবি নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে পাখির ভয়শূন্য চিত্তের উন্নত শিরের ছবিটি এঁকে আত্মার কল্যাণ রূপকে প্রকাশ করলেন। ক্ষণিকার পরবর্তীকালের বহু কবিতায় উপনিষদের বাণী ও আধ্যাত্মিক সত্তাব বিশ্লেষণ রয়েছে। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' (১৩৭ পৃষ্ঠা) বইতে কবি এই আধ্যাত্মিক সত্তার সহজ বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন—'যখন কষ্ট অসহ্য হয়েছে তখন তিনি ভাবতে লাগলেন, কাকে বিছে কামড়াল, কার ওই পা, কার ওই আঙুল, সে কি আমি? কে এই দেহধারী রবীন্দ্রনাথ? আমি, আর আমার যন্ত্রণা কাতর দেহ, একতো নয়। তিনি একাগ্র হয়ে নিজের দেহ থেকে পৃথক করে দেখতে চেষ্টা করলেন। যে দেহধারী কষ্ট পাচ্ছে সে 'আমি' নয়, এই ভাবনাটা যখন স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল হঠাৎ তাঁর মনে হল যেন কী রকম একটা যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল সেই মুহূর্তে যত যাতনা। নিজের সঙ্গে নিজের বিচ্ছেদ হয়ে গেল।'

দেহ থেকে আত্মাকে বিমুক্ত করবার এই আধ্যাত্মিক চেতনা (ধ্যান) এবং তার বিশ্লেষণ প্রান্তিকের বহু কবিতায় ধরা পড়ে। কবি পত্রপুট দশ ও প্রান্তিক নয় সংখ্যক কবিতায় দেহ এবং দেহমুক্ত আত্মার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। কবি ধ্যান দৃষ্টিতে তাঁর 'জটিল মলিন জালে বিজড়িত দেহকে' মন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলেন, যে, কবির অতীতের স্মৃতির সঞ্চয় এবং বিচিত্র বেদনার অনুভূতিপুঞ্জ ও কবি সত্তাকে নিয়ে (বাঁশিখানি) কবির নশ্বর দেহখানি অজানা নদীর স্রোতে দূরে ভেসে চলে গেল।

দেখিলাম—অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা,
চিত্র-করা আচ্ছাদনে আজন্মের স্মৃতির সঞ্চয়,
নিয়ে তার বাঁশিখানি।

কবি আত্মার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে লিখেছেন—'হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপই আমার আত্মার মধ্যে প্রকাশিত হউক।'

হে পূষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।

কবি আত্মপরিচয়ে লিখেছেন—'দুঃখ-বিপদ—বিরোধমৃত্যুর বেশে অসীমের

আ'বির্ভাব'—মৃত্যুর মধ্য দিয়েই প্রেমের সত্য রূপ এবং কল্যাণরূপ দর্শনই কবির জীবন দর্শন। প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধির মধ্যেই কবির আধ্যাত্মিক সত্তার বিকাশ। কবির সমস্ত কাব্যের মধ্যে প্রেমের কল্যাণরূপ এবং অসীমের প্রকাশ রয়েছে (আত্মপরিচয়—২০৫ পৃষ্ঠা)। আবার রোগশয্যায় বাইশ সংখ্যক কবিতায় একই কথা লিখেছেন। কবি অর্ধজাগরণের মধ্যে দেখলেন—

মধ্যদিনে আধো ঘুম আধো জাগরণে
বোধ করি স্বপ্ন দেখেছিনু—
আমার সত্তার আবরণ
খসে পড়ে গেল
অজানা নদীর স্রোতে।
লয়ে মোর নাম, মোর খ্যাতি,
কৃপণের সঞ্চয় যা কিছু,
লয়ে কলঙ্কের স্মৃতি
মধুর ক্ষণের স্বাক্ষরিত ;
গৌরব ও অগৌরব
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে যায়,
তারে আর পারি না ফিরাতে।

কালের পটভূমিকায় কবি সত্তা।

কবি কালের পরিপ্রেক্ষিতে বহু কবিতা লিখেছেন। কালের পরিপ্রেক্ষিতে ও ক্ষণিকের পটে জন্মদিন এগারো সংখ্যক কবিতায় নিজের জীবনের কাহিনী প্রকাশ করেছেন। নদীর স্রোতের মত যে অসীম কাল প্রবাহ বয়ে চলেছে তার মধ্যে ক্ষণিকের জন্য বুদ্‌বুদের (ফেনপুঞ্জের) মতো পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে জড়বস্তুগুলো ভেসে উঠেছে তারই সঙ্গে কবি নিজ সত্তাকে এবং ক্ষণিকাকে (সীমা, নারী, দেহ) বিশ্লেষণ করেছেন। ছিন্নপত্র ১৩০ সংখ্যকে এই বিশ্লেষণ পাওয়া যায়—'এই যে আমরা গুটি কতক সচেতন প্রাণী জড়মহাসমুদ্রের মধ্যে মাথা তুলে বুদ্‌বুদের মতো ভেসে উঠেছি এবং কাছাকাছি এসে ঠেকেছি এ একটা আকস্মিক সংযোগ—এই সংযোগটুকুর মধ্যে যত বিস্ময় যত প্রেম যত আনন্দ তা আবার অনন্তকালের মধ্যে গড়ে উঠবে কি না সন্দেহ। বসন্ত রায়ের কবিতায় এক জায়গায় একটা লাইন আছে—নিমেষে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি। বাস্তবিক মানুষের এক নিমেষের

মধ্যে শতযুগের সংযোগ বিয়োগ ঘটতে পারে। সেই জন্য নিমেষগুলোকে দুর্মূল্য মনে হয়।' কবি জন্মদিন এগারো সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন—

কালের প্রবল আবর্তে প্রতিহত
ফেনপুঞ্জের মতো,
আলোকে আঁধারে রঞ্জিত এই মায়া,
অদেহ ধবল কায়া।
সত্তা আমার, জানি না সে কোথা হতে
হল উত্থিত নিত্য ধাবিত স্রোতে।

কালের প্রবল আবর্তের মধ্যে ক্ষণিকের জন্য কবি সত্তা উত্থিত হয়ে, ফেনপুঞ্জের মতো ধাবমান স্রোতের মধ্যে ভেসে উঠে কায়া ধারণ করে কবির জীবনকে প্রকাশিত করল। কবির জীবনের আরম্ভ মাঝে বিশ্বসত্তার আকস্মিক সংযোগে সীমাকে (ক্ষণিকা, নারী, কায়া) নিয়ে অসীমের বিচিত্র লীলা আরম্ভ হল। ক্ষণিকার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যখন তার বিনাশ হল (১৩০৭—১৩০৯), তখন কালের আলোতে (বলাকা ১৯১৪—১৬) মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই ক্ষণিকাই রূপান্তরিত হয়ে 'মুখ ঢাকা বধূ সেজে' (অশরীরী নারী—অপ্সরা), কবিকে গোপনে দেখা দিল। এবং কবির কাব্যে স্থায়ী আসন লাভ করে সীমার মধ্যে অসীমের আবির্ভাব জানালো। 'বিরাট অসীম বিশ্বসত্তা এতটুকু কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে নিজেকে বেঁধে সীমাতে (নারী, কায়া) প্রকাশ হল'—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ।

'সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের পালা'—

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এবং জীবনে রয়েছে তাঁর দুই সত্তা।[২৭] সন্ন্যাসী ও গৃহী সত্তা। এক সত্তা বিশ্ব ও বিশ্বমানবকে নিয়ে অসীমের দিকে ধাবিত; আর এক সত্তা তাঁর বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা বেদনাকে নিয়ে পৃথিবীর (সংসার) দিকে প্রবাহিত। আবার অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ, সংবেদনশীল ও রসলোলুপ মনের জন্য তাঁর বাস্তব জীবনের সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনাগুলিও বহু ধারায় বয়ে চলেছে। এই বিরুদ্ধ সত্তা (আদর্শ ও বাস্তব সত্তা) তাঁর কাব্যে ও জীবনে পাওয়া যায় (পথে ও পথের প্রান্তে ১৩ সংখ্যক, ছিন্নপত্র ৭৮, ১৫৪ সংখ্যক, চিত্রা কাব্যগ্রন্থ)। তাই তাঁর কাব্যে রয়েছে অসংখ্য বৈচিত্র্যের সুর (পত্রপুট ১৩সংখ্যক), সেই সুর বহু ধারায় প্রবাহিত হয়ে এক অখণ্ড আত্মরূপে বিশ্বের দিকে ধাবিত। আবার এই বহুধা বিভক্ত কবির জীবন ও কাব্যের মধ্যে একটি ধারা (অনুরাগ)

অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো প্রচ্ছন্নভাবে বয়ে চলেছে। সেই অনুরাগের ধারাই (সুপ্ত প্রেম বা প্রচ্ছন্ন প্রেম) তাঁকে শেষ যৌবনে বৈরাগ্যের দিকে (কল্যাণকর্ম) টেনে নিয়ে গেল। কবি অনুরাগের ধারাকে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে নূতনভাবে প্রবাহিত করে সীমার বেড়াকে ভেঙে দিয়ে তাঁর কাব্যের প্রবাহকে পুনঃ প্রবর্তিত করলেন (বলাকা কাব্যগ্রন্থ ১৯১৪-১৬), এবং মানব কল্যাণের পতাকা বহন করে বিশ্ব ও বিশ্বমানবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অসীমকে (অরূপ প্রেম) উপলব্ধি করলেন। কবি আত্মপরিচয়ে (২১৫ পৃষ্ঠা) লিখেছেন 'কিন্তু সমস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এমন কিছু থাকা চাই যার ইঙ্গিত ধ্রুবের দিকে সেই বৈরাগ্যের দিকে যা অনুরাগকেই বীর্যবান ও বিশুদ্ধ করে।' এই অনুরাগেরই একটি ধারায় রয়েছে সুরের ধারা ও সংগীতের ধারা—

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য ভালোবাসার অমৃত।

আর এক ধারায় রয়েছে সীমার (কায়া নারী-গৃহী সত্তা) মধ্যে অসীমের (শূন্যতা-সন্ন্যাসী সত্তা) মিলন সাধনের কথা। সেই কথা কবি নানাভাবে নানা রূপে কবিতায় ও গানে প্রকাশ করেছেন এবং বলাকা-কাব্য-পরিক্রমার গ্রন্থ ভূমিকায় (২২ পৃষ্ঠা-২৬ পৃষ্ঠা) তার বিশ্লেষণ করেছেন। সীমা রূপিণী এই সংসারকে সত্যভাবে গ্রহণ করে তার সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃত আনন্দে প্রেমে পৌঁছবার কথাই বার বার লিখেছেন। কবি আত্মপরিচয়ে লিখেছেন (১৭৮ পৃষ্ঠা)—'জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন—আর কাহারও টানিবার ক্ষমতাই নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা ইহাকেই তো মুক্তির সাধনা বলি।' কবির মনে সীমা অসীমের প্রথম ভাবরূপ অঙ্কুরিত হয়েছিল 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যে (আত্মপরিচয়-১৭৮ পৃষ্ঠা, বলাকা কাব্য পরিক্রমার গ্রন্থ পরিচয়—২৪ পৃষ্ঠা, জীবনস্মৃতি—১০৯ পৃষ্ঠা)। এই নাট্য কাব্যে এবং পরবর্তীকালের বহু কবিতায় রয়েছে কবির নিজেরই আত্মকথা। এই আত্মকথায় নিজেকে বহুবার সন্ন্যাসীর, (তপোভঙ্গ) সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবির এই সন্ন্যাসী সত্তা (শূন্যতা) অসীমের সঙ্গে নারীসত্তা সীমার মিলন সাধনই কবির জীবনে একটি মাত্র পালা যা' সমস্ত কাব্যের মধ্যে প্রতিফলিত। কবির পরবর্তীকালের সমস্ত কাব্য রচনায়

ইহাই ভূমিকা। সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের পালা। কবির জীবন নাট্যই কাব্যনাট্যে রূপায়িত হয়েছে আর এই নাট্য কাব্য [বিস্মরণধর্মী জীবন—(নাট্যশেষ) কড়ি ও কোমল-থেকে স্মরণ] তিনি লিখে গেছেন অজানার ঘেরের মধ্যে ও অপ্রকাশের পর্দা টেনে।

বারে বারে অসীমেরে দেখেছি সীমার অন্তরালে।
বুঝিয়াছি, এ জন্মের শেষ অর্থ ছিল সেই খানে,
সেই সুন্দরের রূপে
সে সংগীতে অনির্বচনীয়।

রাগ রাগিণী—

রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি যেমন একটার সঙ্গে একটা যুক্ত হয়ে একটি বিশেষ অর্থে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি রাগ রাগিণীর মধ্যেও একটা সুসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়, বিশেষভাবে ক্ষণিকার পরবর্তী কবিতাগুলিতে। রাগ রাগিণীগুলি কবির জীবনের সময় নির্ধারক। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে রাগ রাগিণীগুলি ব্যবহৃত হয়েছে।

বাঁরোয়া—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ উপলক্ষ্যে যে সুর বাজান হয়—কবির শৈশব।

যোগিয়া—কাদম্বরী দেবীর স্মৃতি বিজড়িত সুর। যৌবনের সন্ধিঃকাল (ছবি ও গান)।

শাহানা (বসন্ত পঞ্চম রাগ) কবির বিবাহ উপলক্ষ্যে যে সুর বাজান হয়—কবির নব যৌবন (শেষ লেখা ৮ সংখ্যক)।

ভৈরবী—প্রথম প্রহরের রাগিণী—কবির প্রথম বসন্তের রাগিণী—কবির নব বসন্ত। শরৎকাল—'সানাইয়ের বাঁশিতে ভৈরবীর তান দূর প্রসাদের সিংহদ্বার হইতে কানে আসিয়া পৌঁছে (জীবনস্মৃতি বর্ষা ও শরৎ)।

মুলতান রাগিণী—বেলাশেষের রাগিণী। অপরাহ্ণ—'তখন ঝিকিমিকি বেলা' (পত্রপুট বারো)। কবির শেষ যৌবনের রাগিণী, অকাল বসন্ত (পত্রপুট ১২ সংখ্যক, রোগশয্যায় ১০ সংখ্যক)।

পুরবী—প্রৌঢ় বয়সের রাগিণী—পুরবী কাব্যগ্রন্থ ১৯২৪ (অতীত বসন্তের সমাপ্তি সংগীত)।

কানাড়া—শেষ বয়সের রাগিণী—শেষ লেখা ৮ সংখ্যক।

কড়ি ও কোমলের বহু কবিতা পরিবর্তিত হযে অন্য কাব্যগ্রন্থে লিখিত হয়েছে।
তুমি—কড়ি ও কোমল, পরিশেষ।
ক্ষণিক মিলন—কড়ি ও কোমল। মানসী।
ক্ষণ মিলন—চৈতালি।
হঠাৎ মিলন—সানাই।
পূর্ণ মিলন—কড়ি ও কোমল।
দেহের মিলন—কড়ি ও কোমল।
মিলন—পূরবী, মহুয়া, পরিশেষ।
শেষ কথা—কড়ি ও কোমল চৈতালি, নবজাতক, সানাই।
নিদ্রিতার চিত্র—কড়ি ও কোমল।
নিদ্রিতা সুপ্তোত্থিতা—সোনার তরী।
অকাল ঘুম—শ্যামলী।
হাসি—কড়ি ও কোমল, শেষ সপ্তক দুই সংখ্যক।
খেলা—কড়ি ও কোমল।
কাঠ বিড়ালি—বীথিকা।
মোহ—কড়ি ও কোমল।
ভুলভাঙা—মানসী।

মানসী কাব্যগ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ দুটি কবিতা পরিবর্তিত হযে অন্য কাব্যগ্রন্থে লেখা হযেছে।

বধু মানসী।
বধূ—আকাশ প্রদীপ।
বালিকা বধূ—খেযা। মানসীর 'বধু' কবিতাটির ১৭ বৎসর পর খেয়াতেই প্রথম 'বালিকা বধূ' কবিতাটি লেখা হযেছে।
ধ্যান—মানসী চৈতালি, বীথিকা।

ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থের পাঁচটি কবিতা পরিবর্তিত হযেছে।

অচেনা—ক্ষণিকা, মহুযা, বিচিত্রিতা, ছিন্নপত্র ১৩০ সংখ্যক। অপরিচিতা—পূরবী।
উদাসীন—ক্ষণিকা, বীথিকা।
সমাপ্তি—ক্ষণিকা খেযা।
উদ্‌বোধন—ক্ষণিকা নবজাতক।
বোধন—মহুযা।
কৃতার্থ—ক্ষণিকা।
কৃতজ্ঞ—পূরবী।

ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থের ক্ষণিকার পরিচয় পূরবীর ক্ষণিকা কবিতায। ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থের নামানুসারে ক্ষণিকা (পূরবী) কবিতাটি লিখিত হযেছে।

অনেক সময় কবিতা খণ্ড খণ্ড অবস্থায় পাঠকের নিকট অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়, কিন্তু পুঞ্জীভূত আকারে রচনাগুলি পরস্পরের সাহায্যে স্ফুটতর হইয়া দেখা দেয়, লেখকের মর্মকথাটি পাঠকের নিকট সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইয়া উঠে। একবার লেখকের সমস্ত রচনার সহিত সেইরূপ বৃহৎভাবে পরিচয় হইয়া গেলে, তখন, প্রত্যেক স্বতন্ত্র লেখা তাহার সমস্ত বক্তব্য বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে পারে।

প্রথম কাব্যগ্রন্থাবলীর ভূমিকা—১৩০৩ বঙ্গাব্দ

রবীন্দ্রনাথ

স্মৃতির ভূমিকায়

আমার কেবল একটি নিমেষ
তারি তরে ধেয়ে আসি (উচ্ছৃঙ্খল-মানসী)।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ডায়ারি ও সাহিত্যে কবির অতীত স্মৃতিগুলি বার বার লিখেছেন। যৌবনের বহু স্মৃতি যা তিনি কোথাও বলেন নি সেই মুহূর্তের স্মৃতিগুলিকে কবিতায় ধরে রেখেছেন।

১। মুহূর্তের হাসি—হাসি (কড়ি ও কোমল), শেষ সপ্তক দুই সংখ্যক, হঠাৎ মিলন (সানাই), শেষ অর্ঘ্য (পূরবী)।

২। নিমেষের দৃষ্টি—চিঠিপত্র ৮ম খণ্ড—'তোমার আকাঙ্ক্ষাদীপ্ত অতৃপ্ত আঁখিতে/যে দৃষ্টি হানিয়াছিল একটি নিমেষে।' ক্ষণেক দেখা (ক্ষণিকা), একটি চাউনি (লিপিকা)।

৩। ক্ষণকালের মিলন—দোঁহা পানে চাহিল দুজনে চতুর্থীর চাঁদের আলোতে।' অর্থাৎ শুক্লা চতুর্থীর চাঁদের আলোতে কবির সঙ্গে যে নারীর মুহূর্তের জন্য শুভদৃষ্টি (ক্ষণিক মিলন) হয়েছিল তারই কথা কবি 'ক্ষণিক মিলন' কবিতায় উল্লেখ করেছেন। কবি-জীবনের কোন বিশিষ্ট ক্ষণের (মাহেন্দ্র ক্ষণ) স্মরণে তিনি তিথি ব্যবহার করেছেন, তিথির কথা উল্লেখ করে সেই নির্দিষ্ট সময়ের কথা প্রকাশ করেছেন। 'ক্ষণিক মিলন' কবিতারই পরিবর্তিত রূপ ক্ষণ মিলন (চৈতালি), হঠাৎ মিলন (সানাই) ছিন্নপত্র ১৩০ নং, স্মরণ ২২ সংখ্যক কবিতায়। কবি-মনের উত্থান পতনের মধ্যেই এই কবিতাগুলি পরিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে বিভিন্ন সময়ে লিখিত হয়েছে। তাই এই কবিতাগুলিতে কবি-মনের পরিবর্তন ও গতি প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়। প্রথম যৌবনের লেখা 'ক্ষণিক মিলন' এবং 'শেষ কথা' (কড়ি ও কোমল), আর শেষ যৌবনের লেখা 'আবির্ভাব' এবং 'ভীরুতা' (ক্ষণিকা) এই কবিতাগুলির মর্মার্থের মধ্যেই কবি-জীবনের গূঢ় রহস্য ধরা পড়ে।

৪। সমুদ্রের উপর সূর্যাস্তের দৃশ্য—য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি, ৩৮৬, ৩৮৭, ৪২২ পৃষ্ঠা, বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা (৮০ পৃষ্ঠা), ছিন্নপত্র ৫৫ নং।

৫। গঙ্গাবক্ষে তরুণ কণ্ঠের গান—কবির শৈশব (আরোগ্য ৪ নং কবিতা ছিন্নপত্র ৩২ সংখ্যক)।

৬। মহানিমের ঝিল্লিঝংকৃত স্তব্ধ রাত—গাজীপুর, কবির যৌবন (শেষ সপ্তক ১৪ নং)।

৭। গ্রামের পথে সর্ষেফুলের গন্ধের সঙ্গে প্রেমের সুখস্মৃতি। নব যৌবনে (সর্ষেফুল যে সময় ফোটে) কোন এক সময়ে কবি গ্রামে গিয়েছিলেন। সর্ষে খেত—সময়, কাল নির্দ্ধারক।

তখন ছিল সর্ষে খেতে
ফুলের আগুন লাগা।
তখন আমি মালা গেঁথে
পদ্মপাতায় ঢেকে
পথে বাহির হয়েছিলাম
রুদ্ধ কুটির থেকে। বিলম্বিত—ক্ষণিকা)।

পদ্মপাতায় ঢেকে—পবিত্রতার চিহ্ন। কবি প্রথম যৌবনে অক্লিষ্ট অমলিন প্রেমমালা নিয়ে গ্রামে গিয়েছিলেন (ছিন্নপত্র ২৪৯ সংখ্যক, প্রান্তিক সাত সংখ্যক, বিলম্বিত—ক্ষণিকা)।

৮। কৈলাশ মুখুজ্যের ছড়ার স্মৃতি—জীবনস্মৃতি ৭ পৃষ্ঠা, বধূ (আকাশ প্রদীপ), জাগ্রত স্বপ্ন (ছবি ও গান)।

৯। পেনেটির বাগান—শৈশবের স্মৃতি—জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র ২১৮ নং

১০। সংশয়িত প্রেমের স্মৃতি অথবা কবির ভীরু প্রেম }—সংশয়ের আবেগ (মানসী, য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী ৪৫৬ পৃষ্ঠা), ভীরুতা (ক্ষণিকা), ভীরু, নীহারিকা (পরিশেষ, বিচিত্রিতা), পঞ্চমী (আকাশ প্রদীপ), গান (সানাই) অসময় (কল্পনা)।

১১। ঘণ্টা বাজে দূরে—হাজারি বাগের ঘণ্টার স্মৃতি (১২৯২ বঙ্গাব্দ আষাঢ়) পথে ও পথের প্রান্তে ২৪ নং, আরোগ্য ৪ নং।

১২। পাটের বোঝাই ভরা / একে একে বস্তা টেনে উচ্চস্বরে চলেছে ওজন/ আড়তের আঙিনায় (আরোগ্য ৪ নং কবিতা)। নদীর ধারে হাট ও পাটের আড়ত যা কবির যৌবনের ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত (ছিন্নপত্র—২৩১ নং) কুষ্টিয়ার ব্যবসা।

১৩। জন্মদিন ১৫ নং কবিতা—মংপুর স্মৃতি।

১৪। জন্মদিন ১৯ নং কবিতা—বালক বয়সের শিলাইদহের স্মৃতি।

১৫। আমের বোলের গন্ধ—যৌবনের শিলাইদহের স্মৃতি।

১৬। সেই চাঁপা সেই বেলফুল—মায়ের ও নতুন বৌঠানের মৃত্যুর স্মৃতি আবার উৎসবেরও স্মৃতি।

১৭। কবির প্রথম জন্মদিন ও উপহারের স্মৃতি—'মিষ্টি সুরের দাম'—উপহার (জন্মদিন—সেঁজুতি ৫৬৯ পৃষ্ঠা), শেষ সপ্তক তেতাল্লিশ সংখ্যক ছিন্নপত্র ২৭ জুলাই ১৮৮৭ সালে শ্রীশ মজুমদারকে লেখা চিঠি যার বিবরণ রয়েছে ৩৪৪ পৃষ্ঠা দ্বাদশ খণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলীতে।

১৮। বিদায় ক্ষণের কান্নার স্মৃতি—বিদায় রীতি (ক্ষণিকা), প্রথম চিঠি (লিপিকা), যেতে নাহি দিব (সোনার তরী)।

১৯। 'অনেক কালের একটি মাত্র দিন'—কবির বিবাহের দিনের স্মৃতি—শেষ সপ্তক উনত্রিশ শেষ লেখা ৮ সংখ্যক, হঠাৎ মিলন (সানাই)।

২০। ভজিয়ার যাঁতা ভাঙার স্মৃতি—গাজীপুরের স্মৃতি (স্মৃতি—পুনশ্চ, আরোগ্য ৪ নং কবিতা)। নিজের ভৃত্য বনমালীর চরিত্রটি তাঁর কবিতায় কিছু স্থান দিলেও, রবীন্দ্র সাহিত্যে মৃণালিনী দেবীর দাসী ভজিয়ার চরিত্রটি তাঁর কবিতায় এবং ছিন্নপত্র ৩৩ সংখ্যাকে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই দাসীটির স্মৃতির পশ্চাতে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে কবির প্রথম যৌবনের গাজীপুর ও শিলাইদহের স্মৃতির সঙ্গে (ছিন্নপত্র ৩৩নং। কবি পত্নীর 'স্মৃতি' (পুনশ্চ) যা মৃত্যুর পূর্বেও কবি উল্লেখ করে গেছেন—'আমার প্রথম যৌবন খুঁজে বেড়ায় বিদেশী ভাষার মধ্যে আপন ভাষা/প্রজাপতি যেমন ঘুরে বেড়ায়/বিলিতি মৌসুমি ফুলের কেয়ারিতে/নানা বর্ণের ভিড়ে।'

২১। 'শূন্য হৃদয়া চৌকির' স্মৃতি— 'আমার 'শূন্য হৃদয়া চৌকি দিনরাত্রি তার দুই বাহু বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু এখন তার এই নীরব আহ্বান কেউ গ্রাহ্য করেনা।' (রবীন্দ্র—রচনাবলী পঞ্চদশ খণ্ড ১৫০, ১৫৫ পৃষ্ঠা, ছিন্নপত্র ১৮৮৫, ১৮৮৭ অক্টোবর)।

'সেই ফুল কাটা ঢাকাওয়ালা/পুরোনো খালি চৌকিটা পেয়েছে কার খবর'—শেষ সপ্তক ৩১ নং কবিতা।

'শূন্য চৌকির পানে চাহি/সেথায় সান্ত্বনা লেশ নাহি' (শেষ লেখা ৪ নং) কবির অতীত দাম্পত্য জীবনের চৌকির স্মৃতি।

২২। শিথিল চুলের অস্পষ্ট গন্ধ বা স্পর্শের স্মৃতি—যৌবনের স্মৃতি। শেষ সপ্তক ৩১ নং, নাট্য শেষ—বীথিকা, মায়া—সানাই।

২৩। বাতাবি গাছের চারার স্মৃতি—শেষ যৌবনের শিলাইদহ কিংবা শান্তিনিকেতনের স্মৃতি—শেষ সপ্তক ৩ নং কবিতা।

২৪। কবির শৈশবের স্মৃতি—কাঁচা আম, শ্যামা, কাঠের সিঙ্গি, আতার বিচি, সাথী (পরিশেষ), বালক (পরিশেষ)।

২৫। প্রাতের স্মৃতি—কবির শৈশব। 'যখন দেখা হল তার সঙ্গে চোখে চোখে তখন আমার প্রথম বয়েস' (শেষ সপ্তক ত্রিশ সংখ্যক)। 'মনের মধ্যে তখনো/অসংশয় হয় নি পাখির কাকলি' (মিল ভাঙা—শ্যামলী)। সাহিত্যের সঙ্গী—কাব্যসঙ্গিনী নতুন বৌঠানের স্মৃতি।

২৬। রাতের স্মৃতি—কবির বসন্ত রাত (বসন্ত—কল্পনা, কড়ি ও কোমল—শরৎকালের স্মৃতি)।' 'তেতালার ছাতের গুটি কতক রাত্রি'—ছিন্নপত্র ৫০ নং কবির যৌবন। 'অর্ধ রাতে দেখা দিবে তারি মুখ নিদ্রাহীন চোখে' (বলাকা ৪২ নং কবিতা)। 'রাত্রি যার আঙিনায় বসে প্রাণের ছিন্নসূত্রগুলি বারে বারে জুড়ে তোলে, ওই লুকিয়ে—থাকা ছোট ফলগুলি সেই মহান্ধকারেরই রহস্যগর্ভ থেকে রস পেয়ে ফলে উঠেছে সেই অন্ধকার—যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যু (পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি ৫৭৭ পৃষ্ঠা)। বসন্তের রাত্রী মৃণালিনী দেবীর স্মৃতি।

ছোট ফলগুলি—আঙুর ফল কবির যৌবন। আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে/গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল (উৎসর্গ—চৈতালি—১৩০২)। মুঠির মাঝে লুকিয়ে আছে/একটি আঙুর ফল (একটি মাত্র—ক্ষণিকা—১৩০৭)। কবির যৌবন

২৭। ভোলার স্মৃতি—শমীন্দ্রনাথের বন্ধু ভোলা (রবীন্দ্রনাথের পরলোক চর্চা—অমিতাভ চৌধুরী) শমীন্দ্রনাথ (বিজু) ও তাঁর বন্ধুর উদ্দেশ্যে লেখা (পলাতকা)।

২৮। নীতিন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে—নূতন শ্রোতা (পরিশেষ) নূতন কাল, বিশ্বশোক (পুনশ্চ)।

২৯। রেণুকার স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

অমলার মা যখন গেলেন মারা
তখন ওর বয়স ছিল সাত বছর।
কেমন একটা ভয় লাগল মনে
ও বুঝি বাঁচবে না বেশিদিন।
কেননা বড়ো করুণ ছিল ওর মুখ,
যেন অকাল বিচ্ছেদের ছায়া
ভাবীকাল থেকে উল্টে এসে প'ড়ছিল
ওর বড়ো বড়ো কাল চোখের উপরে।

শেষ চিঠি পুনশ্চ।

মংপুতে রবীন্দ্রনাথ এই কথাগুলিরই পুনরুক্তি করেছিলেন। উর্মিলা দাশ 'কবিপ্রিয়া'তে লিখেছেন—'চোখ দুটির মধ্যে এমন একটা ভাব ছিল যে তা থেকে চোখ ফেরানো যেত না।'

৩০। মাধুরীলতার উদ্দেশে—যেতে নাহি দিব (সোনার তরী)। শেষ প্রতিষ্ঠা (পলাতকা)

৩১। মৃণালিনী দেবীর উদ্দেশে—মুক্তি পলাতকা)।

৩২। তারকার আত্মহত্যা—জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধার সাগরে/ ঝাঁপিয়ে পড়িল এক তারা—কাদম্বরী দেবীর জীবন কাহিনীর স্মৃতি।

৩৩। তারার স্মৃতি—যুগল জীবনের জোয়ার জল/কত সন্ধ্যায় জ্বলেছে ঐ তারার ছায়া (শেষ সপ্তক একত্রিশ সংখ্যক)। কবির দাম্পত্য জীবনের তারার স্মৃতি।

মিলন রাতে সাক্ষী ছিল যারা/আজো জলে আকাশে সেই তারা (আকাশ প্রদীপ ২৪।৯।৩৮)। কবির দাম্পত্য জীবনের তারার স্মৃতি।

তারা—আকাশ ভরা তারার মাঝে আমার তারা কই? (তারা-পূরবী)।

তারা—তুমি কোন কাননের ফুল/তুমি কোন গগনের তারা (তুমি কড়ি ও কোমল। 'যে তারা মহেন্দ্রক্ষণে প্রত্যুষ বেলায় প্রথম শুনালো মোরে নিশান্তের বাণী' (শেষ অর্ঘ -পূরবী)।

নিশান্তের বাণী—রহস্যময় যৌবনের বাণী।

প্রথম যৌবনের প্রথম বসন্তের দুর্লভ মুহূর্তে (মহেন্দ্রক্ষণ) যিনি কবির রহস্যময় যৌবনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছিলেন সেই 'তুমি' বা 'তারার' (তুমি-কড়ি ও কোমল, তারা-পূরবী) স্মৃতি।

কবির অতীত দিনের স্মৃতি—'পথে ও পথের প্রান্তে'।

পথে ও পথের প্রান্তে আছে সত্য প্রত্যক্ষ পথের চলতি ঘটনা নিয়ে আলাপ প্রতিলাপ, কবির জীবনাদর্শের কথা, আবরণ মোচনের সাধনা ও শান্তিনিকেতনের কথা, আর আছে কবির অতীত দিনের স্মৃতি। এই স্মৃতিচারণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শরৎকালের সকাল কিংবা দুপুর কিংবা আষাঢ়ের স্নিগ্ধ মধ্যাহ্ন কি বা যে কোন একটি সুন্দর দিনকে তিনি অতীতের স্মৃতির মধ্যে নিয়ে গেছেন, যেন অতীত কালের সাজ নিয়ে বর্তমান দিনটি অপরূপ হয়ে দেখা দিল। এই ভাবে তিনি শৈশব যৌবনের দিনগুলির কথা প্রকাশ করেছেন।

পথে ও পথের প্রান্তে ১৮ নং লেখাতে কবি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আরম্ভের স্মৃতি ও অতীত সংকল্পের কথা প্রকাশ করেছেন।

২৪ নং লেখাতে কবি প্রথম যৌবনে ১২৯২ বঙ্গাব্দে আষাঢ় মাসে যখন হাজারিবাগে যান, সেই সময়কার ঘন্টা ধ্বনির কথা প্রকাশ করেছেন (আরোগ্য ৪ নং)।

২৮ নং লেখাতে কবি 'বলাকার কবি'কে (বামগড়) স্মরণ করেছেন। বলাকাতেই কবি মৃত্যুর রূপকে ভেঙে নব নবরূপে পুনরুজ্জীবিত করে তাঁর কাব্যের গতিকে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন এবং বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করে মহামানব রবীন্দ্রনাথে পরিণত হয়েছিল। কবি নিজের এই বিশুদ্ধ স্বরূপকে এই দিনটির মধ্যে উপলব্ধি করলেন।

৩২ নং লেখায় কবির দূর শৈশবের শীতের সকালের চিন্তু চাকরের গুণগুণরবে মধুকানের গান এবং কবির জোড়া ও নতুন বৌঠানের সংসারের পূর্ণ জীবনের সুখস্মৃতির ছবির সঙ্গে শৈশবের 'অনাদৃত কবির' নিজের কথাই মনে জেগে উঠল—'সেদিনের সেই রুটিতোস সুগন্ধি সকাল বেলা যে পূর্ণ জীবনের রূপক ছিল সেদিন আমার সমস্ত জীবনে তার সমতুল্য কিছুই ছিল না।'

৩৬ নং লেখায় বর্তমান আষাঢ় মাসের স্নাননির্মল স্নিগ্ধ মধ্যাহ্নটির মধ্যে শেষ যৌবনের মুলতান রাগিণীর আলাপের সঙ্গে অতীত আষাঢ়ের 'নববর্ষার' স্নিগ্ধ মধ্যাহ্ন ও 'প্রেয়সী নিরুপমার' স্মৃতিটিও কবির চিত্ত পটে ধরা দিল, যা' পুনশ্চের 'সুন্দর' কবিতাটির মধ্যে সেই অতীত দিনটির স্মৃতির কথা প্রকাশিত—(অবিনয়—ক্ষণিকা, ১লা আষাঢ় ১৩০৭ শিলাইদহের স্মৃতি)। ৩৮ নং লেখায় 'বিচ্ছেদ' কবিতাটির ভাবার্থ রয়েছে।

৪৬ নং লেখায় কবির জগতে সবচেয়ে বড়ো স্থান নিয়ে রয়েছে শীতের দুপুর বেলা। জীবনস্মৃতিতে 'বর্ষা ও শরৎ' এ শীতের দুপুরের বর্ণনা দিয়েছেন—'শরৎ মধ্যাহ্নের একটি সোনালি রঙের মাদকতা দেয়াল ভেদ করিয়া কলিকাতা শহরের সেই একটি সামান্য ক্ষুদ্র ঘরকে পেয়ালার মতো আগাগোড়া ভরিয়া তুলিতেছে।'

৫৩ নং এ লিখেছেন, 'মানুষের মন দুই বাসার পাখি, একটা কাছের বাসা, একটা দূরের। শরৎকালটা (কড়ি ও কোমল), হচ্ছে, দূরের কাল। কবি মুলতান রাগিণীর আলাপের সঙ্গে সেই দূরের শরৎকালের কথাও ব্যক্ত করেছেন—'যা রোদ্দুরে সোনার রঙ ধরেছে। এই রঙটাতে মন ভোলায়—অনির্দিষ্ট কোন

সুদূরের জন্য মন কেমন করে।' শরৎকাল—কড়ি ও কোমল। কবির নবযৌবনের স্মৃতি (১২৯১ বঙ্গাব্দ-শরৎকাল)।

৫৮ ও ৫৪ নং এ লিখেছেন, শিলাইদহের কুঠিও তেতালার নিভৃত ঘরটির কথা কবির মনে পড়ছে। আর মনে পড়ছে 'বাঁশবনের ছায়া, চলছে জলভরা কলসী নিয়ে গ্রামের মেয়ে, ঘু ঘু ডাকছে আমগাছের ডালে আর দূর থেকে শোনা যাচ্ছে মাঝিদের সারিগান—মন উতলা করে দেয়, চোখটা ঝাপসা করে দেয় একটুখানি অকারণ চোখের জলে।' 'পথে ও পথের প্রান্তে' কবির শৈশবের ও যৌবনের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির কথা, বিশেষ ভাবে প্রথম যৌবনের দূরের শরৎ কালের স্মৃতি ও শিলাইদহের স্মৃতি বর্তমান দিনগুলির মধ্যে ফিরে ফিরে এসেছে।

চিত্রকলা—

কাব্যগ্রন্থে অশরীরী নারীমূর্তি ছাড়া, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের কবিতাও দেখা যায়, যার কিছু কিছু প্রভাব চিত্রকলায় প্রতিফলিত হয়েছে। কবি যে কথা কবিতায় প্রকাশ করতে পারেন নি বা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাই তিনি চিত্রকলায় প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কবি-মনের গতি প্রকৃতির সঙ্গে যেমন কাব্য, প্রেম, সংগীত, আধ্যাত্মিক ও বিরহী সত্তা যুক্ত হয়ে রয়েছে, তেমনি চিত্রকলাও যুক্ত। কবি নব বসন্তের ও নব যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের আনন্দের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শরৎকালে ছবি আঁকা সুরু করেছিলেন (বর্ষা ও শরৎ-জীবনস্মৃতি), সেই চিত্রলিপি শেষ বয়সে পুনরায় সুরু করেন। শেষ সাতাশের নিঃসঙ্গ কবির অন্তর্বেদনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ হতে লাগল গানে ও চিত্রকলায় (পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি-৭ অক্টোবর, ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯২৪, ২৫ সাল)।

অমিতার আনন্দ সম্পদ
ডালিতে সাজিয়ে নিয়ে চলেছে সুমিতা,
সে ভাব নয়, সে চিন্তা নয়, বাক্য নয়,
শুধু রূপ আলো দিয়ে গড়া (শেষ সপ্তক পনেরো)।

অমিতা—কবিতা, সুমিতা—চিত্রকলা।
তাই কবিতার আনন্দসম্পদ ভাবলোক থেকে রূপলোকে (চিত্রকলা) পরিণত হল। এতদিন কবি ভাব দিয়ে অনুরাগ দিয়ে কবিতায় গানে ও সাহিত্যের ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু—

আমার ভাষা যেন
কুয়াশার জড়িমায় অবমানিত

হেমন্তের বেলা.
তার সুর পড়েছে চাপা।
(শেষ সপ্তক ছাব্বিশ)।

কবি সেই অদৃশ্যের চঞ্চল লীলা যা ভাষার অঙ্গুলিতে বোঝাতে পারলেন না বা ধরা গেল না, সেই অদৃশ্যের চঞ্চল লীলাই তিনি 'ভাষার জগৎ' ছেড়ে 'দেখার জগতে', এক নিভৃত থেকে আর এক নিভৃতে এসে মনের আনন্দে চিত্রকলায় প্রকাশ করতে লাগলেন। 'আর্টিষ্ট প্রশ্ন করছে আর্টের সাধনা কী। আমি বলি 'দেখো', তবেই দেখতে পাবে। সত্তার প্রবাহিনী ঝরে পড়ছে, তারই স্রোতের জলে মনের অভিষেক হোক, ছোটো বড় সুন্দর অসুন্দর সব নিয়ে তার নৃত্য' (পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি ৫২০ পৃষ্ঠা)। আবার 'পথে ও পথের প্রান্তে' ২৭ সংখ্যকে লিখেছেন—'এর আগে আমার মন আকাশে কান পেতে ছিল, বাতাস থেকে সুর আসত, কথা শুনতে পেত, আজকাল সে আছে চোখ মেলে রূপের রাজ্যে, রেখার ভিড়ের মধ্যে।' কবি শেষ সপ্তক পনেরো সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন—

আমি লিখি কবিতা, আঁকি ছবি।
দূরকে নিয়ে সেই আমার খেলা;
দূরকে সাজাই নানা সাজে,
আকাশের কবি যেমন দিগন্তকে সাজায়
সকালে সন্ধ্যায়।

কবি চিত্রকলায় দূরকে নিয়ে খেলা করেছেন; দূরকে নানা সাজে সাজিয়েছেন এবং দূরের মানুষের গান করে (দূরের গান—সানাই), দূর অজানার পারে তাঁর নিকটতমাকে চেয়ে দেখেছেন—

চেয়ে চেয়ে দেখি সেই নিকটতমাকে
অজানার অতিদূর পারে।

'দূর বলে একটা পদার্থ আছে, সে বড়ো সুন্দর। বস্তুত সুন্দরের মধ্যে একটি দূরত্ব আছে নিকট তার স্থূল হস্ত নিয়ে তাকে যেন নাগাল পায় না। সুন্দর আমাদের সমস্ত দিগন্ত ছাড়িয়ে যায়, তাই সে আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে সংলগ্ন থাকলেও আমাদের প্রয়োজনের অতীত। আমাদের নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও এই দূর পদার্থকে যদি না রাখতে পারি তা হলে আমাদের ছুটি নেই, তা হলে সমস্ত অসুন্দর হয়ে পড়ে। যারা বিষয়কর্মে অত্যন্ত নিবিষ্ট তাদের জীবনে নিকট আদূরের নেই। কেননা স্বার্থ জিনিষটা মানুষের অত্যন্ত বেশি কাছের জিনিষ,

তার আসক্তি দেয়ালের মতো। আপন দেয়ালকে মানুষ ভালোবাসে, কেননা দেয়াল আমারই, আর কারো নয়। সেই ভালোবাসা যখন একান্ত হয়ে ওঠে তখন মানুষ ভুলে যায় যে যা আমার অতীত তা কত আনন্দময় হতে পারে, তার প্রতি ভালোবাসার আর তুলনা হয় না।

কর্ম যখন বিষয়কর্ম না হয়, তখন সেই কর্ম মানুষকে দূরের স্বাদ দেয়, দূরের বাঁশি বাজায় (দূরবর্তিনী—সানাই)। কবিতা লিখি, ছবি আঁকি, তার মধ্যে প্রয়োজনের অতীত দূরের আকাশ আছে বলেই এত ভালোবাসি, তাতে এমন মগ্ন হতে পারি' (পথে ও পথের প্রান্তে ২৬ সংখ্যক)।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান ও সুরের ধারা, গল্প উপন্যাস, ছবি এবং জীবন সবই একই রক্তসূত্রে গাঁথা। সবগুলি মিলিয়েই কবির জীবনের বৃত্ত রচিত হয়েছে। তাঁর আনন্দ-বেদনা, কামনা-বাসনা, ভয়-ভাবনা, দুঃখ-দ্বন্দ্ব আধ্যাত্মিক চেতনা, প্রেম ও ভালোলাগা এবং বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত ঐশ্বর্য যা' তিনি বিপুল আকারে কবিতায় প্রকাশ করেছেন, তারই কিছু কিছু অংশ চিত্রকলায় এঁকেছেন। যে সব নারীদের (আকাশবিহারীদের) ভাব দিয়ে রূপ দিয়ে এবং অনুরাগের ধারা দিয়ে কবিতায় প্রকাশ করেছেন, সেই সব আকাশবিহারীদেরই তিনি চিত্রকলায় ধরে রেখেছেন—কবির কবিতাই আকারের মধ্য দিয়ে ছবিতে পরিণত হয়েছে।

জগতে রূপের আনাগোনা চলছে,
সেই সঙ্গে আমার ছবিও এক-একটি রূপ,
অজানা থেকে বেরিয়ে আসছে জানার দ্বারে।
সে প্রতিরূপ নয়।
মনের মধ্যে ভাঙাগড়া কত, কতই জোড়া তাড়া,
কিছু বা তার ঘনিয়ে ওঠে ভাবে,
কিছু বা তার ফুটে ওঠে চিত্রে;
এতদিন এই সব আকাশবিহারীদের ধরেছি কথার ফাঁদে।

কথার ফাঁদ—কবিতায়। আকাশবিহারীদের—'তারা মস্ত বড়ো কিছুই নয়; তারা দেখা দিয়েছে কেউ বা বনের ছায়ায়, কেউ বা নদীর ধারে, কেউ বা ঘরের কোণে, কেউ বা পথের বাঁকে' (পশ্চিম-যাত্রীর-ডায়ারি ৫৬১ পৃষ্ঠা)।

কবি প্রথম যৌবনেই ছবি আঁকা উল্লেখযোগ্যভাবে সুরু করেন, এবং বৃদ্ধ বয়সে তাঁর ছবি পরিণতি লাভ করে। কবি জীবনস্মৃতিতে 'বর্ষা ও শরৎ' এ লিখেছেন —'মনে পড়ে দুপুর বেলায় জাজিম বিছানো কোণের ঘরে একটি ছবি আঁকার

খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি। সে যে চিত্রকলার কঠোর সাধনা তাহা নহে সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন মনে খেলা করা। যেটুকু মনের মধ্যে থাকিয়া গেল কিছুমাত্র আঁকা গেল না, সেটুকুই ছিল তাহার প্রধান অংশ।' কবির সেই প্রথম যৌবনের শরৎকালে (কড়ি ও কোমল), অকারণ পুলকে যে ছবি আঁকা সুরু করেছিলেন, সেই ছবির প্রধান অংশের শেষ পরিণতি হিসাবে, শেষ বয়সের চিত্রকলায় দেখা যায়—'বিষন্ন নারীমূর্তি' এবং কবির 'বেদনার্ত মুখ'—

আমি বেঁধেছি তোমাকে দুয়ের গ্রন্থিতে,
তোমার সৃষ্টি আজ তোমাতে আর আমাতে,
তোমার বেদনায় আর আমার বেদনায়।
দ্বৈত—শ্যামলী।

কবি যৌবনে ১৮৯০ সালে, বিলাত যাবার পথে লোহিত সমুদ্রের স্থির জলের উপরে যে অলৌকিক সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখেছিলেন সেই সূর্যাস্তের উজ্জ্বল ম্লান সন্ধ্যার রংই কবির জীবনে রয়ে গেছে। এবং সেই রঙ তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর চিত্রকলায়। ছিন্নপত্র ৫৫ নং এ লিখেছেন—'সেই বিলাত যাবার পথে লোহিত সমুদ্রের স্থির জলের উপরে যে অলৌকিক সূর্যাস্ত দেখেছিলুম, সে কোথায় গেছে! কিন্তু ভাগ্যিস আমি দেখেছিলুম, আমার জীবনে ভাগ্যিস সেই একটি সন্ধ্যা উপেক্ষিত হয়ে ব্যর্থ হয়ে যায়নি—অনন্ত দিন রাত্রির মধ্যে সেই একটি অত্যাশ্চর্য সূর্যাস্ত আমি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো কবি দেখেনি। আমার জীবনে তার রঙ রয়ে গেছে।'

এই উজ্জ্বল ম্লান সন্ধ্যার রঙই কবির চিত্রকলায় দেখা যায়, বিশেষভাবে নারীমূর্তিগুলিতে ও নিজের প্রতিকৃতিতে এবং কিছু কিছু কবির স্মৃতি বিজড়িত প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলির মধ্যে। কবি এই রঙ সম্বন্ধে য়ুরোপ-যাত্রীর-ডায়ারীর ৩৮৭, ৪২২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—'কিন্তু তবু সমুদ্র এবং আকাশের মাঝখানটি থেকে এই দুর্লভ সন্ধ্যাটুকুকে পারিজাতপুষ্পটির মতো তুলে নিয়ে যদি আর একজনের হাতে না দিতে পারি তা হলে মনে হয় যেন সমস্ত নিষ্ফল হল। এই আলো এই শান্তি কেবল একা বসে চেয়ে দেখবার এবং মুগ্ধ হবার জন্য নয়, মানুষের উপর নিক্ষেপ করে তাকে আচ্ছন্ন করে তাকে সুন্দর করবার জন্যে। ঘরের মধ্যে আনবার জন্যে, লোকালয়ের উপরে বিস্তৃত করবার জন্যে, ভালোবাসার লোকের মুখের উপরে ধরে তাকে নূতন এবং সুন্দর আলোকে দেখবার জন্য।' তাই পরবর্তীকালে নি:সঙ্গ কবি এই রং ভালোবাসার লোকের মুখের উপরে ধরে তাকে নূতন এবং সুন্দর

আলোকে দেখলেন (বিষন্ন নারীমূর্তি), এবং নিজের প্রতিকৃতিতেও এই রং দিলেন (কবির বেদনার্ত মুখ)।

আবার কবির বহু বৈচিত্র্যময় চিত্রকলার পাশেই রয়েছে কাল্পনিক আতঙ্কজনক জন্তু জানোয়ারের নানা রকম মূর্তি, আর সুন্দর ও অসুন্দর মানুষ মূর্তি। কবির যৌবনের কাল্পনিক চিন্তা, ভাবনা, আশঙ্কা, নৈরাশ্য ও দুঃখ-বেদনার অভিব্যক্তিগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিভিন্ন আকৃতিতে কবি-মনে দেখা দিয়েছিল; যৌবনের সেই কাল্পনিক ভয়ই কবি চিত্রকলাতে এবং কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। এই কাল্পনিক ভয় ভাবনাগুলি 'আতঙ্ক' (পরিশেষ), শেষ সপ্তক নয় সংখ্যক কবিতা, শেষ লেখা ১৪ নং কবিতা, ভীরু (পরিশেষ, বিচিত্রিতা), ভীরুতা (ক্ষণিকা), ও পঞ্চমী (আকাশ প্রদীপ) কবিতায় ভালভাবেই ব্যক্ত করেছেন। 'আতঙ্ক' কবিতায় রয়েছে—

জীবনের ভিত্তিটার গায়ে
পড়েছে বিস্তর কালো দাগ
মূঢ় অতীতের মসীলেখা,
ভাঙা গাঁথুনিতে
ভীরু কল্পনার যত জটিল কুটিল চিহ্নগুলো।
দীর্ণ ছাদে তার জীর্ণ ভিতে
নামহীন অবসাদ,—
অনির্দিষ্ট শঙ্কাগুলো নিদ্রাহীন পেঁচা,
নৈরাশ্যের অলীক অত্যুক্তি যত,
দুর্বলের স্বরচিত শত্রুর চেহারা।
ধিক্ রে ভাঙন লাগা মন,
চিন্তায় চিন্তায় তোর কত মিথ্যা আঁচর কেটেছে।
দুষ্টগ্রহ সেজে ভয়
কালো চিহ্নে মুখভঙ্গী করে।
কাঁটা আগাছার মতো
অমঙ্গল নাম নিয়ে
আতঙ্কের জঙ্গল উঠেছে।
চারিদিকে সারি সারি জীর্ণ ভিতে
ভেঙে পড়া অতীতের বিরূপ বিকৃতি
কাপুরুষে করিছে বিদ্রূপ।

শৈশবে বাগানের জীর্ণ পাঁচিলের গায়ে সাদা কালো দাগ দেখে কবি যেমন কাল্পনিক আতঙ্কে আতঙ্কগ্রস্ত হতেন, তেমনি যৌবনেও নানা রকম চিন্তা ভাবনা যেমন নৈরাশ্যের অলীক অত্যুক্তি, নামহীন অবসাদ, অনির্দিষ্ট শঙ্কা, অনিদ্রা, উৎবেগ, উৎকণ্ঠা, কাল্পনিক শক্র, অমঙ্গলের ভয়, দুষ্টগ্রহের ভয় প্রভৃতি দ্বারা আতঙ্কগ্রস্ত থাকতেন। এমন কি কবি সংশয়ের জন্য ভালোবাসার কথাও ব্যক্ত করতে পারেন নি—হায়, সে যে পায় নাই আপন নিশ্চিত পরিচয়,/বন্দী তারে রেখেছে সংশয় (ভীরু-বিচিত্রিতা, শেষ সপ্তক ২৬ সংখ্যক, সংশয়ের আবেগ-মানসী)। তাই 'পঞ্চমী'কে (দৌপদী অমাবস্যার পর পঞ্চম তিথি, আলো আঁধারি অথবা সিকি চাঁদিনীর আলো—শ্যামলা রং) উদ্দেশ্য করে তাঁর যৌবনের দিনগুলির কথা উল্লেখ করেছেন।

দীর্ঘ পথের শেষ গিরিশিরে
উঠে গেছে আজ কবি
সেথা হতে তার ভূতভবিষ্য
সব দেখে যেন ছবি
ভয়ের মূর্তি যেন যাত্রার সঙ,
মেখেছে কুশ্রী রঙ।
দিনগুলি যেন পশুদলে চলে
ঘণ্টা বাজায়ে গলে।
কেবল ভিন্ন ভিন্ন
সাদা কালো যত চিহ্ন।

আবার শেষ লেখা ১৪ সংখ্যক কবিতায় আত্মসমালোচনা করে লিখেছেন—

যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হার-জিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ কুহক,
শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা,
দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুন শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।

কবি এই সব কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থকে জন্তু জানোয়ারের মূর্তিতে চিত্রকলায় রূপ দিয়ে আরও ভালো ভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কবি যে সব

আতঙ্কজনক জন্তু জানোয়ারের ছবি এঁকেছেন বা ভয়ের কথা কবিতায় লিখেছেন তাও মানব মনেরই আর একটা দিক। সংসার জীবনে এই কাল্পনিক ভয়, শঙ্কা, অবসাদ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, চিন্তা-ভাবনা দ্বারা আমরা সবাই আক্রান্ত। কবির কাব্যগ্রন্থে মানব মনের যত রকম অভিব্যক্তি আছে সবই তাঁর কবিতায় ও চিত্রকলায় প্রকাশ পেয়েছে এমন কি আমাদের ভালোবাসার মধ্যেও হারাবার ভয় রয়েছে, তাই 'উৎসবের দিনে' (পূরবী) লিখেছেন—

ভয় নিত্য জেগে আছে প্রেমের শিয়র-কাছে,
মিলন সুখের বক্ষো মাঝে।

আবার 'বিরহীর পত্রে'ও সেই একই কথা লিখেছেন—

ভয়ে ভয়ে হাতে হাতে বেঁধে বেঁধে চলি
ছাড়া পেলে কে আর কাহার।

কবি নিজেও সংসার রচনা করেছিলেন—

কত দিনে কত রাত্রে কত লজ্জাভয়ে
কত ক্ষতি লাভে কত জয়ে পরাজয়ে।

কবি আতঙ্কজনক জন্তু জানোয়ারের মূর্তিতে যেমন ভয়ের অভিব্যক্তি বোঝাতে চেয়েছেন, তেমনি মনের ব্যথা বেদনা ও ভালোবাসাকে সুন্দর ও অসুন্দর মানুষ মূর্তিতে দেখেছেন—

খর মধ্যাহ্নের তাপে
ছুটতে হল
জয় পরাজয়ের আবর্তনের মধ্যে
পায়ে বিঁধছে কাঁটা,
ক্ষত বক্ষে পড়ছে রক্তধারা।
নির্মম কঠোরতা মেরেছে ঢেউ
আমার নৌকার ডাইনে বাঁয়ে,
জীবনের পণ্য চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে
নিন্দার তলায় পঙ্কের মধ্যে।
বিদ্বেষে অনুরাগে
ঈর্ষায় মৈত্রীতে,
সংগীতে পরুষ কোলাহলে
আলোড়িত তপ্ত বাষ্প নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে

আমার জগৎ গিয়েছে তার কক্ষপথে
(শেষ সপ্তক তেতাল্লিশ)।

আবার সুন্দরের মূর্তিতে দেখেছেন—

অপ্রত্যাশিত পথে এসেছে
অমরাবতীর মর্ত্য প্রতিমা ;
সেবাকে তারা সুন্দর করে,
তপঃক্লান্তের জন্য তারা
আনে সুধার পাত্র.

কবি আত্মপরিচয়ে ২১০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—'খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে যে গ্লানি এসে পড়ে আমার ভাগ্যে অন্যদের চেয়ে তা অনেক বেশী আবিল হয়ে উঠেছিল। এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত , এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মানা আমার মতো আর কোন সাহিত্যিককেই সইতে হয় নি। এও আমার খ্যাতি পরিমাপের বৃহৎ মাপকাঠি। একথা বলবার সুযোগ পেয়েছি যে প্রতিকূল পরীক্ষায় ভাগ্য আমাকে লাঞ্ছিত করেছে কিন্তু পরাভবের অগৌরবে লজ্জিত করে নি। এ ছাড়া আমার দুর্গ্রহ কালো বর্ণের এই-যে পটটি ঝুলিয়েছেন এরই উপরে আমার বন্ধুদের সুপ্রসন্ন মুখ সমুজ্জল হয়ে উঠেছে।' আবার পথে ও পথের প্রান্তে ১১ সংখ্যক ও ৪৬ সংখ্যকে লিখেছেন—'আমার সহচরদের বাক্যে বা ব্যবহারে যত-কিছু রচনা প্রকাশ পায় আমার জীবনচরিতের অধ্যায়ে লোকে সেগুলো যোজনা করে আমার নামের উপর কালিমা লেপন করে। যেমন ঝড়ের উপর মারীর উপর মানুষ রাগ করে না, তেমনি এই-সমস্ত আঘাতকে স্বীকার করে নিয়ে আমি যেন রাগ না করি, যেন শান্ত থাকি—প্রতিদিনই নিজেকে এই কথাই বলছি এবং মনের ভিতর থেকে এর সায় পাচ্ছি।'

রবীন্দ্রনাথ নিজেকেও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করেছেন শেষ সপ্তক তেতাল্লিশ সংখ্যক কবিতায়, ছিন্নপত্রে ও সাহিত্যে। তাঁর চেতন ও অবচেতন মনের অভিব্যক্তিগুলিই কবি চিত্রকলায় এঁকেছেন এবং কবিতায় লিখেছেন। মানব মনের এমন কোন দিক নেই যা তাঁর কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ করেন নি। মানব মনের বাস্তব সত্তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক, যা আমাদের মনের গভীরে সুপ্ত রয়েছে তারও যেমন প্রকাশ রয়েছে তাঁর কবিতায়, আবার আধ্যাত্মিক সত্তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ যা তিনি নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জন করেছেন তারও প্রকাশ রয়েছে। তাই তাঁর কবিতায় রয়েছে বহু বৈচিত্র্যের ধারা, এবং তারই সঙ্গে

যুক্ত হয়েছে বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত ঐশ্বর্য। কবির এই কবিতাগুলিই আকারের রূপ নিয়ে চিত্রকলায় পরিবর্তিত হয়েছে।

বহু বিচিত্রের কারুকলায় চিত্রিত
এই আমার সমগ্র সত্তা
তার সমস্ত সঞ্চয় সমস্ত পরিচয় নিয়ে
কোনো যুগে কি কোনো দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে
পরিপূর্ণ অবারিত হবে ?
তার সকল তপস্যায় সে চেয়েছে
গোচরতাকে ;
বলেছে, যেমন বলে গোধূলির অস্ফুট তারা
বলেছে, যেমন বলে নিশান্তের অরুণ আভাস,—
"এস প্রকাশ, এস।"
কবে প্রকাশ হবে পূর্ণ,
আপনি প্রত্যক্ষ হব আপনার আলোতে
বধূ যেমন সত্য করে জানে আপনাকে,
সত্য করে জানায়,
যখন প্রাণে জাগে তার প্রেম,
যখন দুঃখকে পারে সে গলার হার করতে,
যখন দৈন্যকে দেয় সে মহিমা ;
যখন মৃত্যুতে ঘটে না তার অসমাপ্তি।

যখন মৃত্যুতে ঘটে না তার অসমাপ্তি

'আশ্রমের কাজে আত্মসমর্পণ করব ভাবলাম। তখন আমার আত্মীয় স্বজন সবাই প্রতিকূল। সকলকে এড়িয়ে চলে এলাম শান্তিনিকেতনে। সঙ্গে এল দৈন্য ও অর্থাভাব। সেবা ও উপযুক্ত পথ্যের অভাবে আমরা অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমার পত্নী তখন তাঁর গায়ের-গয়না-বিক্রয় করা অর্থ নিয়ে এখানে এলেন ও ঐকান্তিক সেবায় আমাদের সারিয়ে তুললেন। কিন্তু কয়েকদিন পরে তিনি মারা গেলেন। আশ্রমের জন্য এই প্রথম বলি। নারীর এই বলিকে একদিন স্বীকার করতেই হবে। কাজেই এই দাবি একদিন এখানে স্বীকৃত হবেই। হয়তো একদিন নারীদের জন্যই এই আশ্রম উৎসর্গীকৃত হবে।'

(ক্ষিতিমোহন সেন—স্মৃতিকথা)।

নির্দেশিকা

১, ৩, ৪। দূরের বঁধূ—

'প্রথম বয়সের বাতায়নে বসে তুমি তোমার দূরের বঁধূর উত্তরীয়ের সুগন্ধি হাওয়া পেয়েছিলে' (পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি ৫৬৬ পৃষ্ঠা।

'সেই কৈলাস মুখুজো আমার শিশুকালে অতি দ্রুতবেগে মস্ত একটা ছড়ার মতো বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটা ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বল ভাবে বর্ণিত ছিল। এই যে ভুবন মোহিনী বধূটি ভবিতব্যতার কোল আলো করিয়া বিরাজ করিতেছিল, ছড়া শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্রটিতে মন ভারি উৎসুক হইয়া উঠিত' (জীবনস্মৃতি ৭ পৃষ্ঠা)।

কবি প্রথম বয়সের বাতায়নে বসে এই (ছড়ার বধূ) দূরের বঁধুর 'সুখ স্বপ্ন' ও 'জাগ্রত স্বপ্ন' দেখলেন অনাগত 'কে' কবিতাটির মধ্যে।

বাতায়নবাসী কবি—ছবি ও গান কাব্যগ্রন্থের সূচনা', জীবনস্মৃতি ১১০ পৃষ্ঠা।

২। বাসন্তী রঙ এর বসনখানি—সোজাসুজি (ক্ষণিকা)।

বাসন্তী-রঙ বসনখানি
নেশার মতো চক্ষে ধরে।

হেমলতা ঠাকুর 'রবীন্দ্রনাথের বিবাহ বাসরে' লিখেছেন, 'বাসন্তী রঙের জমিতে লাল ফিতের উপর জরির কাজ করা পাড় বসানো শাড়ি পরেছেন কাকিমা। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে।' কবি পত্রপুট বার সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন—

বুকে উঠল জাফরাণি রঙের আঁচল
তখন ঝিকিমিকি বেলা।

কবির নব যৌবনের ফাগুন মাসের জগতে সবচেয়ে প্রিয় রঙ ছিল বাসন্তী রঙ অথবা জাফরানি রঙের বসন। শেষ যৌবনে জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে এই রঙ বদল হয়ে নীল রঙে পরিবর্তিত হয়ে গেল।

নীল ও জাফরাণি রং—তাই কবির সবচেয়ে প্রিয় রঙ নীল। নববর্ষার মেঘের রং অথবা 'সজলনীল-জলদবরণ বসনখানি' কবির প্রিয় রঙ (যাত্রী-ক্ষণিকা, বলাকা ৩৮ নং কবিতা), তারপরেই ধানী, বাদামী ও ফলসা রঙের বসন।

ঝিকিমিকি বেলা—অপরাহ্ন, কবির শেষ যৌবন (যবনিকা' ১৩০৭)।

৫। অতিথি—কবির আদিরসাত্মক কবিতাগুলির মধ্যে একমাত্র শেষ লেখা ৮ নং কবিতা ও ছায়াসঙ্গিনীতে (বিচিত্রিতা) এই অতিথি কথাটা যুক্ত। আগন্তুক, অভ্যাগত। মৃত্যু (স্মরণ ৩ সংখ্যক)।

৬। সাতাশ—'এখন ভাবনা ধরিয়ে দিলে, আমার আসল পরিচয় কোন দিকটায়। সেই আরম্ভ বেলাকার সাতাশের দিকে না, শেষ বেলাকার? পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি ৫৬০, ৫৬১ পৃষ্ঠা। ·

আরম্ভ বেলাকার সাতাশ—আরম্ভ বেলাকার সাতাশের 'কবি রবীন্দ্রনাথের' প্রথম জন্মদিনের উৎসব উদ্যাপিত করে মৃণালিনী দেবী কবিকে প্রথম অর্ঘ্য দিলেন। রবীন্দ্র রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ড 'জন্মোৎসব' (৩১৪ পৃষ্ঠা) প্রবন্ধে এই উৎসবের বর্ণনা পাওয়া যায়। আবার ২৭ জুলাই ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ মজুমদারকে একই কথা কবি লিখেছেন—'হঠাৎ একদিন বৈশাখের প্রভাতে নববর্ষের নূতন পত্রপুষ্প আলোক ও সমীরণের মধ্যে জেগে উঠে যখন শুনলুম আমার বয়স সাতাশ'—ছিন্নপত্র ১৮৮৭, খৃষ্টাব্দ শেষ সপ্তক তেতাল্লিশ সংখ্যক, জন্মদিন (সেঁজুতি) কবিতায় সাতাশের কবির প্রথম জন্মদিনের কথা প্রকাশ করে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

ছুটির যজ্ঞে পুষ্পহোমে জাগল বকুলশাখা,
ছুটির শূন্যে ফাগুনবেলা মেলল সোনার পাখা।
ছুটির কোণে গোপনে তার নাম
আচম্‌কা সেই পেয়েছিল মিষ্টি সুরের দাম, (উপহার)
কানে কানে সে নাম ডাকার ব্যথা উদাস করে
চৈত্রদিনের স্তব্ধ দুই প্রহরে (জন্মদিন)।

শেষ বেলাকার সাতাশ—চৈতালি থেকে পূরবী (১৮৯৭-১৯২০)। শেষ সাতাশের ঋণগ্রস্ত কবি যখন কল্যাণকর্মের উদ্‌বোধন করলেন তখন একমাত্র মৃণালিনী দেবীই তাঁর কল্যাণকর্মের প্রেরণাদাত্রী হয়ে কবিকে 'একটুখানি আলোর টিপ' পরিয়ে দিয়ে কবির নবজীবনের 'উদ্‌বোধন' করলেন (১৯০৭ শিলাইদহ, পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি ৫ অক্টোবর ১৯২৪, ক্ষণিকা—পূরবী)। অনাদৃত কবিকে (পত্রপুট ১৫ সংখ্যক) আরম্ভ বেলাকার সাতাশে এবং শেষ বেলাকার সাতাশে, এই দুই সাতাশে প্রথম অর্ঘ্য দিলেন মৃণালিনী দেবী। তাই পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারিতে নিতান্ত কাঁচা, জন্ম-গরিব, একেবারে অস্থিতে-মজ্জাতে বেহিসাবি রবীন্দ্রনাথ সাতাশের উপর এত জোর দিয়েছেন, এবং দুই সাতাশের এবং দুই বসন্তের নারী 'ক্ষণিকা'কে স্মরণ করেছেন এবং পূরবীতে ক্ষণিকার পরিচয় দিয়েছেন।

একটুখানি আলোর টিপ'—(পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি ৫৬১ পৃষ্ঠা,) অমৃতরস-স্মরণ। ভালোবাসা।

ব্যক্তি বিশেষকে সে ডাক দিয়ে বলে, তুমি কা'বার চেয়ে কম নও, তোমার মধ্যে এমন মূল্য আছে যার জন্য প্রাণ দেওয়া চলে।' মানুষ যেখানে আপন সীমা টেনে নিয়ে নিজেকে সাধারণের সামিল করে অলস হয়ে বসে থাকে প্রেম ব্যক্তি বিশেষের সেই সাধারণ সীমাকে মানে না, তাকে অর্ঘা দিয়ে বলে, তোমার কপালে আমি তিলক দি যছি, তুমি অসাধারণ। সূর্যের আলো বৃষ্টির জল যেমন নির্বিচারে সর্বত্রই মাটির জড়তা ও দৈন্য অস্বীকার করে, মরুকে বার বার স্পর্শ করে, তাকে শ্যামলতায় পুলকিত ক'রে তোলে যে ভূমি রিক্ত তারও সফলতার দাবি, মানুষের সমাজে প্রেম তেমনি সব জায়গাতেই অসীম প্রত্যাশা জাগিয়ে রাখে। ব্যক্তিকে সে যে মূল্য দেয় সে মহিমার মূল্য। অন্তর্নিহিত এই মহিমার আশ্বাসে মানুষের সৃষ্টি শক্তি নানাদিকে পূর্ণ হয়ে ওঠে, তার কর্মের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়' পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি ৫৭৭ ৫৭৮ পৃষ্ঠা)। অর্থাৎ সাতাশের আবেগপ্রবণ অধৈর্যপ্রকৃতির খেয়ালি উদাসীন, সবল কল্পনাপ্রবণ ও আদর্শবাদী, গৃহপ্রিয় 'কবি রবীন্দ্রনাথকে', তাঁর জীবনদেবতা দ্বিধ-দ্বন্দ্ব ভুল ভ্রান্তি, বাস্তবের ঘাত প্রতিঘাত, জয় পরাজয়, বাধা-বিরোধ ও চরম দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে নিয়তই গাঁথিয়া জুড়িয়া শেষ সাতাশের 'মহামানব, বিশ্বপ্রেমিক ও প্রে মক রবীন্দ্রনাথে' পরিণত করে দিল।

৭। অচেনা—কেউ যে কারে চিনি নাকো/সেটা মস্ত বাঁচন—ক্ষণিকা, বিচিত্রিতা, ছিন্নপত্র ১৩০ নং।

৮। শ্যামলা—বিচিত্রিতা।

৯। শ্যামলী—শ্যামলী।

১০, ১৭। স্পর্শ—'প্রিয়ার স্পর্শ থেকে' (পত্রপুট ১৩ নং কবিতা)।

রেখে গেলেম সকল প্রিয় হাতে
এক নিমেষের ছুঁয়া।

নীহারিকা—বিচিত্রিতা।

১১। বেহিসাবি—'একেবারে অস্থিতে-মজ্জাতে বেহিসাবি।' পশ্চিম-যাত্রীর-ডায়ারি—৫৬১ পৃষ্ঠা)।

১২। বিচ্ছেদ-মিলনে—সাথী পরিশেষ)।

১৩। দুঃখ সুখে—বিচিত্রা (পরিশেষ)।

১৪। আনন্দ ও বিষাদে—নাট্যশেষ (বীথিকা)।

১৫। জীবনমৃত্যুর হরণেপূরণে—জীবনস্মৃতি ১১৯ পৃষ্ঠা।

১৬। বিরহানন্দ—মানসী।

১৮। জীবন দেবতা—দেহস্থ আত্মা, সুখ দুঃখ ভোক্তা। অন্তরস্থ পরম জ্ঞান, যে জ্ঞানের দ্বারা আমরা সুখ দুঃখ, বাধা বিপত্তি, ভুল ভ্রান্তি উত্থান পতনের মধ্যেও জীবনকে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত করিয়া জীবনের অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলি সেই পরম জ্ঞানই অন্তরস্থ জীবন দেবতা।

১৯। রাজা (১৯১০), অরূপ রতন (১৯২০)।

'রাজা' নাটকের পরিবর্তিত রূপ 'অরূপ রতন'।

অরূপ—মূর্তিশূন্য, নিরাকার, রূপহীন।

রতন (রত্নমালা, রত্নহার)—প্রেম। শেষ সপ্তক এক, রোগশয্যায় ২৭ নং।

অরূপ রতন—কবি রূপহীনের মধ্যে রূপকে, অসুন্দরের মধ্যে সুন্দরকে, এবং কঠিনের মধ্যে প্রেমকে (রতন) খুঁজে পেলেন।

আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়
সত্য যে কঠিন, (সত্য-প্রেম-মংপুতে রবীন্দ্রনাথ)।
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।

রাজা—অরূপ প্রেম, মৃত্যু দেবতা (আত্মপরিচয় ১২৭, ১২৯ পৃষ্ঠা)। কবি মৃত্যুর (অন্ধকার, ভয়ঙ্কর) মধ্য দিয়ে অরূপ প্রেমকে উপলব্ধি করলেন। এই প্রেম বিশ্ব ও বিশ্বমানবের কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অসীমে উপনীত হল। 'রাজা' নাটকটি কবির সংশয়িত প্রেমেরই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের রূপক কাহিনী। যে নাটকগুলি কবির জীবনের সঙ্গে জড়িত রয়েছে সেই নাটকগুলিই কবি বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন তাঁর আত্মপরিচয়ে ১২৯ পৃষ্ঠা (রাজা), ও পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারিতে (রক্ত করবী—৪৫৬ পৃষ্ঠা) এবং বলাকা কাব্য-পরিক্রমায় ঋণ শোধ—১৩৪ পৃষ্ঠা)।

কবি আত্মপরিচয়ে লিখেছেন—রাজা নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা, তারপরে সেই ভুলের মধ্য দিয়ে, পাপের মধ্য দিয়ে, যে অগ্নিদাহ ঘটালে যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে, তাতেই তো

তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। ভুল রাজা—ভুল প্রেম, ভালোলাগা, ভোগের তৃপ্তি বা রূপের মোহ। সত্য মিলন---অরূপ-প্রেম, ত্যাগের সাধন।

প্রথম যৌবনে কবি প্রেমের স্বরূপকে উপলব্ধি করতে চাইলেন (শেষ কথা-কড়ি ও কোমল)। প্রেমকে তিনি বাইরে মিথ্যা রূপের মধ্যেই খুঁজেছিলেন। তারপর কবির সংশয়িত প্রেম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভুল ভ্রান্তি, ও সাংসারিক দুর্যোগের চরম দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে (আগুনলাগা-দুঃসময়-চিত্রা, কল্পনা। ঋণগ্রস্ত কবি, অন্ধকারে অসুন্দরের মধ্যে সুন্দরকে, অরূপের মধ্যে রূপকে এবং কবির বহু আকাঙ্ক্ষিত 'দুর্লভ ভালোবাসাকে' এবং তারই সঙ্গে 'একাগ্র গভীর ভালোবাসাপূর্ণ একটি হৃদয়'কে তিনি খুঁজে পেলেন (য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী ৪৫৬, ৪৫৭ পৃষ্ঠা, চিঠিপত্র ৮ম খণ্ড, ১০ আগষ্ট ১৮৯৯ ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থ)। প্রেমের এই সত্য রূপকে (কল্যাণ রূপ) কবি অন্তরের আনন্দরসে উপলব্ধি করলেন। এবং মৃত্যুর (ভয়ঙ্কর, কঠিন, অন্ধকার) মধ্য দিয়ে এই প্রেমকে মানব কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করে (বলাকা কাব্যগ্রন্থ-১৯১৪-১৬) 'অরূপ রতনের' সন্ধান পেলেন।

২০। পাখি—হৃদয়, আত্মা, মন

লাজুক পাখি—লাজুক হৃদয় (চাবি-পূরবী)।

২১। দীপশিখা—প্রিয়া (চৈতালি)।

তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে,
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।

যিনি 'ভীরুদীপশিখা' নিয়ে কবির বসন্ত রাতে ক্ষণিকের জন্য এসেছিলেন তিনিই কবি প্রিয়া।

ভীরু, কম্পিত—কুণ্ঠিতা নারী।

গোধূলি-বেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে
লয়ে তার ভীরু দীপশিখা।
দিগন্তের কোন পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা।

আবার গীতালির ১০০ নং কবিতায় লিখেছেন—

কেহ বা কম্পিত দীপশিখা এনেছিলে মোর ঘরে।

২২। বসন্ত রাত—বসন্ত (কল্পনা)।

আমার বসন্তরাতে চারি চক্ষে জেগে উঠেছিল
যে কয়টা কথা।

ছিন্নপত্র ৫৫ সংখ্যকে লিখেছেন—'তেতালার ছাতের গুটি কতক রাত্রি। আবার গীতালির ১০৮ নং কবিতায় লিখেছেন 'কেহ রাতে, বসন্তে'।

২৩। 'তোমরা যাহার নাম জান না'—অখ্যাতা (বলাকা ৫ নং) অগৌরবা নারী। অথবা 'আমরা যাহার খোঁজ পাই নাই (রোগ শয্যায় ১০ নং কবিতা)।

২৪। অগৌরবা—গৌরবহীনা নারী (বলাকা ৫ নং)।

২৫। প্রচ্ছন্ন—যে নারী মলিন বেশে সবার পিছনে দাঁড়িয়ে 'প্রচ্ছন্ন' হয়ে রয়েছেন (খেয়া, বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, ক্ষিতিমোহন সেন ১০৪, ১০৫ পৃষ্ঠা)। প্রচ্ছন্ন বীথিকা—দৃষ্টির অগোচরে যে নারী। অশরীরী নারী (পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি ৫৪০ পৃষ্ঠা)।

হে চির প্রচ্ছন্ন—যে নারী চিরদিন প্রচ্ছন্ন হয়ে কবির জীবনে ও কাব্যে রয়ে গেছেন (পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি ৫৭৫ পৃষ্ঠা)।

২৬। ভালো—ঘরে কাজ করি শান্ত হয়ে ;/সবাই বলে 'ভালো' (বাঁশিওআলা-শ্যামলী)। সবাই আমায় বললে লক্ষ্মী সতী/ভালোমানুষ অতি! (মুক্তি-পলাতকা)। আপনার ভাষাটি 'ভালো' (চিঠিপত্র প্রথম খণ্ড)। কবি 'বাংলা দেশের মেয়ের' পরিচয় দিয়েছেন গৃহকর্মনিপুণা ও 'ভালো' (সরল) কথাটি উল্লেখ করে।

২৭। সত্তা—

রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যময় জীবন ও কাব্যের মধ্যে তাঁর যে আসল পরিচয়টুকু পাওয়া যায় তা হচ্ছে তিনি শ্রেষ্ঠ রোম্যান্টিক (নব জাতক) ও বিরহী কবি (উৎসর্গ) এবং শ্রেষ্ঠ প্রেমিক (আত্মপরিচয় ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২১৫ পৃষ্ঠা)। তাঁর কবি সত্তায়—

সুন্দরের কাছে পেয়েছে অমৃতের কণা
ফুলের থেকে, পাখির গানের থেকে,
প্রিয়ার স্পর্শ থেকে, প্রণয়ের প্রতিশ্রুতি থেকে,
আত্মনিবেদনের অশ্রু গদ্ গদ্ থেকে,
মাধুর্যের কত স্মৃতরূপ কত বিস্মৃত রূপ
দিয়ে গেছে অমৃতের স্বাদ,
আমার নাড়ীতে নাড়ীতে। পত্রপুট তেরো।

আর কবির প্রেমিক সত্তায়—

আমার ভালোবাসার আর—একটা ধারা
মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিত-বাহিনী।

মহীয়সী নারী স্নান করে উঠেছে
তারই অন্তল থেকে।
সেএসেছে 'অপবিসীম ধ্যান রূপে (ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া—অধরা)
আমাব সর্ব দেহে মনে,
পূর্ণতির কবেছে আমাকে আমার বাণীকে।
জ্বেল রেখেছে মামাব চেতনাব নিভৃত গভীরে
চিব বিরহের প্রদীপ শিখা (পত্রপুট পনেবো)।

কবি সেঁজুতির 'জন্মদিনে' তাঁর ভালোবাসাব কথা প্রকাশ করে লিখেছেন—

সেই ভালোবাসা মোবে তুলছে স্বর্গেব কাছাকাছি
ছাড়ায় তোমাব অধিকাব। আমাব সে ভালোবাসা
সব ক্ষযক্ষতি শেষে অবশিষ্ট রবে, তার ভাষা
হযতো হাবাবে দীপ্তি অভ্যাসেব ম্লান স্পর্শ লেগে
তবু সে অমৃতরূপ সঙ্গে রবে যদি উঠি জেগে
মৃত্যু পবপারে।

আর কবি পশ্চাতে রেখে যাবেন---

আব রবে পশ্চাতে আমাব নাগকেশরেব চাবা
ফুল যার ধবে নাই, আব রবে খেযাতবী হাবা
এ পারেব ভালোবাস ---বিবহ স্মৃতির অভিমানে
ক্লান্ত হযে বাত্রি শেষ ফিরিবে সে পশ্চাতেব টানে

কবির এই দুই প্রধান সত্তার পাবেই রযেছে অন্যান্য বিভিন্ন সত্তা—প্রকৃতি প্রেম (সোনার তরী, ছিন্নপত্র), বাৎসল্য প্রেম (প্রভাত সংগীত, শিশু কাব্যগ্রন্থ) শিল্পী সত্তা (সৃজন ধর্মী কবি-মন—মানসী, ক্ষণিকা, অধরা ও বাংলা দেশের মেযে), প্রেমিক সত্তা (ক্ষণিকা, কড়ি ও কোমল) শিশু সত্তা (শিশু ভোলানাথ কাব্যগ্রন্থ), চিত্র শিল্পী (শেষ সপ্তক ষোলো, পশ্চিম যাত্রীর ডাযারী), বিরহী মন (উৎসর্গ) সংগীত সত্তা (শৈশব সংগীত, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি), নারী সত্তা (অনুভূতি প্রবণ মন), কর্মী ও আদর্শ সত্তা (বলাকা কাব্যগ্রন্থ—কল্যাণ ধর্মী কবি-মন), আধ্যাত্মিক সত্তা (প্রান্তিক, রোগশয্যায), দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রকৃতিব সমস্ত ঐশ্বর্য। তাই কবি পত্রপুট তেরো সংখ্যক কবিতায় তাঁব সমস্ত সত্তাকে প্রকাশ করে বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে লিখেছেন—

জীবনের অলক্ষ্য গভীরে
আমার এই পত্রদূতগুলির সংবাহিত দিনরাত্রির যে সঞ্চয়

অসংখ্য অপূর্ব অপরিমেয়
যা অখণ্ড ঐক্যে মিলে গিয়েছে আমার আত্মরূপে,
যে রূপের দ্বিতীয় নেই কোনোখানে কোনো কালে,
তাকে রেখে দিয়ে যাব কোন্ গুণীর কোন রসজ্ঞের
দৃষ্টির সম্মুখে,
কার দক্ষিণ করতলের ছায়ায়
অগণ্যের মধ্যে কে তাকে নেবে স্বীকার করে।

আর এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে—

দুই প্রকৃতির নারী—একাকিনী (সনাতনী) ও বিচিত্র রূপিণী (আধুনিকা)।

দুই প্রকারের প্রেম—ভালোলাগা ও ভালোবাসা (পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি)।

মৃত্যুর দুই রূপ—উদ্ভ্রান্ত রূপ (জীবনস্মৃতি ১১৮, ১১৯ পৃষ্ঠা) ও কল্যাণ রূপ (চিঠিপত্র দশম খণ্ড ১১ পরিচ্ছেদ, স্মরণ ১৩, আরোগ্য ১২)।

কবির দুই সাংসারিক সত্তা—গৃহী (সীমা) ও সন্ন্যাসী সত্তা (অসীম)। (ছিন্নপত্র ৭৮, ১৪৪ সংখ্যক, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ) ও বিরহী মন (উৎসর্গ) কবির সমগ্র জীবন ও কাব্যকে প্রভাবান্বিত করেছে।

বসন্ত—

'বসন্ত বারে বারেই তার ফুলের সমারোহ ভুলে গিয়ে শূন্য সাজি হাতে অন্যমনস্ক হয়ে উত্তরের দিকে চলে যায়, সেই ভুলের ফাঁকা রাস্তা দিয়েই ফুলের দল তাদের নবজন্মের সিংহদ্বার খোলা পায়' (পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি ৫৪৪ পৃষ্ঠা, আত্মপরিচয়—২০১ পৃষ্ঠা)। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ বসন্তের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। নবযৌবনের 'বাতায়নবাসী কবি' (ভূমিকা—ছবি ও গান, জীনবস্মৃতি) **বসন্তের সূচনা** করছেন ছবি ও গান কাব্যগ্রন্থের অনাগত 'কে' কবিতা দিয়ে, এবং **নব বসন্তের** 'গীতোচ্ছ্বাস' রয়েছে 'নূতনে'র উদ্দেশ্যে কড়ি ও কোমল কাব্যগ্রন্থে। তারপর **বসন্তের সমাপ্তি** সংগীত গাইলেন চিত্রায় 'প্রৌঢ়' কবিতায় ৭ ফাল্গুন ১৩০২ বঙ্গাব্দে। অকাল বসন্তের পূর্বাভাষ রয়েছে চৈতালিতে (১৩০২ চৈত্র, বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা ৮৮ পৃষ্ঠা)। কল্পনাতে অকাল বসন্তের আগমন 'বসন্ত' কবিতায়। ক্ষণিকাতে শেষ যৌবনের শেষ বসন্ত বা **অকাল বসন্ত।** উৎসর্গ কাব্যগ্রন্থে অকাল বসন্তের অবসান 'উৎসর্গ আট সংখ্যক' (সংযোজন) কবিতায়,—বিরহী কবি। পূরবীতে শেষ সাতাশের

শেষ বসন্ত। এবং যদুযাতে কবি 'ধ্যানের ধনখানি' বিশ্বের কাছে সঁপে '*প্রথম বসন্তকে*' বোধন করে নব পরিচয়ে নব রূপে 'উজ্জীবন' করে নূতন ভাবে যাত্রা সুরু করলেন (২২ ফাল্গুন ১৩৩৯ দোল পূর্ণিমা)।

প্রথম বসন্ত—কাব্যগ্রন্থের প্রথম ভাগ অথবা 'শূন্য দ্বীপের সৈকত তীর'—

'কবিতা যে লেখে কবিতাগুলির অন্তরের ইতিহাস তার কাছে সুস্পষ্ট। বাইরে প্রকাশে কবিতাগুলি উজ্জ্বল হয়েছে কি না হয়তো সেটা তার পক্ষে নিশ্চিত বোঝা কোনো কোনো স্থলে সহজ হয় না। কিন্তু, এই সংকলন উপলক্ষে একটি কথা বলবার সুযোগ পাব প্রত্যাশা করে এ কাজে হাত দিয়েছি। যাঁরা আমার কবিতা প্রকাশ করেন অনেক দিন থেকে তাঁদের সম্বন্ধে এই অনুভব করছি যে, আমার অল্প বয়সের যে সকল রচনা স্খলিত পদে চলতে আরম্ভ করেছে মাত্র, যারা ঠিক কবিতার সীমার মধ্যে এসে পৌঁছয় নি, আমার গ্রন্থাবলীতে তাদের স্থান দেওয়া আমার প্রতি অবিচার। সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাত সংগীত ও ছবি ও গান এখনো যে বই আকারে চলছে, একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণ-দোষ। এই তিনটি কবিতাগ্রন্থে আর কোনো অপরাধ নেই, কেবল একটি অপরাধ লেখাগুলি কবিতার রূপ পায় নি। ডিমের মধ্যে যে শাবক আছে সে যেমন পাখি হয়ে ওঠে নি—এটাতে কেউ দোষ দেবে না, কিন্তু তাকে পাখি বললে দোষ দিতেই হবে। ওই তিনটি বইয়ের যে-কয়টা লেখা সঞ্চয়িতায় প্রকাশ করা গেল তা ছাড়া ওদের থেকে আর-কোনো লেখাই আমি স্বীকার করতে পারব না। ভানুসিংহের পদাবলী সম্বন্ধেও সেই একই কথা। কড়ি ও কোমলে অনেক ত্যাজ্য জিনিষ আছে, কিন্তু সেই পর্বে আমার কাব্য ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে' (সঞ্চয়িতার ভূমিকা-পৌষ ১৩৩৮)।

'এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টি-প্রবণতা দেখা দিয়েছে। যৌবন হচ্ছে জীবনে সেই ঋতুপরিবর্তনের সময় যখন ফুল ও ফসলের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা নানা বর্ণে ও রূপে অকস্মাৎ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। কড়ি ও কোমল আমার সেই নব যৌবনের রচনা। আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ তখন যেন প্রথম উপলব্ধি করেছিলুম। আপনার মধ্য থেকে যা প্রকাশ পাচ্ছিল, সে আমার কাছেও নূতন এবং আন্তরিক' (কড়ি ও কোমলের ভূমিকা)।

কবি জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, 'মানব জীবনের বিচিত্র রসলীলা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে, এই কথাটাই কড়ি ও কোমলের কবিতার

ভিতর দিয়া নানা প্রকারে প্রকাশ পাইতেছে। এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার ও তাহাকে সকল দিক দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য একটি অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, এই কবিতাগুলির মূল কথা।' তাই কড়ি ও কোমল কাব্যগ্রন্থটি কবির জীবনের নূতন পর্ব—নব যৌবনের নব বসন্ত এবং 'শূন্য দ্বীপের (বিস্মরণধর্মী জীবন) সৈকত তীর' ও কাব্যগ্রন্থের 'প্রথম ভাঙা'।

এই বসন্ত কবিতাগুলির মধ্যে কবি-মনের গতি প্রকৃতি অনায়াসে নির্ণয় করা যায় এবং কবির যৌবনের আনন্দ বেদনার ও সংশয়িত প্রেমের ছবি এই কবিতাগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে।

আবার কবির বিভিন্ন বয়সের আলোকচিত্র ও পোষাকের পরিবর্তনও কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে সমভাবে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে বিশেষভাবে ক্ষণিকার পরবর্তীকালের আলোক চিত্রগুলিতে। 'কিন্তু সমস্তের সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু থাকা চাই, যার ইঙ্গিত ধ্রুবের দিকে সেই বৈরাগ্যের দিকে যা অনুরাগকেই বীর্যবান ও বিশুদ্ধ করে।' 'আত্মপরিচয়ে' কবির এই বিখ্যাত উক্তিটি তাঁর জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে যেমন প্রযোজ্য তেমনি তাঁর আলোকচিত্র ও পোষাক সম্বন্ধেও সমান ভাবে প্রযোজ্য, দুইই একই বিন্দুতে এসে মিলেছে।

উৎসর্গ পত্র

রবীন্দ্রনাথের উৎসর্গপত্রগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অর্থপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময়। এই উৎসর্গপত্রগুলির মধ্যেই কবি-মনের গতি প্রকৃতি নিহিত রয়েছে এবং এর সঠিক অর্থের মধ্যেই রয়েছে কার উদ্দেশ্যে কাব্য গ্রন্থখানি উৎসর্গীকৃত। কবির প্রথম যুগের কাব্যগ্রন্থে যে সকল উৎসর্গপত্র কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশ্যে রচনা করেছেন তা হেয়ালিপূর্ণ হলেও অত্যন্ত সহজবোধ্য এবং সংখ্যায়ও অধিক। কিন্তু স্বল্প কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রের ভাষা ও ভাব অত্যন্ত জটিল এবং সহজ বোধ্য নয় এবং উপহার দিয়েছেন প্রচ্ছন্নভাবে। মানসী এবং গীতালি কাব্য-গ্রন্থের উৎসর্গপত্র এই শ্রেণী ভুক্ত। আবার কতকগুলি কাব্যগ্রন্থে শুধু কবিতায় মনের ভাব প্রকাশ করেছেন (চৈতালি, মহুয়া) য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী এবং ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রের মধ্যে রয়েছে একটি অদৃশ্য যোগাযোগ, যেখানে কবি ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থের সূচনা ও মূল অর্থের আভাস পরিহাসছলে কবিতায় উৎসর্গ-পত্রের মাধ্যমে লোকেন পালিতকে দিয়ে গেছেন। খেয়া কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রে

রয়েছে লজ্জাবতী লতার পাতার ভাঁজে লুকিয়ে থাকা কবির লাজুক হৃদয়ের সত্য, ক্ষুদ্র ও গোপন মর্মকথা যা' জীবনমৃত্যুর রৌদ্রছায়ার মধ্যে দোদুল্যমান। কবির লুকিয়ে থাকা গোপন হৃদয়ের এই সত্য ক্ষুদ্র মর্মকথাটি খেয়া কাব্যগ্রন্থের কবিতার মধ্যে 'প্রচ্ছন্ন' হয়ে রয়েছে যা' জীবনমৃত্যুর রৌদ্রছায়ার মধ্যে লিখিত। আর সেই লাজুক হৃদয়ের গোপন কথাটি, কবি, খেয়া কাব্যগ্রন্থের কবিতার মধ্যে বন্ধু জগদীশ চন্দ্র বসুকে যত্ন তার খুঁজে নিতে বলেছেন।

উৎসর্গপত্র বিহীন শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথ 'স্মরণ' কবিতার পরে লিখেছেন উৎসর্গ ও খেয়া কাব্যগ্রন্থ। তারপরেই আছে উৎসর্গপত্র বিহীন শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য। কিন্তু গীতালির উৎসর্গপত্রে প্রচ্ছন্নভাবে উপহার দিয়ে কবি হৃদয়ের মর্মকথাটি বিশ্লেষণ করেছেন—আমার বলে যাদের উদ্দেশ্যে কবি অতীতে যে প্রদীপ খানি জ্বালিয়ে ছিলেন সেই প্রদীপ খানি এবার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ভেঙে দিলেন। এবং পরবর্তী অধ্যায়ে এই আলো বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্বের হউক বলে কবি নূতনভাবে যাত্রা সুরু করলেন।

যে প্রদীপ জ্বলেছিল মিলন—শয্যার পাশে
সেই প্রদীপ এনেছিলেম হাতে করে।
তার শিখা নিবল আজ,
সেটা ভাসিয়ে দিতে হবে স্রোতে।

পরিশিষ্ট

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থে কয়েকটি কবিতা এবং শব্দ বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত হলেও তাদের মধ্যে একটা সুসমঞ্জসভাবে একই অর্থ দেখা যায়। যেমন দৈবক্রমে, বিদেশিনী, ভিক্ষা, অভিমান, আঙুর ফল ইত্যাদি শব্দ।

দৈবক্রমে অথবা দৈবে—দৈবক্রমে তুমি আমার কাছে এসে পড়েছ এসো (য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী ৪৫৩ পৃষ্ঠা, আমার সুখ-মানসী)।

সেখানে দৈবে কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল—শেষ সপ্তক ছয় সংখ্যক।

এ একটা আকস্মিক সংযোগ (ছিন্নপত্র ১৩০ সংখ্যক)।

সে কি অকস্মাৎ? (স্মরণ ১৫ সংখ্যক)।

যিনি দৈবক্রমে কবির জীবনে এসেছিলেন, যার প্রথম উল্লেখ য়ুরোপ-যাত্রীর-ডায়ারীতে ও মানসীতে)।

বিদেশিনী—ভিন্নদেশীয়া নারী।

বিদেশিনী—'আমার কাছে রহিলে বিদেশিনী/লইলে শুধু নয়ন মম জিনি' (অচেনা-বিচিত্রিতা)। বিদেশিনীর মতোই অচেনা।

'শুনে যাও বিদেশিনী' (অথবা-সানাই)। অশরীরী নারী অথবাও বিদেশিনী।

'হে বধুবেশিনী, ওগো বিদেশিনী' (নব-বধূ) অচেনা-নারী নববধূও বিদেশিনী।

'বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।/যখনি শুধাই ওগো বিদেশিনী' (নিরুদ্দেশ যাত্রা—সোনার তরী, ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩০০)। স্বপ্নময় কাব্যতরণীর কর্ণধার সুন্দরী প্রেয়সী কবিতাও বিদেশিনী রূপে সম্বোধিত। রবীন্দ্রনাথ অচেনা নারী, প্রেয়সী কবিতা, অথবা, নববধূবেশিনী কিংবা প্রেয়সী নারীকেও বিদেশিনীরূপে উল্লেখ করেছেন।

সূচনা :—

তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিল (জীবনস্মৃতি—২৫ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ চেনা মানুষের মধ্যেই রয়েছে অচিন মানুষ, যার বিশ্লেষণ রয়েছে জীবনস্মৃতিতে, ছেলেবেলা—১৬১ পৃষ্ঠায়, ছিন্নপত্র ১৩০ সংখ্যকের প্রথম, কয়েকটি লাইনে, লিপিকায়, বাউলের গানে এবং কবিতায় রূপ দিয়েছেন 'শেষ সপ্তক তেরো

সংখ্যকে' ক্ষণিকা ও বিচিত্রিতার 'অচেনা' কবিতাগুলিতে।

আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী।

কবির চেনা প্রেয়সীকে সিন্ধুপারের 'অচেনা' বিদেশিনী রূপে সাজালেন। এই কবিতাটি লিখেছেন ১১ অক্টোবর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে শিলাইদহে। সেই সময়কার মনের ভাব ৬ অক্টোবর ছিন্নপত্র ২৩৭ নং থেকে ১৬ অক্টোবর ছিন্নপত্র ২৪০ নং এর মধ্যে প্রকাশিত। অর্থাৎ কবির চেনা মানুষই বিদেশিনীর সাজে অচেনা মানুষের রূপ নিয়ে অপরূপ মূর্তিতে কবির মনের মধ্যে আনাগোনা করে —বিদেশিনীর এই একটি অর্থ ই রবীন্দ্রনাথ করেছেন। ক্ষণিকার পরবর্তীকালে এই বিদেশিনীকে কখনো 'অচেনা' (ক্ষণিকা, বিচিত্রিতা) কখনো 'অপরিচিতা' (ছিন্নপত্র ১৩০ সংখ্যক, পূরবী) কখনো নববধূবেশিনী (নববধূ—মহুয়া) রূপে সাজিয়ে বিশ্ববিমোহিনী বিদেশিনী 'অধরা মাধুরীতে' (সানাই) পরিবর্তিত করে ছন্দের বন্ধনে 'শেষ সপ্তক তেরো সংখ্যকে বেঁধে দিলেন—

অচিন পাখি তুমি,
মিলনের খাঁচায় থাক,
নানা সাজের খাঁচা।
সেখানে বিরহ নিত্য থাকে পাখির পাখায়,
স্তব্ধিত ওড়ার মধ্যে।

যা শান্তিনিকেতনে বাউলের গানে শুনেছিলেন—

খাঁচার মাঝে অচিন পাখি কেমনে
আসে যায়,
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম
পাখির পায়।

শেষ সপ্তক তেরো সংখ্যক কবিতাটি এই বাউলের গানকে অবলম্বন করে 'ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়ার' (শেষ সপ্তক আটত্রিশ সংখ্যক) পরিচয় দিয়ে বিশ্ববিমোহিনী বিদেশিনী নারী 'অধরা'র (সানাই) উদ্দেশ্যে লিখেছেন—

অধরা ছিল তোমার দূরে-চাওয়া চোখের
পল্লবে,
অধরা ছিল তোমার কাঁকন-পরা নিটোল হাতের
মধুরিমায়।

ওকে ভিক্ষে দিলে পাঠিয়ে,
ও গেল চলে ;
জানলে না এইখানে তোমারই কথা।

'মাঝে মাঝে বদ্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়, মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু পারে না, এই অচিন পাখির নিঃশব্দ যাওয়া-আসার খবর গানের সুর ছাড়া কে দিতে পারে।' (জীবন স্মৃতি—২৫, ২৬ পৃষ্ঠা, ছেলেবেলা—১৬১ পৃষ্ঠা)।

সত্য—অমিথ্যা, যথার্থ, প্রতিজ্ঞা, শপথ।

সত্য—প্রেম—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ।

ভিক্ষা—ভিক্ষা ভিক্ষা সব ঠাঁই/তবে আর কোথা যাই ভিখারিনী হল যদি কমল আসনা (পুরুষের উক্তি-মানসী)।

সেখানে গিয়ে করেছ চুপ /ভিক্ষা গেল থামি (অন্তর্হিতা-পরিশেষ)।

অতিথ হয়ে দিই নি দ্বারে সাড়া,/ভিক্ষাপাত্র নিই নি কাতর করে (ভর্ৎসনা—কণিকা)।

প্রেম ভিক্ষা করা।

অভিমান—রূপ কেন রাহুগ্রস্ত মানে অভিমানে (পুরুষের উক্তি—মানসী)। তোমার অভিমান/আঁধার করে আছে আমার সমস্ত জগৎ (অদেয়-সানাই)। প্রেমের জন্য অভিমান।

সজলনীল-জলদ-বরণ বসন খানি গায়ে—নীল বসন পরিহিতা নারী—শ্যামলী নারী (যাত্রী-কণিকা)। কবির শেষ কাব্যলক্ষ্মী। কবির প্রিয় রঙ নীল কারণ তাঁর প্রেমের রঙও নীল। তাই বলাকা কাব্য-পরিক্রমা ৩৮ সংখ্যাকে বলেছেন—'অসীম প্রেমের নীলধারা যেন সংগীত বসন হয়ে ছেয়ে ফেলেছে।' কবির প্রেমের সঙ্গে সংগীতও যুক্ত। 'মোর প্রেম এল গান গেয়ে'—কবি যাঁকে প্রথম যৌবনে গান দিয়ে বরণ করে নিয়েছিলেন।

সংগীত শতদল—'দাঁড়ায়েছ সংগীতের শতদলদলে' (স্মরণ নয় সংখ্যক)। 'মানস-তরঙ্গ-তলে বাণীর সংগীত শতদল' (আহ্বান-পূরবী)।

যিনি সংগীতের শতদলদলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁকেই কবি পূরবীতে 'আহ্বান' করলেন। কবির যৌবনের প্রেমের গান 'এই শ্যামলী বাংলা দেশের

র উদ্দেশ্যেই রচিত—'সে নামবে 'না গানের আসন থেকে/সে লিখবে তোমাকে চিঠি/রাগিণীর আবছায়ায় বসে।'

বাঁশিওআলা—রবীন্দ্রনাথ। শ্যামলী কাব্যগ্রন্থের 'বাঁশিওআলা'। সুরকার ও গীতিকার রবীন্দ্রনাথ—প্রাণরঙ্গভূমিতে ছিলুম বাঁশি বাজিয়ে (শেষ সপ্তক ছয়)।

অচেনা—'কেউ যে কারে চিনি নাকো/সেটা মস্ত বাঁচন' (ক্ষণিকা)।

'অনেকদিন দিয়েছ তুমি দেখা./বসেছ পাশে তবুও আমি একা' (বিচিত্রিতা)।

'যতটুকু লেশমাত্র চিনি দুজনায়./তাহার অনন্তগুণ চিনি নাকো হায় (ক্ষণ-মিলন-চৈতালি)।

'তুমি চেন না আমাকে,/তোমাকে চিনি নে আমি/আজ পর্যন্ত কেমন করে এটা হল তাই আমি ভাবি' (পত্রপুট ১৫ সংখ্যক)।

দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে./বুঝাতে নারে আপনায় (নব নারী—সোনার তরী)।

অচেনা চরিত্র, অমিল চরিত্র, কবির বিপরীত চরিত্রের নারী, তাই তিনি অচেনা ছিলেন—'সেই কথা ভেবে দেখলে সবাইকে অপরিচিত বলে বোধহয়' (ছিন্নপত্র ১৩০ সংখ্যক)।

'খেয়া' শব্দটি কবি বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন কবিতায় লিখেছেন। খেয়া শব্দের ভিন্ন অর্থের প্রথম উৎপত্তি ও তার বিশ্লেষণ 'গোড়ায় গলদ' গদ্য নাটকে (১৮৯২)। পরবর্তীকালে বিচিত্রিতার 'বরবধূ' কবিতায় ও তার বিশ্লেষণ করেছেন।

খেয়া—নৌকা। খেয়া পারাপার বন্ধ হয়েছে আজিরে (আষাঢ়-ক্ষণিকা)।

খেয়া দেওয়া—যোগাযোগ স্থাপন করা। দুই হৃদয়ের মাঝে সংযোগ স্থাপন কারি নৌকা—'এই সংসার সমুদ্রে দিব্যি একটি খেয়া জমিয়েছি—একে একে তোদের দুটিকে আইবুড়ো—কুল থেকে বিবাহ কুলে পার করে দিয়েছি।' গোড়ায় গলদ (১৮৯২)।

বর বধূ—'বিরহ নদী জলে খেয়ার তরী চলে/যায় সে মিলনেরই ঘাটে' (বিচিত্রিতা)—বর এবং বধূর সংযোগ স্থাপন কারি নৌকা। দুই হৃদয়ের মিলন।

নারী, বধূ—'আমি তোমার খেয়াল স্রোতে তরী/প্রথম দেওয়া খেয়া'—খেয়ালি পুরুষের প্রথমা নারী (নীহারিকা...বিচিত্রিতা)।

'ভোর বেলাকার পাখির ডাকে প্রথম খেয়া এসে/ঠেকল যখন সব প্রথমের চেনাশোনার দেশে' (জন্মদিন—সেঁজুতি)। প্রথমা নারী অথবা বধূ।

'আর রবে খেয়াতরী হারা—এ পারের ভালোবাসা' (জন্মদিন—সেঁজুতি)।

খেয়া কাব্যগ্রন্থ—এ যে আমার লজ্জাবতী লতা। খেয়া কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গ পত্র—কবির লাজুক হৃদয়ের গোপন কথা, যা' 'শেষ খেয়া' কবিতায় 'প্রচ্ছন্ন' (খেয়া)ভাবে উল্লেখিত। লজ্জাবতী লতা (রূপক)—কবির লাজুক হৃদয়ের গোপন কথা যা' 'প্রচ্ছন্ন' হয়ে লজ্জাবতী লতার পাতার ভাঁজের মধ্যে নীরবে লুকিয়ে রয়েছে। কবির এই জীবনমৃত্যুর রৌদ্র ছায়ায় দোদুল্যমান হৃদয়ের নীরব ক্ষুদ্র, সত্য এবং গোপন কথাটি বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসু যেন খেয়া কাব্যগ্রন্থের কবিতার মধ্যে বস্তুভার খুঁজে নেন।

দেহ—'জন্ম মোর বহি যবে/খেয়ার তরী এল ভবে' (নব পরিচয়—বীথিকা)। 'খেয়া ছাড়িবার আগে তীরের বিদায় স্পর্শ দিতে' (রোগশয্যায)।

'ভাসিবে যবে খেযার তরী কেহ কি উপকূলে/রচিবে ডালি নাগকেশরের ফুলে' (আবেদন—বীথিকা)।

কাব্য তরী—'যেদিন খেযা ধরেছিলাম ছাযা বটের ধারে/ভোরের সুরে ডেকেছিলাম কে যাবি আয় পারে' (যৌবন বিদায—ক্ষণিকা)।

মৃত্যু তরী—'গিযেছে তার ছাযা মুরতি কালের খেয়া পারে (ছায়াছবি-বীথিকা)।

'আমার মেলা ভাঙবে যখন দেব খেয়ায পাড়ি' (নূতন শ্রোতা –পরিশেষ)।'

খেয়া শব্দটি কবি নানা অর্থে প্রযোগ করেছেন—

ওগো সন্ধ্যা শেষ প্রহরের নেয়ে,/ভাসাও খেয়া ভাটার গঙ্গা বেয়ে।

খেয়া—অস্তের খেয়া (নামকরণ—আকাশ প্রদীপ), উজানের খেয়া (বিমুখিতা সানাই), গানের খেয়া (রোগশয্যায় তিন সংখ্যক)। পারের খেয়া (শেষ লেখা ১০ সংখ্যক) প্রদীপের খেয়া (আকাশ প্রদীপ—ছড়ার ছবি)। ঘরের খেয়া (ছড়ার ছবি)।

তরী—নৌকা। গান গেয়ে তরী বেযে কে আসে পারে (সোনার তরী)।

সোনার তরী—স্বপ্নময কাব্যতরণী—'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই—ছোট সে তরী/আমারি সোনার ধানে গিযেছে ভরি' (সোনার ধান—কাব্যের ফসল)।

এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল সোনার তরীতে' অর্থাৎ স্বপ্নময় কাব্য তরণীতে। রাজার ছেলে, রাজার মেয়ে, বিম্ববতী, মানসসুন্দরী, 'নরদেশ

যাত্রা প্রভৃতি কবিতায় স্বপ্নময় মনের আভাস পাওয়া যায়, যা' ছিন্নপত্রের মধ্যে ধরে রেখেছেন ১৯, ২২ সংখ্যকে। রূপকথার জগৎ।

গানের তরী—'কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে।'

দেহ—'আমি তোমার খেয়াল স্রোতে তরী' (নীহারিকা—বিচিত্রিতা)। মনে পড়ে কবে ছিলেম একা বিজন চরে, তোমার নৌকা ভরা পালের ভরে/সুদূর পারের হতে/কোন অবেলায় এল উজান স্রোতে' (হঠাৎ মিলন—সানাই)।

কাব্য তরী—"সে ছিল আরেকদিন এই তরী 'পরে" (স্মৃতি—চৈতালি)। "তুমি ওগো ক্ষণেক তরে বসবে আমার তরী 'পরে" (যাত্রী-কণিকা—১৯০০)।

বিরহী কাব্যতরী—বিরহী নেয়ে। অগৌরবার বাড়িয়ে গরব/করবে আপন সাথী/বিরহী মোর নেয়ে' (বলাকা পাঁচ সংখ্যক, ১৯১৪)।

সীমা—অন্ত, শেষ, কায়া, নারী, বালিকা রূপিণী সীমা। বলাকা—কাব্য—পরিক্রমা ২২-২৬ পৃষ্ঠা। (স্নেহ, প্রেম প্রকৃতির প্রতিশোধ)। সীমা এবং কণিকা শব্দটি কবি ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করেছেন। বিবাহ পূর্ব কবি কল্পনার বালিকা রূপিণী সীমা (স্নেহ, প্রেম, গৃহীসত্তা) ও সন্ন্যাসী রূপী অসীমের (শূন্যতা, সন্ন্যাসী সত্তা) যে মিলন সাধনের ভাব রূপ কবির মনে প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্য কাব্যে প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল সেই ভাবরূপই পরবর্তীকালে কবির জীবনে ও কাব্যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই নাট্য কাব্যে সীমা অসীমের বিশ্লেষণ রয়েছে—

'প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল।' 'আত্মপরিচয়ে' লিখেছেন,—

'পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত আর একদিকে অদ্বৈত, একদিকে বিচ্ছেদ আর—এক-দিকে মিলন, একদিকে বন্ধন আর একদিকে মুক্তি।'

পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারিতেও সীমা অসীমের বিশ্লেষণ পাওয়া যায়—স্ত্রী পুরুষের মাঝে বিধাতা একটি দূরত্ব রেখে দিয়েছেন। এই দূরত্বের ফাঁকটাই কবলই সেবায় ক্ষমায় বীর্যে সৌন্দর্যে কল্যাণে ভরে ওঠে, এইখানেই সীমায় অসীমে শুভদৃষ্টি।'

কবি জন্মদিন ১১ সংখ্যক কবিতায় নিজেরই বিস্মরণধর্মী জীবন কাহিনী

প্রকাশ করে সীমাকে নিষে অসীমের বিচিত্র লীলার কথা বিশ্লেষণ করেছেন। যার কিছু কিছু ভাবার্থ নব জীবনারম্ভের সূচনায় লিখিত 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যে পাওয়া যায়। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যটি কবির 'জীবন নাট্যের সূচনা এবং 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থটি 'নাট্য-শেষের' পালা। এই সীমা ও অসীমকে নিয়ে কবির জীবননাট্যের যে বিচিত্র লীলা (কড়ি ও কোমল থেকে স্মরণ) তারই প্রকাশ রয়েছে জন্মদিন ১১ সংখ্যক কবিতায়, কাব্যে, সাহিত্যে গানে ও উপন্যাসে। যংপুতে কবি সীমা ও বিশ্বসত্তার অর্থ বলে গেছেন। 'বিরাট অসীম বিশ্বসত্তা একটুকু কেন্দ্রের মধ্যে (কাযার মধ্যে—জন্মদিন ১১ নং) ক্ষণে ক্ষণে নিজেকে বেঁধে সীমাতে (দেহ, নারী, ক্ষণিক') প্রকাশ হল।'

দূতী, স্বর্গদূতী—লক্ষ্মীর প্রতিনিধি, গৃহলক্ষ্মী।

'সেই শুনে কোনো কোনো দিন বা/বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর আসন টলেছিল,/তিনি পাঠিয়ে দিলেন তাঁর কোনো কোনো দূতীকে' (শেষ সপ্তক ৪৩)।

'তুমি সে আকাশ ভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক হে কল্যাণী/দেবতার দূতী' (আহ্বান পূরবী), কল্যাণী নারী।

'হে প্রেয়সী স্বর্গদূতী,/আমার যত কাব্য পুঁথি/তোমার পায়ে পড়ে স্তুতি,/ তোমারি নাম বেড়ায় রটি' (অতিবাদ ক্ষণিকা)। কবি প্রেয়সী।

'ইঙ্গিতে জানিয়েছিল "আমি তারি দূত,"। সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে,/নিত্যকাল সে শুধু আসিছে' বধূ—আকাশ প্রদীপ)।

দূত—প্রতিনিধি, বধূ। রূপকথার বধূর প্রতিনিধি।

আসন পাতি—'জেগে উঠে পাওনি তাহা খুঁজে,/দাওনি আসন পাতি' (নীহারিকা—বিচিত্রিতা)।

'তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে, দিইনি আসন বসিবার (আসা যাওয়া সানাই)। ভালোবাসার সমাদর করেননি।

বিদেশ—ভিন্ন দেশ।

বিদেশ—সাগর পারের লীলালোকের আকাশপথ।

বিদেশের ভালোবাসা (শেষ লেখা ৫ নং)—অন্য দেশের ভালোবাসা। প্রথম বয়সের লীলালোকের লীলাক্ষেত্র—শিলাইদহ (১৩০৭)

শেষ বয়সের লীলালোক—'শেষ বয়সের পথে বেরিয়ে গোধূলিরাগের

রাঙা আলোতে তোমার সেই দূরের বঁধুর সন্ধানে চলে যাও। সেইদিকেই ডানা মেলে দাও সাগর পারের লীলালোকের আকাশপথে।'

জীবনের প্রভাত বির শৈশব। সে-প্রভাতে তুমিই তো ছিলে/এ বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী—কাদম্বরী দেবীর স্মৃতি।

যৌবনের প্রভাত—নব ... ন ও নব ফাল্গুন। 'যে-তারা মহেন্দ্রক্ষণে প্রত্যুষবেলায়/প্রথম শুনাল মোরে নিশান্তের বাণী'—নব যৌবনের পঞ্চদশী নারী যিনি কবির সুপ্ত যৌবনকে প্রথম জাগ্রত করেছিলেন। মৃণালিনী দেবী।

জীবন মধ্যাহ্ন—যৌবন। 'প্রভাতের নবীন আলোয় মধ্যাহ্নের বাণী নেই, কিন্তু সায়াহ্নের পূর্ণতা গূঢ়ভাবে মধ্যাহ্নকে নিয়ে।'

যৌবন মধ্যাহ্ন—পূর্ণ যৌবন অথবা বসন্ত। 'সার্থকতা ছিল যেইখানে/ক্ষণিক পরশি তারে চলে গেছি জনতার টানে/সেই যৌবনমধ্যাহ্নের অজস্রের পালা/শেষ হয়ে গেছে আজি, সন্ধ্যার প্রদীপ হল জ্বালা' (অবশেষে-সানাই)।

জীবন সায়াহ্ন—প্রৌঢ় অথবা শেষ জীবন।

যৌবন সায়াহ্ন—শেষ যৌবন অথবা শেষ বসন্ত। 'সায়াহ্নে তুমি চলে গেলে অব্যক্তের অনালোকে'। মৃণালিনী দেবী।

বলাকা ৪২ সংখ্যক

ভোর বেলা—তুমি আমার সুপ্ত যৌবনকে জাগ্রত করেছিলে বলে ঢেলা মেরেছিলাম। অর্থাৎ প্রথম যৌবনে মানসীতে অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য আঘাত করেছিলেন (১৮৯০-আমার সুখ-মানসী, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী ২০ অক্টোবর ১৮৯০)।

মধ্যাহ্নে—মধ্য যৌবনে কাজের জন্য ব্যস্ত ছিলেন ছিন্নপত্র ১৮৯০-১৮৯৫)।

সন্ধ্যা বেলা—শেষ যৌবনে 'ভীরুতার' জন্য উলটো কথা বলে ভালোবাসাকে রুদ্ধ করে মনের সব দরজা বন্ধ করে রেখেছিলেন, যেন মৃত্যু দূত হয়ে কবির জীবনে এসেছেন (ভীরুতা-ক্ষণিকা)।

দস্যু বলে শত্রু বলে—উলটো কথা—পরম মিত্র। ভীরুতা-ক্ষণিকা।

যারে নাহি চিনি—অচেনা (ক্ষণিকা, বিচিত্রিতা, ছিন্নপত্র ১৩০নং, পত্রপুট ১৫ নং, ক্ষণ মিলন—চৈতালি, ক্ষণিক মিলন—কড়ি ও কোমল)।

যার ভাষা বুঝিতে পারি নি—স্বল্পভাষী নারী (মৌন ভাষা-মানসী)।

ভাষা যার জানা ছিল নাকো (শেষ লেখা ৫ সংখ্যক)।

'ভাষা বিহীন মুখ' (অন্তর্হিতা পরিশেষ)।

রবীন্দ্রনাথ 'বধূ' কথাটি বিভিন্ন অর্থে, কাব্যে ও গানে প্রকাশ করেছেন।

বধূ—প্রেয়সী কবিতা। কবিতা যে, বধূটি আমার, দুটি শুধু পড়িবে নিশ্বাস। দুটি শুধু বাহিরিবে বাণী,/বাহু দুটি হৃদয়ে জড়ায়ে/ মরমে রাখিবি মুখখানি' (গান আরম্ভ—সন্ধ্যা সংগীত)।

বধূ—প্রিয়া। 'এস এস বঁধূ এস,/আধেক আচারে বসো,/অবাক অধরে হাসো/ভুলাও সকল তত্ত্ব' (শীতে ও বসন্তে-চিত্রা)।

পরাণ-বধূ—মৃত্যু। 'আমার পরাণ—বধূ ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া। বহু ভালোবেসে/ ধরিবে তোমার বাহু' (প্রতীক্ষা—সোনার তরী)।

পরান বঁধূ—পরান সখা, ঈশ্বর। 'হে মোর পরান বঁধূ হে,/কখন যে তুমি দিয়ে চলে যাও পরানে পরশ মধু হে' (মুক্তিপাশ-খেয়া)।

বধূ—জীবন দেবতা।

'কী দেখিছ, বঁধু, মরম মাঝারে/রাখিয়া নয়ন দুটি' (চিত্রা)।

পাদপীঠ' পরে চরণ প্রসারি শয়নে বসিলা বধূ—/আমি কহিলাম, 'সব দেখিলাম, তোমারে দেখিনি শুধু' (সিন্ধুপারে-চিত্রা)।

অজানিত বধূ—অচেনা বধূ (জীবন দেবতা)।

চির কিশোর বঁধু—রবীন্দ্রনাথ। সেই আমার চিরকিশোর বঁধু/তাকে তো আর পাইনে দেখতে এই ঘরে" (শেষ সপ্তক ৩১ সংখ্যক)।

বধু (শিরোনামা)—কবির শৈশবের মানসপটে যে বধুর ছবি আঁকা ছিল তারই বাস্তব প্রকাশ 'বধু' কবিতাগুলিতে—'ঠাকুরমা দ্রুত তালে ছড়া যেত পড়ে/ ভাবখানা মনে আছে—বউ আসে চতুর্দোলা চড়ে/আম-কাঁঠালের ছায়ে,/ গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে' (আকাশ প্রদীপ)। জীবন-স্মৃতির ৭ পৃষ্ঠায় এই কবিতার প্রথম অংশের বিবরণ পাওয়া যায়,এবং শেষ অংশ এই নায়কেরই (কবির) নব যৌবনের রহস্যময় কাহিনী। বধু (মানসী) বালিকা বধু (খেয়া) এই কবিতা দুটি গ্রাম্য নব বধুর অন্তর কাহিনী (মানসী) বা' 'দুঃখ দিনের ঝড়ের' মধ্যে প্রবাহিত (বালিকা বধূ)।

'মুখ ঢাকা বধূ—'গোপনে কণিকা দেখা দিতে আসে/মুখ ঢাকা বধূ সেজে' (জন্মদিন ১১ নং)। কণিকার বিনাশের পর (১৩০৯), কণিকাই অশরীরী নারী রূপে দেখা দিলেন। অশরীরী নারী 'অধরা'।

মাহেন্দ্র ক্ষণ—দুর্লভ মুহূর্ত (শেষ অর্ঘ্য-পূরবী)। 'অনেক কালের একটি মাত্র দিন।'...........আমার সেই আটকে-পড়া দিনটির গায়ে/কোনো ঋতুর কোন তুলির/চিহ্ন লাগে নি। একদা ছিলেম ঐ দিনটির মাঝখানেই (শেষ সপ্তক ঊনত্রিশ)—কবির বিবাহের দিন।

রহস্য আভাসে, রহস্যের তীব্রতায়, অভাবিত রহস্যের ভাষা, গোপন রহস্যভরে—যৌবন রহস্য অথবা রহস্যময় যৌবন।

রহস্য আভাসে—চিত্ত ভরি দিলে সেই-রহস্য-আভাসে। (স্মরণ ২২ সংখ্যক)। রহস্যময় যৌবন।

রহস্যের তীব্রতায়—অকস্মাৎ একদিন কাহার পরশ/রহস্যের তীব্রতায়—দেহেমনে জাগাল হয়ষ। (বধূ—আকাশ প্রদীপ)। বধূর পরশে নূতন চেতনায় জেগে উঠল কবির সুপ্ত যৌবন। রহস্যের তীব্রতায়—রহস্যময় যৌবনের আনন্দ।

অভাবিত রহস্যের ভাষা—পরিচয় ধারা মাঝে তরঙ্গিয়া অপরিচয়ের/অভাবিত রহস্যের ভাষা,/চারিদিকে স্থির যাহা পরিমিত নিত্য প্রত্যাশিত/তারি মধ্যে মুক্ত করি ধাবমান বিদ্রোহের ধারা (আরোগ্য ১৩ সংখ্যক)।

অভাবিত রহস্যের ভাষা—যৌবন রহস্যের ভাষা যা' আদিরসাত্মক কবিতায় পরিণত। ধাবমান বিদ্রোহের ধারা—এই আত্মবিস্মৃত বেআইনী প্রমত্ততা কড়ি ও কোমলের কবিতায় অবাধে প্রকাশ পেয়েছিল।' কবির নব যৌবনের প্রেমই হঠাৎ 'ধাবমান বিদ্রোহের ধারার' মতো কবির জীবনে ও কাব্যগ্রন্থে (কড়ি ও কোমল) প্রকাশ পেল।

গোপন রহস্যভরে—বিবাহের পঞ্চম বরষে/যৌবনের নিবিড় পরশে/গোপন রহস্যভরে/পরিণত রসপুঞ্জ অন্তরে অন্তরে (শেষ লেখা ৮ সংখ্যক)।

রহস্যময় যৌবনের স্পর্শে অন্তরে অন্তরে যে রসের সঞ্চার হল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থে বহু আদিরসাত্মক কবিতা পাওয়া যায়, যার উৎপত্তি কড়ি ও কোমল কাব্যগ্রন্থে। এই কাব্যগ্রন্থে কবি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আদিরসের বর্ণনা দিয়েছেন যা' পরবর্তীকালে বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে বিভিন্নরূপে 'অভাবিত রহস্যের ভাষায়' প্রকাশ করেছেন। 'শেষ লেখা ৮ সংখ্যক' কবিতাই কবির শেষ আদিরসাত্মক কবিতা। আদিরসের কবিতাগুলির মধ্যে 'ছায়াসঙ্গিনী' ও 'শেষ লেখা ৮ সংখ্যক' কবিতায় তিনি 'অতিথি' কথাটি ব্যবহার করেছেন।

হে দেব, হে দেবীগণ—পুণ্যবল হল ক্ষীণ, আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন (স্বর্গ হইতে বিদায়-চিত্রা)। স্বর্গের দেব দেবী গণ। কবির দ্বৈত সত্তার দ্বন্দ্বের জন্য স্বর্গ থেকে বিদায় নিলেন (রূপক কবিতা)।

তুমি দেবতা পাড়ায় বেদের মেয়ে—'পথের ধারে গাছতলাতে তোমার বাসা. শ্যামলী /তুমি দেবতা পাডায বেদেব মেয়ে'—(শ্যামলী)।

দেবতাদের পাড়ার মধ্যে তুমি বেদের মেয়ের মতো সংসার কর এবং মুহূর্তের মধ্যে তুমি গরীব হয়ে যাও। তুমি যাকে ভালো'বসেছ তার প্রতি কোন অধিকার (গাঁঠছড়ার বাঁধন) দাবি কর না। কবির নিজের সংসার।

মহেন্দ্র, ইন্দ্র—রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রকাব্যের বহু কবিতায় রয়েছে কবির নিজেরই আত্মকথা এই আত্মকথায় নিজেকে মহেন্দ্র অথবা ইন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্বর্গ হইতে বিদায় (চিত্রা) ও পাঠিকা (বীথিকা) কবিতায় কবির ভূমিকায় মহেন্দ্রের উল্লেখ রয়েছে। আবার 'তপোভঙ্গ' (পূরবী) কবিতায় লিখেছেন –'তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের —অর্থাৎ কবির সন্ন্যাসী সত্তার (শিব, শূন্যতা, অসীম) সঙ্গে গৃহী সত্তার (উমা. নারী, সীমা) মিলন কাহিনীর বর্ণনা দিয়েছেন 'তপোভঙ্গ' কবিতায় যার প্রথম আভাস পাই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্য কাব্যে ও 'কড়ি ও কোমলে' কাব্যগ্রন্থে।

শচী—(পাঠিকা) কবি প্রেয়সী।

শ্যামা (আকাশ প্রদীপ)—উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ—কাদম্বরী দেবী।

শ্যামা মেয়ে—(কৃষ্ণকলি—ক্ষণিকা) } কালো রং, কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রী।

শ্যামা সুন্দরী—(বোধন—মহুয়া) } কালী, অম্বিকা।

কবি 'শ্যামা' ও 'শ্যামা মেয়ে' কথাটির দুই রকম অর্থ করেছেন। একটির অর্থ উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ (আকাশ প্রদীপ) অন্যটির অর্থ কালো অথবা কৃষ্ণবর্ণ (কৃষ্ণকলি —ক্ষণিকা)।

পঞ্চমী (আকাশ প্রদীপ)—অমাবস্যার পর পঞ্চম তিথি—'মিকি চাঁদনীর আলো' অর্থাৎ আলো আঁধারি। বর্ণ—শ্যাম বা কালো রং (শ্যামলা)—মৃণালিনী দেবী। দ্রৌপদী—রন্ধন পটিয়সী নারী।

শ্যামলা (বিচিত্রিতা, বীথিকা)—'শ্রাবণে অপরাজিতা চেয়ে দেখি তারে আঁখি ডুবে যায় একেবারে' নীল বা কালো রং।

শ্যামলী (শ্যামলী. শেষ সপ্তক —মাটির শ্যামল অঞ্জন অথবা সজলনীল-জলদ-বরণ (যাত্রী-ক্ষণিকা) মেটে সবুজ. নীল অথবা কৃষ্ণবর্ণ (কালো, শ্যামা মেয়ে—

কৃষ্ণকলি ক্ষণিকা)। মৃণালিনী দেবী। কবি শ্যামলী নারীকে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ দিয়ে বন্দনা করেছেন 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়ে (স্মরণ ৬নং)।

চঞ্চলের লীলা সহচর—আত্মপরিচয় ২০৬ পৃষ্ঠা। হাল্কা আমার স্বভাব (শেষ সপ্তক ৪১ সংখ্যক)।

কবি (ক্ষণিকা) অস্থির প্রকৃতির।

রবীন্দ্রনাথ নিজের চরিত্র নিজেই বিশ্লেষণ করেছেন।

রোম্যান্টিক (নব জাতক)—কারুশালা হতে তাঁর চুরি করে আনি রঙ-রস,/ আনি তাঁরি জাদুর পরশ।/জানি, তার অনেকটা মায়া,/অনেকটা ছায়া। আমারে শুধাও যবে 'এরে কভু বলে বাস্তবিক?' আমি বলি 'কখনো না, আমি রোম্যান্টিক।'

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রোম্যান্টিক কবি, তাই তিনি মানসী, ক্ষণিকা এবং অশরীরী নারী অথবা ও বাংলা দেশের মেয়েকে সৃষ্টি করেছেন।

ঘরের চাবি—অন্তরের চাবি (অদেয়-সানাই)।

চাবি—তালা খুলিবার যন্ত্র। পরিচয়। ক্ষণিক কাব্যগ্রন্থখানি কবির প্রিয় গ্রন্থ, তাই ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থের এবং অন্তরের চাবি (পরিচয়) রেখে গেছেন পূরবীর 'ক্ষণিকা'র। এবং বিশ্লেষণ করেছেন পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে ৫ অক্টোবর ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে।

চাবি (পূরবী)—

বিধাতা কবির হৃদয়কে বহু কক্ষে ভাগ করা প্রাসাদের মতো সৃষ্টি করে অন্তঃপুরের গুপ্ত কক্ষে তালা দিয়ে চাবিখানি দূরে ফেলে দিলেন। তাই তাঁর অন্তঃপুরের গুপ্ত কক্ষটি চিরকাল রুদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই কারণেই তাঁর গোপন হৃদয়ের ভালোবাসার কথা তিনি কখনো কোথাও বলেন নি, শুধু সংকোচে নীরব হয়ে গোপন করে গেছেন (শেষ সপ্তক ছাব্বিশ সংখ্যক)। এই গুপ্তকক্ষের ফুল ছড়ানো, গন্ধে বিভোর, অন্তরতম প্রদেশের নির্জন প্রান্তরের ছায়াঘন শাখায় বসে কবির লাজুক হৃদয় (লাজুক পাখি, লজ্জাবতী লতা) প্রেয়সীর উদ্দেশ্যে প্রেমের কবিতা রচনা করেন। যদি কোন পথিক এই হারিয়ে যাওয়া গুপ্তকক্ষের চাবিখানি (ক্ষণিকার পরিচয়) খুঁজে পায় তবেই কবির অন্তরতম প্রদেশের গুপ্ত দ্বার খুলে অনাদি কালের শাশ্বত প্রেমের বাণী শুনতে পাবে—

অবশেষে

মৌমাছির পরিচিত এ নিভৃত পথপ্রান্তে এসে

যাত্রা তার হবে অবসান ;

খুলিবে সে গুপ্ত দ্বার কেহ যার পায়নি সন্ধান।

মানসী—

'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা' (চৈতালি)।

ঈশ্বরের গড়া অর্ধেক (অসম্পূর্ণ) মানবী (প্রতিমা), এবং Artist এর (শিল্পী কবির) হাতে রচিত অর্ধেক কল্পনা। অর্থাৎ সৃষ্টি কর্তার (ঈশ্বরের) গড়া আধাআধি (অসম্পূর্ণ) মানবীকে (প্রতিমা) শিল্পী কবি রবীন্দ্রনাথ অর্ধেক কল্পনা দিয়ে রচনা করেছেন মানসীকে।

চিঠি পত্র পঞ্চম খণ্ডে রবীন্দ্রনাথ প্রচ্ছন্নভাবে মানসীর পরিচয় দিয়ে প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছেন—

'সে Artist এর হাতে রচিত ঈশ্বরের অসম্পূর্ণ প্রতিমা, ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কী ?'

নব যৌবনের নববসন্তে যিনি কবির মানসেই ছিলেন, সেই ঈশ্বরের গড়া বাস্তবের অসম্পূর্ণ প্রতিমাকেই শিল্পী কবি রবীন্দ্রনাথ অর্ধেক কল্পনা দিয়ে রচনা করেছেন অর্ধ মানবী মানসীকে (গাজীপুর ১৮৮৮)। যা' পরবর্তীকালে কণিকাতে (শিলাইদহ ১৩০৭-১৩০৯) 'বাংলা দেশের মেয়ে' রূপে কল্যাণকর্মে যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ হলেন (১৩০৯—শান্তিনিকেতন)।

বাংলা দেশের মেয়ে—

কবি বাংলা দেশের মেয়ের পরিচয় দিয়েছেন শ্যামলী কাব্যগ্রন্থের 'বাঁশিওয়ালা'তে-আমি তোমার বাংলা দেশের মেয়ে।

সৃষ্টি কর্তা পুরো সময় দেননি

আমাকে মানুষ ক'রে গড়তে

রেখেছেন আধাআধি করে।

'বিধাতা অক্ষর মিলিয়ে তাকে তৈরি করেননি, কলমে যা এসেছে তাই বসিয়ে গেছেন'—(গোড়ায় গলদ)। সৃষ্টি কর্তার গড়ে তোলা এই অসম্পূর্ণ (আধাআধি) নারী, যার অন্তরে বাইরে এক হয়নি, যার ব্যথায় বুদ্ধিতে, ইচ্ছায় বা শক্তিতে মিল হয়নি, যিনি শান্ত হয়ে ঘরে কাজ করেন এবং সবাই যাকে ভালো বলেন, যিনি কঠিন করে ভালোবাসতে জানেন না শুধু কাঁদতে জানেন, সেই অসম্পূর্ণ নারীই

পরবর্তীকালে 'ঘোমটা খসা নারী' রূপে অন্ধকার ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে এসে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিয়ে সম্পূর্ণ হলেন।

প্রথম যৌবনের লেখা য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী, চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড ও মানসী কাব্যগ্রন্থে কবি-মনের গতি প্রকৃতি নির্ণয় করা যায় (২৭, ২৮, ৩০ আগষ্ট, ২২ ও ২৩ অক্টোবর য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী)। আবার শেষ যৌবনের লেখা চিঠিপত্র ৮ম খণ্ড (১০ আগষ্ট ১৯০০) ও ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থে কবির পরিবর্তিত মনোভাবের (উত্থান পতনের) পরিচয় পাওয়া যায়।

ক্ষণিকা (১৩০৭, শিলাইদহ) কল্যাণী নারী।

হে রমণী ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য আভাসে

(স্মরণ ২২ সংখ্যক)

যে সুন্দর বসেছিল মোর পাশে এসে
ক্ষণিকের ক্ষীণ ছদ্মবেশে
যে চির মধুর
দ্রুত পদে চলে গেল নিমেষের বাজায়ে নূপুর,
প্রলয়ের অন্তরালে গাহে তারা অনন্তের সুর।

(বৈতরণী—পূরবী)

কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে,
গোধূলি বেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে,
লয়ে তার ভীরু দীপশিখা।
দিগন্তের কোন্ পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা॥

(ক্ষণিকা—পূরবী)

যে সুন্দরী, যে ক্ষণিকা
নিঃশব্দ চরণে আসি, কম্পিত পরশে
চম্পক-অঙ্গুলি পাতে তন্দ্রা যবনিকা
সহাস্যে সরায়ে দিল—

(শেষ অর্ঘ্য—পূরবী)

দীপ—প্রদীপ।

দীপ—প্রিয়া—'তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে/তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে' (চৈতালি)।

ভীরু দীপ শিখা—প্রিয়া, কণিকা—'লয়ে তার ভীরু দীপ শিখা' (পূরবী)।

সন্ধ্যা দীপ শিখা—প্রিয়া; 'এখন ঘরের দিকে মন টানিতেছে…সেখানকার সন্ধ্যাদীপ শিখা কেবলই চোখে পড়িতেছে'। (চিঠিপত্র ৮ম খণ্ড, ১০ই আগষ্ট ১৯০০)।

কুটির তলে দিবস হলে গত/জ্বলে প্রদীপ ধ্রুবতারার মতো' (ভৎর্সনা, কণিকা)।

'রুধিয়া দিয়াছ তব বাতায়ন,/বিছানো রয়েছে শীতল শয়ন,/তোমার সন্ধ্যাপ্রদীপ—আলোকে তুমি আর আমি একা' (সমাপ্তি—কণিকা)

রূপনারানের কূলে (শেষ লেখা ১১ সংখ্যক)—পদ্মার কূলে। পদ্মার কূলেই ঋণগ্রস্ত কবি স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তবে নেমে আসলেন (সোনার তরী—১৮৯১, চিত্রা ১৮৯৬)।

'রক্তের অক্ষরে দেখিলাম/আপনার রূপ'

কবি মৃত্যুর ভিতর দিয়েই নিজেকে চিনতে পারলেন, দেখলেন তাঁর ভালবাসাকে (সত্য-প্রেম)। এই ভালোবাসাই সব চেয়ে কঠিন, সেই কঠিনকেই তিনি ভালোবেসে আজীবন দুঃখের তপস্যা দ্বারা কবি প্রেমের 'ঋণশোধ' করলেন অথবা প্রতিদান দিলেন 'নিষ্ঠুরকে মেনে লহো সুদুঃখের উৎসাহে,/ প্রেমের গৌরব জেনো তাহে' (ভীরু—বিচিত্রিতা)।

ভাষা যার জানা ছিল নাকো,/আঁখি যার করেছিল কথা (শেষ লেখা ৫ সংখ্যক)। স্বল্পভাষী নারী। যার প্রথম বিশ্লেষণ পাওয়া যায় মানসীর 'মৌন ভাষা' কবিতায়—আঁখি দিয়ে যাহা বল মাধুরী আসিয়া কাছে/সেই ভালো থাক তাই, তার বেশি কাজ নাই,/কথা দিয়ে বল যদি মোহ ভেঙে যায় পাছে।/এত মৃদু, এত আধো, অশ্রুজলে বাধো-বাধো/শরমে সভয়ে ম্লান এমন কি ভাষা আছে? কথায় বলো না তাহা আঁখি যাহা বলিয়াছে।'

ভাষাবিহীন মুখ—'স্বাগতবাণী ছিল সে মেলি ভাষাবিহীন মুখে,/বহুজনের বাণীরে ঠেলি/বাজে কি তব বুকে' (অন্তর্হিতা-পরিশেষ)। কুণ্ঠিতা ও স্বল্পভাষী নারী।

রূপকার—রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবন দিয়েই কাব্য রচনা করেছেন—'জীবন দিয়ে গড়িছে গুণী/স্বপন দিয়ে নয়' (বীথিকা)।

অপ্রকাশের পর্দা (শেষ সপ্তক নয় সংখ্যক)—যে জীবন প্রকাশিত হয় নি। কবির বিস্মরণধর্মী জীবন অথবা অজানার ঘের সেখানে শিল্পকর্মের সৃষ্টি।

'আর এক প্রান্তে অচরিতার্থ সাধনা/বাষ্প হয়ে মেঘায়িত হল শূন্যে/ মরীচিকা হয়ে আঁকছে ছবি'—কবি জীবন কাহিনী দিয়ে কাব্যে যে ছবি আঁকছেন তা অপরিস্ফুটভাব (ভাষার অঙ্গুলি) জন্য ব্যর্থ হয়ে গেল (শেষ সপ্তক নয় সংখ্যক)।

ভাষার অঙ্গুলিতে/কে ধরিতে পারে তাকে ? (শেষ সপ্তক নয় সংখ্যক) অথবা 'সংকীর্ণ জীবনে আমার স্বর তাই বিজড়িত,/সত্য পৌঁছয় না অনুজ্জ্বল বাণীতে' (শেষ সপ্তক ২৬ সংখ্যক)। অর্থাৎ অনুজ্জ্বল বাণীতে যে কথা কবি বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাই তিনি জীবনের শেষ বাণীতে লিখে রেখে গেলেন "ভালোবাসি।"

আজ দিনান্তের অন্ধকারে
এ জন্মের যত ভাবনা যত বেদনা
নিবিড় চেতনায় সম্মিলিত হয়ে
সন্ধ্যাবেলার একলা তারার মতো
জীবনেব শেষ বাণীতে হোক উদ্ভাবিত—
'ভালোবাসি'।



শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
নিবেদন ক	৫	বিস্মরণ ধর্মী	বিস্মরণধর্মী
গ	২৪	গীতকার	গীতিকার
ঙ	২৩	নিজের প্রতিবাদ	নিজের জীবনের প্রতিবাদ
ঝ	১০	নৈবন্ধ	নৈবেদ্য
১ পৃষ্ঠা	৯	নিয়ে, নিজেরাই	দিয়ে নিজেরই
২	১৭	অসামান্য	অসামান্যা
২	১২	সে সময়ে	যে সময়ে
২	২৬	মধ্যে কাব্যলক্ষ্মীর	মধ্যে যে চারজন কাব্যলক্ষ্মীর
২	২৯	বিভক্ত করেছেন, কবি কাহিনী থেকে স্মরণ।	বিভক্ত করেছেন (কবি কাহিনী থেকে স্মরণ)।
৩	১	জীবন কাব্যকে	জীবন-কাব্যকে
৩	১৬	গঙ্গারতীর	গঙ্গার তীর
১০	৪	সন্ধিঃ কালে	সন্ধিঃ কাল
১০	২৮	তার	তোর
১৫	১০	জীবনস্মতি	জীবনস্মৃতি
১৬	২৫	তর্ক বলিয়া	বলিয়া তর্ক
১৭	২৮	পলা	পালা
২০	১৮	সন্ন্যাসী	সন্ন্যাসীকে
২০	২৭	ভূমিকা, ইহাই	ইহাই ভূমিকা,
২১	৯	প্রেম, সত্তা	প্রেম-সত্তা,
২১	১৬	এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া	এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া
৪২	১৬	গেছে।	গেছে (ধ্বনি—আকাশ প্রদীপ)।
৪৩	২৯	প্রথম দুটো যৌবনের	প্রথম যৌবনের
৪৬	২২	৮৯০	১৮৯০
৫২	১০	তিনি	তিনি,

৫৬	৯	দ্বন্দ্বের তুফান	দ্বন্দ্বের তুফান (সংশয়িত প্রেমের দ্বন্দ্ব)
৫৬	২০	(ঋণগ্রস্ত কবি) কল্পনা	(ঋণগ্রস্ত কবি), কল্পনা]
৭১	১৭	সঙ্গনী	সঙ্গিনী
৮০	১৭	পরিচিত্	পরিচিত
৯৫	১৭	'তোমরা যাহার নাম জান না'[২১]	'তোমরা যাহার নাম জান না'[২৩]
৯৫	১৮	অগৌরবার	অগৌরবার[২৪]
৯৫	২৭	প্রচ্ছন্ন[২৩]	প্রচ্ছন্ন[২৫]
৯৭	২৫	ভালো[২১]	ভালো[২৬]
১০৩	৩	স	সে
১০৭	১৪	ধাবায় বয়েছে	ধারায় রয়েছে
১১৮	৩০	অদূছের	আছে দূর
১২২	৮	দ্রোপদী	দ্রৌপদী
১২৫	২২	আতীয়	আত্মীয়
১২৬	৩০	যবনিকা	ক্ষণিকা
১৩৩	২২	জীনবস্মৃতি	জীবনস্মৃতি